ইতিহাস ও ঐতিহাসিক

মমতাজুর রহমান তরফদার

ইতিহাস ও ঐতিহাসিক

ইতিহাস ও ঐতিহাসিক

মমতাজুর রহমান তরফদার
অধ্যাপক
ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়, ১৩৮৮
[জুন, ১৯৮১]

বা/এ ঃ ১১৪৮

মুদ্রণ সংখ্যা ঃ ২২৫০

পাণ্ডুলিপি
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রকাশক
আল-কামাল আবদুল ওহাব
পরিচালক
প্রকাশন-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

মুদ্রণ
বাংলা একাডেমী প্রেস
ঢাকা

প্রচ্ছদ ঃ হাশেম খান

দাম ঃ পনেরো টাকা মাত্র

ITIHAS O AITIHASIK (History and Historians) : A Collection of Essays on Historiography by Momtazur Rahman Tarafdar, Published by Bangla Academy, Dacca, Bangladesh. 1981. Price : Tk. 15·00 only.

বানুকে

তারাভরা, অনন্ত আকাশের মত ইতিহাসের জগৎ বিচিত্র এবং বিশাল। এই জগতে যখনই বিচরণ করেছি তখন তুমি নি:সঙ্গতাকে বরণ করেছ সানন্দে।

অবতারণা

এই সঙ্কলনের রচনাগুলিতে ইতিহাসের কতকগুলি সমস্যা আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলি লিখেছিলাম ১৯৫৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭৮ সালের মধ্যে। এখন এগুলি পড়ে মনে হচ্ছে যে, আলোচিত সমস্যাগুলি আজও তাৎপর্য হারায়নি; বরং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। কোনো কোনো সমস্যা প্রসঙ্গে আমার মতামত বর্তমানে অনেকটা বদলে গেছে; কিন্তু লেখা-গুলির পুরনো কাঠামোর মধ্যে নতুন মতামত গুঁজে দিলে তা অত্যন্ত বেখাপ্পা দেখাত। নতুন অভিমতের ভিত্তিতে নতুন প্রবন্ধ লেখা দরকার। কয়েকটি প্রবন্ধে তবুও সীমিতভাবে কিছু সম্পাদনার কাজ করেছি।

Historiography বা ইতিহাস-শাস্ত্রের উপর বাংলায় লেখা প্রবন্ধ বা বই অত্যন্ত বিরল। অথচ লক্ষ্য করেছি যে, এই বিষয়টির প্রতি বেশ কিছু সংখ্যক পাঠকের আগ্রহ আছে। কাল-বিভাজন বা Periodisation, গবেষণার ইউনিট বা ক্ষেত্র নির্বাচন, ইতিহাসে ঘটনার ভূমিকা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক ইতিহাসের মধ্যকার যোগসূত্র ও জটিলতা নিরূপণ, ইতিহাসের সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য এবং এ ধরনের আরো বহু সমস্যা গবেষণার ক্ষেত্রে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে আনুপাতিকভাবে গুরুত্ব পায়। সীমিত-ভাবে হলেও এই সঙ্কলনের প্রথম আটটি প্রবন্ধে উল্লিখিত সমস্যাগুলি আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলি মিলিয়ে পড়লে তাদের মধ্যে বিষয়গত ঐক্যের একটি সূত্র চোখে পড়বে।

সমালোচনা-প্রবন্ধ দুটি নিছক গ্রন্থ-সমালোচনা নয়। লেখা দুটিতে তিনটি বইয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে ইতিহাসের দর্শন ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য স্থান পেয়েছে বলে তারা স্বতন্ত্র প্রবন্ধরূপে সঙ্কলিত হল। যদুনাথের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ইতিহাস-পরিষৎ কর্তৃক আয়োজিত এবং ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত আলোচনা-সভায় 'ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার' শীর্ষক প্রবন্ধটির একটি খসড়া পাঠ করেছিলাম। যদুনাথ সরকার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক; অথচ তাঁর ইতিহাস-সাধনা সম্বন্ধে কোনো সার্বিক আলোচনা বড় একটা চোখে পড়ে না। ১৯৭০-৭১ সালে লিখিত এবং ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে আমার অজ্ঞাতবাসের সময় পরিমার্জিত উক্ত প্রবন্ধটি প্রয়োজন বোধে এই সঙ্কলনে ছাপা গেল। এ দেশের ইতিহাস ও প্রত্নবস্তু সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত

লোকজনের মধ্যে যে বহির্মুখী মনোভাব লক্ষ্য করে আসছিলাম মূলতঃ তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রায় বার বছর আগে 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেই পুরনো মানসিকতা একটি শক্তিশালী প্রবণতা রূপে আজও আমাদের মাঝে কাজ করছে। প্রবন্ধটি 'বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব' শীর্ষনামে বর্তমান সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে। আমার ধারণা, হিন্দুদের কুলজী শাস্ত্রে মধ্য যুগের বাংলার হিন্দু সমাজের মানসিক চাঞ্চল্যের প্রতিফলন ঘটেছে। এই চাঞ্চল্যের কারণ ছিল ইসলামের সঙ্গে হিন্দু সমাজের সংস্পর্শ ও সংঘাত। অভিমতটি বিতর্কমূলক বলেই 'কুলজী সাহিত্যের ঐতিহাসিকতা' নামক প্রবন্ধটি এই সঙ্কলনে ছাপা গেল। সর্বশেষ প্রবন্ধটিতে মুসলিম মুদ্রাতত্ত্বের একটি বিশেষ সমস্যার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছি। তৃতীয় প্রবন্ধের পরিশিষ্টটি বাংলাদেশ ইতিহাস-পরিষদের আলোচনা সভায় ১৯৭৫ সালের ৮ই মার্চ তারিখে 'ইতিহাসের সমস্যা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতামালা' সিরিজে প্রদত্ত একটি বক্তৃতার সারাংশ যা 'ইতিহাস' পত্রিকার একটি সংখ্যার 'প্রসঙ্গ-সংবাদ' থেকে চয়ন করেছি।

সঙ্কলিত প্রবন্ধগুলি কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থশেষে সংযোজিত 'স্বীকৃতি'-পত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ পত্রিকাগুলির নাম উল্লেখ করেছি। অসাবধানতার জন্য এই সঙ্কলনের প্রথম প্রবন্ধই 'স্বীকৃতি' থেকে বাদ পড়েছে। এটি একটি ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ। ইংরেজী রচনাটি **Trade and Society in Early Medieval Bengal** শীর্ষনামে *Indian Historical Review* পত্রিকায় **(vol. IV, No. 2, January, 1978)** ছাপা হয়েছিল।

বাংলা একাডেমীর কর্তৃপক্ষ এই সঙ্কলন প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন বলে তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

মমতাজুর রহমান তরফদার

প্রবন্ধ-সূচী

প্রাক-মুসলিম যুগের বাংলায় সামন্ততন্ত্রঃ ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমাজ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতনের পর ভারতে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও আর্থনীতিক রূপান্তর ঘটেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও নগরকেন্দ্রগুলির ক্ষয়িষ্ণুতার ভিতর দিয়ে এই পরিবর্তনের লক্ষণগুলি প্রকাশ পাচ্ছিল। তার ফলে ভারতের বহু অঞ্চলে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির (money economy) স্থানে পণ্য-বিনিময়ের রীতি (natural economy) প্রাধান্য পেয়েছিল। সমগ্র প্রক্রিয়ায় ভূমিদান প্রথা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের আর্থনীতিক ইতিহাসের কতকগুলি দিকের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে কয়েকজন ঐতিহাসিক এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে "ভারতীয় সামন্তবাদ" বলে আখ্যায়িত করেছেন। কোসাম্বী ও শর্মার লেখায় প্রায় সর্বভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটির প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। আর নীহাররঞ্জন রায় প্রাক্-মুসলিম যুগের বাংলায় আর্থনীতিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যায় ঐ ধরনের অভিমতের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।[১] যাঁরা সর্বভারতীয় ইতিহাস আলোচনায় সামন্তবাদের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন, তাঁরা সমগ্র পরিস্থিতির মধ্যে বিচ্ছিন্ন গ্রাম্য অর্থনীতির (closed village economy) উদ্ভবকে সাধারণতঃ এ ক্ষেত্রে একটি মৌলিক ও অপরিহার্য উপাদান হিসেবে ধরে নিয়েছেন। নীহাররঞ্জন রায় এ জাতীয় গ্রামীণ পরিস্থিতির প্রতি বেশী গুরুত্ব দেননি এবং 'সামন্তবাদ' শব্দটির ব্যবহারও তাঁর লেখায় খুব প্রকট নয় ; কিন্তু তাঁর আলোচনার বিশ্লেষণ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, সামন্তবাদের উদ্ভব তাঁর তাত্ত্বিক পর্যালোচনার কেন্দ্রে স্থান পেয়েছে ; আর এই সামন্তবাদের তত্ত্বের সঙ্গেই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য অঞ্চল (self-contained village unit) গঠনের ধারণা নিবিড়ভাবে জড়িত। দূরবর্তী অঞ্চলসমূহের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ভাটা ও নগরকেন্দ্রের ক্ষয়িষ্ণুতার ফলে মুদ্রা-ব্যবস্থার যে স্বল্পতা বা ক্ষেত্রবিশেষে অনুপস্থিতি দেখা দিয়েছিল—সেই পরিস্থিতির প্রতিও উপরোক্ত লেখকগণ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভারতের ইতিহাসে সামন্তবাদের উদ্ভব সম্পর্কিত তত্ত্বটির হয়ত বাস্তব ভিত্তি আছে ; কিন্তু কোনো কোনো অঞ্চলকে কেন্দ্র করে অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে গেলে হয়ত এই সামাজিক ও আর্থনীতিক সংগঠনের প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য বিভিন্নতা দেখা যাবে। প্রাক্-মুসলিম যুগের

উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার মুদ্রা-ব্যবস্থার সঙ্গে যদি সেই যুগের দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার মুদ্রার ইতিহাস তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা যায়, তা হলে এই বিভিন্নতার উদাহরণ মিলবে। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার নদী-ব্যবস্থা দ্বারা লালিত বাণিজ্য-পথ, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে বিক্রয়যোগ্য পণ্য উৎপাদন করার জন্য এ অঞ্চলের সামর্থ, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সক্রিয় নগরকেন্দ্র এবং কৃষি, শিল্প ও ব্যবসার ভিত্তিতে গঠিত অর্থনীতিকে চালু রাখার মত আমলাতান্ত্রিক কাঠামো জাতীয় উপাদামই বোধহয় এই বিভিন্নতা সৃষ্টি করেছিল। এ কথা অবশ্য বলা হচ্ছে না যে, এই উপাদানগুলির প্রত্যেকটি উক্ত আর্থনীতিক গঠনের প্রক্রিয়ায় অপরিহার্য উপকরণ হিসেবে কার্যকর ছিল।

দীর্ঘ পাল আমলে মুদ্রাব্যবস্থার অনুপস্থিতিকে "একটি অবোধ্য সমস্যা"[২] বলে মনে করা হয়েছে। নীহাররঞ্জন রায়ের আলোচনা ও যুক্তি থেকে মনে হয় যে, পাল-সেন আমলের বাংলার জীবন ছিল পণ্য-বিনিময় প্রথার বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। অত্যন্ত অনিশ্চিত ভিত্তির উপর নির্ভর করে কয়েকটি মাত্র মুদ্রাকে পাল যুগের মুদ্রা বলে ধরে নেওয়া হয়। সেন রাজাদের তাম্রলিপিতে উল্লিখিত 'পুরাণ' বা কপর্দক 'পুরাণ' শব্দটিকে সে যুগের মুদ্রা-ব্যবস্থার নির্দেশক বলে কেউ কেউ মনে করেন।[৩] কিন্তু এই মন্তব্য তেমন যুক্তিগ্রাহ্য নয়; কারণ আজ পর্যন্ত এই শ্রেণীর মুদ্রার একটি নমুনাও পাওয়া যায়নি। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষয়িষ্ণুতা এবং শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বল্পতার ফলে লোকগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশের কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীলতাই দেশে মুদ্রা-ব্যবস্থায় অনুপস্থিতির প্রধানতম কারণ।

তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ের খননকার্যের বিভিন্ন পর্যায়ে আবিষ্কৃত গুপ্ত যুগের ও গুপ্ত যুগের পরবর্তীকালের ৩৫০টিরও[৪] বেশী মুদ্রা স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এই অঞ্চলে অন্ততঃ একটি পরিবর্তনশীল, মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি চালু ছিল। মুদ্রা-ব্যবস্থার সামগ্রিক অনুপস্থিতির ফলে কড়িই একমাত্র বিনিময়-মাধ্যম হিসেবে বাংলায় চালু হয়েছিল—বহুল প্রচলিত এই মতবাদের এখন আংশিকভাবে সংশোধন করা দরকার। গুপ্তদের মুদ্রা-ব্যবস্থায় ধাতুর বিশুদ্ধতা আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে বেশ কিছুদিন টিকে ছিল। আর এই মুদ্রা-ব্যবস্থায় বাংলার অংশ ছিল। গুপ্ত যুগের পরবর্তী কালে এ দেশের কোনো কোনো অঞ্চলের রাজারা এক ধরনের মুদ্রা চালু করেছিলেন যা সাধারণতঃ 'নকল গুপ্ত মুদ্রা' রূপে পরিচিত। গুপ্তকালীন মুদ্রারীতির সঙ্গে এই মুদ্রাগুলির সাদৃশ্য ও

সামঞ্জস্য ছিল ; কিন্তু ধাতুর বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে এগুলিতে ধারাবাহিক অবনতি ও রীতিগত অবক্ষয় সুস্পষ্ট। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত এ কথা বিশ্বাস করা হত যে, এই নকল গুপ্ত মুদ্রাগুলি ছয় ও সাত শতকে তৈরী করা হয়েছিল এবং স্বর্ণ ছাড়া অন্য কোনো ধাতু দিয়ে এ শ্রেণীর মুদ্রা অঙ্কিত হয়নি।[৫] ময়নামতীর আবিষ্ক্রিয়া থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, বাংলার নকল মুদ্রারীতি আরো দীর্ঘকাল ধরে চালু ছিল এবং এ জাতীয় মুদ্রার মধ্যে তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রাও আছে।[৬] নকল গুপ্ত **Archer** টাইপের একটি বিশিষ্ট স্বর্ণমুদ্রা স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, গুপ্ত সম্রাটদের মুদ্রার ঐতিহ্য আট শতকেও খুব সম্ভব দেব রাজাদের সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় অনুসৃত হয়েছিল।[৭] ময়নামতীতে প্রাপ্ত অধিকাংশ মুদ্রায় ষাঁড় ও ত্রিশূলের চিহ্ন আঁকা আছে। মনে করা হয় যে, এই মুদ্রাগুলির অঙ্কনের সময়কাল আট থেকে নয় শতকের মধ্যে পড়ে। এ অভিমতও প্রচলিত আছে যে, প্রাচীন আরাকানের মুদ্রার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত এই মুদ্রাগুলি হরিকেল-সমতট-বঙ্গের চন্দ্রবংশীয় শাসকগণ, যাদের রাজত্বকাল দশ থেকে এগার শতক পর্যন্ত বিস্তৃত, চালু করেছিলেন।[৮] যাঁরা মুদ্রাগুলির সময়কাল আট-নয় শতক বলে ধরে নেন[৯] লালমাই পাহাড়ের শালবন বিহারের খনন-কার্যের প্রত্নতাত্ত্বিক স্তরবিন্যাসের উপরই তাঁদের অনুমান নির্ভরশীল। খনন-কার্যের স্তরবিন্যাসের ভিত্তিতে, প্রাপ্ত বস্তুর সময়-সীমা নির্ধারণ সব সময়ে সঠিক ও যথার্থ নাও হতে পারে ; কারণ এ ক্ষেত্রে কার্বন-ডেটিং পদ্ধতিও অনিশ্চয়তা এড়াতে পারে না। এই মুদ্রাগুলির তারিখ নির্ণয়ের পূর্বে, প্রত্নতাত্বিক স্তরবিন্যাস ছাড়াও, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে প্রচলিত সেকালের মুদ্রাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, শাসক বংশগুলির আপেক্ষিক দুর্বলতা বা শক্তি, বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি চালু রাখার জন্য তারা যে আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল ছিল, তার অবস্থা এবং বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে, মুদ্রাতত্ত্ব, শিলালিপি-বিদ্যা ও সাহিত্য থেকে চয়ন করা তেমনি ধরনের প্রয়োজনীয় তথ্য ধর্তব্যের মধ্যে নেওয়া উচিত। লালমাই খনন-কার্যের তৃতীয় যুগের পর্যায়ে (**period III level**) প্রাপ্ত অদ্বিতীয় ধরনের স্বর্ণ মুদ্রাটি রীতির দিক দিয়ে নিখুঁত এবং এর প্রথম পীঠে লেখা আছে : 'শ্রীবঙ্গাল-মৃগাঙ্কস্য'। এই মুদ্রাটিকে আদিরূপ বা মডেল হিসেবে গ্রহণ করে আট এবং বোধ হয় নয় শতকেও এটির অনুকরণে আরো মুদ্রা তৈরী করা হয়েছিল। মুদ্রাটি নকল গুপ্ত **Archer** শ্রেণীর ; এতে করে এ অনুমান যথার্থ যে, দেব বংশের শাসকগণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গুপ্ত সম্রাটদের মুদ্রাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য চালু রেখেছিলেন। অত্যন্ত পুরনো ঐতিহ্য থেকে ঐ যুগে মারাত্মক রকমের

বিচ্ছিন্নতা ঘটেছিল, এ ধরনের অনুমানের আশ্রয় যদি আমরা না নিই, মুদ্রাতত্ত্বের উক্ত রক্ষণশীল প্রকৃতির কারণেই আমরা ষাঁড় ও ত্রিশূল চিহ্নযুক্ত মুদ্রাগুলিকে আট-নয় শতকের সময়-সীমার মধ্যে স্থাপন করতে পারি না। এই ধরনের স্বর্ণমুদ্রা এবং ষাঁড় ও ত্রিশূলের প্রতীক খচিত স্বর্ণ মুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতা[১০] বোধহয় ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, রৌপ্যের সঙ্গে তুলনায় স্বর্ণের দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল ; লালমাই পাহাড়ে অধিক সংখ্যায় ষাঁড় ও ত্রিশূল যুক্ত যে রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে, সেই মুদ্রাগুলি চালু করা হয়েছিল স্বর্ণমুদ্রার অভাব পূরণ করে লেনদেনের নিম্নমানের একটি মাধ্যমকে দেশের অর্থনীতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে গ্রথিত করে দেওয়ার জন্য। যে চন্দ্ররাজগণ আরাকান থেকে প্রথমে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে এসেছিলেন তাঁরাই যে উপরে উল্লিখিত নতুন শ্রেণীর মুদ্রা এ দেশে চালু করেছিলেন, এ ধারণা যুক্তিগ্রাহ্য। তাঁরা ছিলেন এ দেশে নবাগত সেইজন্য এ দেশের প্রচলিত মুদ্রা-ব্যবস্থা বা মুদ্রার ঐতিহ্যের প্রতি তাঁদের বিশেষ কোনো আকর্ষণ থাকার কথা নয় ; তাঁদের আদি বাসভূমি আরাকানে প্রচলিত মুদ্রায় যে সকল মোটিফ এবং প্রতীক-চিহ্ন চালু ছিল[১১] তারই অনুকরণ করা তাঁদের পক্ষে ছিল স্বাভাবিক। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার চন্দ্র রাজাদের ষাঁড় ও ত্রিশূল চিহ্নযুক্ত মুদ্রাগুলি আরাকানের চন্দ্র রাজবংশের (৭৮৮–৯৫৭ খ্রীঃ) একটি বিশেষ শ্রেণীর মুদ্রার সঙ্গে আশ্চর্য রকম সাদৃশযুক্ত বলে এই অভিমত নিশ্চিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ষাঁড় ও ত্রিশূলের চিহ্নধারী এই রৌপ্যমুদ্রাগুলির খুঁটিনাটি উপাদানে বিভিন্নতা এবং তাদের মোটিফের ক্রমিক অবনতি ইঙ্গিত দেয় যে, তারা দীর্ঘ সময় ধরে অঙ্কিত হয়ে আসছিল। এই মুদ্রাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সিলেট, কুমিল্লা ও রাজশাহীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এ জাতীয় মুদ্রার আবিষ্কার, চন্দ্র রাজগণের রাজ্যের বিশাল পরিধি ও তাঁদের সুদীর্ঘ রাজত্বকাল এবং তাঁদের সময়ের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যদি একত্র করে চিন্তার মধ্যে আনা যায়, তবে তাঁদের সঙ্গে মুদ্রাগুলির সরাসরি সম্পর্ক কল্পনা না করে পারা যায় না। প্রাপ্ত তাম্র শাসনগুলি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এই চন্দ্র রাজগণই একটি স্থিতিশীল আমলাতন্ত্রও গড়ে তুলেছিলেন।

এই নিবন্ধে আমরা যে অনুমানভিত্তিক প্রকল্প উপস্থাপিত করতে যাচ্ছি, মুদ্রাগুলির সন তারিখ নির্ণয়ের সমস্যা তাতে বিষয়গতভাবে কোনো বাধা দিতে পারবে না। মুদ্রার সনতারিখের বিভিন্নতা প্রাক্-মুসলিম যুগের পূর্ব ভারতে মুদ্রা-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির সময়-সীমাকে বাড়াতে অথবা কমাতে পারে। এ অঞ্চলের মুদ্রা-ব্যবস্থার ইতিহাসে বিচ্ছিন্নতার পর্যায়টিই বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রাক্-মুসলিম যুগের বাংলার মুদ্রাব্যবস্থার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিবার পর এ কথা বলা যেতে পারে যে, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার শাসকগণ ছয় শতক থেকে শুরু করে প্রায় এগার শতক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ক্রমাগতভাবে মুদ্রা অঙ্কন করেছিলেন; কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার উপর যে পাল-সেন রাজগণ শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, তাঁরা বোধ হয় মান-সম্পন্ন কোনো মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রয়োজনবোধ করেননি। মুদ্রাতাত্ত্বিক উপকরণগুলি এ ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতির প্রতিনিধিত্ব করছে, তা বোধ হয় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছে। ইয়োরোপের সঙ্গে গুপ্ত যুগের বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল; কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের পতন ও এই সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করে সামুদ্রিক বাণিজ্যের যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার অবক্ষয় বাংলার সেই বাণিজ্যিক সম্পর্কে বোধ হয় ছেদ টেনে দিয়েছিল। এই ঘটনার ফলে শিল্প উৎপাদন, নগরকেন্দ্র ও মুদ্রা-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে খুব সম্ভব অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল এবং তাতে করে এ দেশের সমাজের আর্থনীতিক বুনিয়াদ ভীষণভাবে বদলে গিয়েছিল।[১২] টাকা পয়সার হিসাবে পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের জন্য বোধ হয় কোনো মান-সম্পন্ন মুদ্রা প্রচলনের আর প্রয়োজন ছিল না। দেশে বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল হয় অনুপস্থিত, নয়ত গুরুত্ববিহীন। সেইজন্য পণ্য-বিনিময় প্রথা অথবা কড়ির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য স্বাভাবিকভাবে চালু হয়েছিল।

কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার কাহিনী এ ক্ষেত্রে ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। দেশের আর্থনীতিক প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলের শাসকগণ একটি মুদ্রা-ব্যবস্থাকে চালু রাখার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। ময়নামতীর কুটিলা মুরার খনন-কার্যের তৃতীয় পর্যায়ের উপরের স্তরে মুসতাসিম বিল্লাহর (১২৪২-৫৮খ্রীঃ) একটি স্বর্ণমুদ্রা সহ যে কয়টি আব্বাসীয় রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে[১৩] তা এই অঞ্চলের সঙ্গে আরবদের বাণিজ্য-সম্পর্ক সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেয়। একবার যদি প্রমাণিত হয় যে, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ময়নামতীর রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির সঙ্গে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, তা হলে মুসলিম বিজয়ের পূর্ববর্তীকালে কয়েক শতক ধরে এ অঞ্চলে মুদ্রা-ব্যবস্থায় ধারাবাহিক প্রচলনের ঘটনাটির ব্যাখ্যা দেওয়া কোনো কঠিন কাজ নয়। খনন-কার্যের তৃতীয় যুগ পর্যায়ে প্রাপ্ত গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রাসহ নকল গুপ্ত মুদ্রাগুলি দশ শতক পর্যন্ত ময়নামতী-লালমাইয়ের নগরকেন্দ্রগুলির চূড়ান্ত রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দেয়। আরাকানী মুদ্রার সঙ্গে সাদৃশ্যময় ষাঁড় ও ত্রিশূলের প্রতীকযুক্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে এই গুরুত্বের কালকে এগার শতকের

সীমারেখা পর্যন্ত টেনে আনে ; অবশ্য এই মুদ্রাগুলি যে চন্দ্র রাজাদের সময়ের-- এই অনুমানটিকে আমরা যদি অগ্রাহ্য না করি। এগার ও বার শতকের কোনো দেশী মুদ্রা যদিও ময়নামতী অঞ্চলে আজো পাওয়া যায়নি, তবুও এখানে আবিষ্কৃত একাধিক আব্বাসীয় খলীফার স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের ইতিহাসে প্রবহমানতার ইঙ্গিত দেয়।

দেশী মুদ্রার তাৎপর্য যথেষ্ট ; কারণ তা' বাণিজ্যিক স্তরে লেনদেনের সুবিধার জন্য প্রচলিত একটি মুদ্রা-মাধ্যমের অস্তিত্বেরই শুধু প্রমাণ দেয় না, বরং বিদেশ থেকে ক্রমাগত সোনারূপার আমদানী সম্বন্ধেও সাক্ষ্য দেয়। ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলে সোনারূপার কোনো খনি ছিল না ; সেইজন্য দক্ষিণ চীন, ব্রহ্মদেশ, পেগু ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে এই মূল্যবান ধাতু দুটির উৎস খুঁজে বের করতে হবে [১৪]

বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল যদি প্রতিবেশী দেশগুলির চাহিদা অনুযায়ী পণ্য দ্রব্যাদি রপ্তানী করতে পারত, তবেই কিন্তু সোনারূপার আমদানী সম্ভব হত। এ ক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা ও ব্যবহারযোগ্য বাণিজ্যপথের উপর অবস্থিত নগরকেন্দ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব ধারণা পোষণ করতে হচ্ছে। লালমাই পাহাড়ের খনন-কার্যের ফলে উল্লেখযোগ্য মানের মাটির বাসন পত্রাদি পাওয়া গেছে এবং বর্তমান কালেও কুম্ভকারগণ ময়নামতী-লালমাই অঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারিকর শ্রেণী হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে।[১৫] তা ছাড়া সুলায়মান ও ইব্‌ন্ খুর্‌দাদ্‌বিহ্ কর্তৃক উল্লিখিত রহমীর সূক্ষ্ম বা মোটা সূতী বস্ত্র ও মুসাব্বর[১৬] নিশ্চয়ই প্রধান রপ্তানী দ্রব্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। এ অঞ্চলের তাঁতি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরোক্ষ প্রমাণও আছে। কিছু দিন আগেও কুমিল্লার ও তার পার্শ্ববর্তী ঢাকা ও নোয়াখালী অঞ্চলে যে নাথ যোগিগণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিল, তারাও ছিল পেশার দিক দিয়ে তাঁতি।[১৭] কুমার ও তাঁতী শ্রেণীর কারিকরদের মধ্যে প্রাচীন কালে মৌলিকভাবে সামাজিক গতিশীলতার অভাব ছিল। সেইজন্য ধরে নেওয়া যাচ্ছে যে, প্রাক্-মুসলিম যুগেও তারা কুমিল্লা অঞ্চলে দুটি প্রধান সামাজিক ও আর্থনীতিক শ্রেণী হিসেবে বর্তমান ছিল। মনে হয় যে, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা সূতীবস্ত্র, মৃৎপাত্র এবং হয়ত বা চালের বিনিময়ে দক্ষিণ চীন, ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানী করত।

বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রবহমানতা বা অবক্ষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাগুলিকে বুঝতে হলে সমগ্র পরিস্থিতির পরিমাণগত বিশ্লেষণ

আবশ্যক। আমাদের জ্ঞানের বর্তমান পর্যায়ে এই কার্যটি অসম্ভব। আমদানী-রপ্তানীর খুঁটিনাটি তথ্য এবং নির্দিষ্ট মরশুমের বাণিজ্যিক পরিসংখ্যান, হিসেব-নিকেশ ও উদ্বৃত্তের ভাগ—এ সবের মধ্যকার কোনো উপাদানই সেকালের আর্থনীতিক ইতিহাস সম্বন্ধে যিনি গবেষণা করছেন, তাঁর কাছে কেউ এনে দিতে পারবে না। এগুলি অবশ্য আধুনিক আর্থনীতিক ইতিহাসের কোনো কোনো ক্ষেত্রে সহজলভ্য। সোনা, রূপা ও ব্রঞ্জের সাহায্যে মুদ্রা ও দেবদেবীর মূর্তি তৈরী হত। এই সব ধাতু সরবরাহের নিরবচ্ছিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে অনুমান করা যায় যে, কিছুদিনের জন্য অন্তত বাণিজ্যলব্ধ ধনসম্পদের উদ্বৃত্ত অংশ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় আসত।

প্রমাণের আভাস-ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করে এই ব্যবসা-বাণিজ্যের দু'একটি দিক সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করছি। নয় শতকে সুলায়মান রুহমীর "মিহি ও সূক্ষ্ম" সুতী বস্ত্র দেখেছিলেন।[১৮] প্রাথমিক যুগের আরব ভৌগোলিকগণ উল্লেখ করেছেন "সমন্দর" (বোধ হয় চট্টগ্রাম) বন্দরের—এই বন্দর ছিল "একটি বিশাল শহর, বাণিজ্য-নির্ভর ও সমৃদ্ধ এবং এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল অত্যন্ত লাভ জনক।"[১৯] এই তথ্যগুলি সে যুগের বাংলার বাণিজ্যের ইতিহাসে কিছু আলোকপাত করছে। মার্কো পোলো জানাচ্ছেন যে, দক্ষিণ চীনের য়ুন-নান প্রদেশে যে কড়ির প্রচলন ছিল, তা সেখানে ভারতীয় বণিক কর্তৃক আনিত হয়েছিল।[২০] অতএব আমরা অনুমান করতে পারি যে "লুসাই ও ত্রিপুরা পাহাড়ের মধ্য দিয়ে নির্মিত একটি পথ ধরেই"[২১] দক্ষিণ চীনের সঙ্গে বাংলার ব্যবসায়িক সম্পর্ক চালু ছিল। আরাকান-পেগুসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে সূতীবস্ত্র তৈরী হত না বলে তারা উক্ত পণ্যের জন্য বাংলার উপর নির্ভরশীল ছিল।[২২]

এ কথা মনে করা হয় যে, মালাবার উপকূলে অবস্থিত কুইলন নামক বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে আরব বণিকগণ চীনের উদ্দেশে রওয়ানা দিত এবং বাংলার উপকূল-ভাগ স্পর্শ না করেই মালয়ের অন্তর্গত কালাহ বন্দরে সরাসরি গিয়ে হাজির হত। ভারতের উপকূল সম্বন্ধে আরবী বিবরণগুলি যদিও পৌরাণিক ভূগোলের কুয়াশায় আচ্ছন্ন, তবুও ইব্‌ন্ খুর্‌দাদ্‌বিহ্ "পাল্‌ক্ প্রণালীর ভেতর দিয়ে এবং বঙ্গোপসাগরের তীরাঞ্চল ধরে একটি তীর-কেন্দ্রিক সমুদ্র-যাত্রা...."[২৩] সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছেন। নয় শতক থেকে বার শতকের মধ্যে জীবিত সুলাইমান, ইব্‌ন্ খুর্‌দাদ্‌বিহ্ ও ইদ্রিসীর চট্টগ্রাম-আরাকান অঞ্চলের (রুহমী বা রহমী) রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান এবং ময়নামতীর ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে পাওয়া আব্বাসীয় দীনার

ও দিরহাম প্রায় নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তের সমর্থক যে, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার নগরকেন্দ্রগুলিতে আরব বণিকদের আগমন ঘটত এবং তারাই আবার এই অঞ্চলের পণ্যগুলিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং পশ্চিম এশিয়ায় নিয়ে যেত। সাত থেকে দশ শতকের মধ্যে মালয় উপদ্বীপ ও ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের যে সকল স্থানে আরব উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে পালেংবাম, লাম্রী (পরে পেদির নামে পরিচিত) এবং কালাহ্ পেগু বন্দর স্পর্শকারী সমুদ্র-বাণিজ্যের একটি রেখাপথ দ্বারা বোধ হয় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। সমসাময়িক কালের এই ভৌগোলিক ও বাণিজ্যিক পরিস্থিতি ধর্তব্যের মধ্যে নিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের যোগসূত্রের সিদ্ধান্তটি শক্তিশালী হয়। তা ছাড়া শালবন বিহারের স্থাপত্য-শৈলীর সঙ্গে সাদৃশ্যবহুল, বার্মার অন্তর্গত পাগানের (আনন্দ মন্দির, ১০৯০ খ্রীঃ) এবং মধ্য জাভার কালাসনের (৭৭৮ খ্রীঃ) ধর্মীয় ইমারতগুলি এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার জীবনে যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল,[২৪] তারও আবহ, এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত ইঙ্গিতময়। বাণিজ্য-পথের অনুসরণে সংস্কৃতি সহজেই পরিব্যাপ্ত হত এবং ব্রহ্মদেশে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাংস্কৃতিক প্রভাবের একমাত্র উৎস হিসেবে পাল সাম্রাজ্যকে গণ্য করারও কোনো কারণ নেই। ভৌগোলিক নৈকট্যের পরিস্থিতির প্রতি যদি গুরুত্ব দেওয়া যায়, তা হলে একথা বলার সঙ্গত কারণ আছে যে, আরাকান-বার্মা, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যকার সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগসূত্র হিসেবে সক্রিয় ছিল।

প্রাক্-মুসলিম যুগে হরিকেল, সমতট ও বঙ্গ একত্রভাবে ছিল একটি আর্থনীতিক ইউনিট যার অংশগুলো নদীপথ ধরে পরস্পরের মধ্যে অনবরত যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। ময়নামতী-লালমাইয়ের নগরকেন্দ্রগুলি মান-সম্পন্ন একটি মুদ্রা-ব্যবস্থা দ্বারা লালিত ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা পেয়ে আসছিল। যে ক্ষীরোদা নদী ময়নামতীকে পরীখার আকারে ঘিরে রেখেছিল[২৫]। তারই দু' পাশে অবস্থিত অঞ্চলের পশ্চাদভূমির সঙ্গে এই নগরকেন্দ্রগুলি যোগাযোগ রেখেছিল। এই নদী বোধ হয় প্রথম দিকে গোমতীর শাখা ছিল এবং মেঘনার সঙ্গে যুক্ত[২৬] ডাকাতিয়ায় গিয়ে পড়ত। অতএব একটি বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে এই প্রাকৃতিক নদী ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ নিশ্চিতভাবে নিয়ন্ত্রিত হত। এ কথাও মনে করা যুক্তিসঙ্গত যে, দেব পর্বত ও ময়নামতী–লালমাই অঞ্চলের অন্যান্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র চট্টগ্রামের সঙ্গে এবং আরাকানগামী রাস্তার উপর অবস্থিত কক্সবাজারের নিকটবর্তী রামর সঙ্গে একটি স্থলপথ ধরেও যোগাযোগ রক্ষা করত।

চৌদ্দ শতকে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ কর্তৃক নির্মিত উঁচু রাস্তার সঙ্গে এই রাস্তা হয়ত সমান্তরাল, নয়ত অভিন্ন ছিল।[২৭] চট্টগ্রাম এবং রামু, অথবা আরো যুক্তিসঙ্গতভাবে বলতে গেলে দিয়াং, যার প্রাচীনত্ব প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক উপকরণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে,[২৮] সে ক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সমুদ্র-বন্দর হিসেবে কাজ করেছিল। দশ শতক থেকে বার শতক পর্যন্ত বিক্রমপুর ছিল একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র। সে কালের তাম্রলিপিগুলিতে উল্লিখিত "জয়-স্কন্ধাবার"[২৯] শব্দ-সমষ্টিকে এই শহরের নামের সঙ্গে যুক্ত দেখে এর রাজনৈতিক ও সামরিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। বর্তমানে যে ধলেশ্বরী নদী মেঘনায় গিয়ে পড়ছে, তার তীরে বিক্রমপুরের অবস্থান থেকে বুঝতে পারা যায় যে, শহরটির বোধহয় কিছু বাণিজ্যিক গুরুত্বও ছিল। তাম্রলিপি এবং মুদ্রায় সমতট মণ্ডলে অবস্থিত পট্টিকেরা শহরের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সুস্পষ্ট।[৩০] ক্ষীরোদা ও গোমতী নদীর নিকটে এই নগরের অবস্থান এবং টাকশাল হিসেবে এর ভূমিকা দেশের আর্থনীতিক জীবনে এই স্থানটির গুরুত্ব নির্দেশ করে। লড়হচন্দ্রের একটি তাম্র শাসনে বৃতিপুরের "হট্টক" উল্লিখিত হয়েছে। স্থানটির নামের শেষে "পুর" শব্দটির প্রয়োগ এবং এর সঙ্গে আবার "হট্টক" বা হাট শব্দটির সংযোগ নিঃসন্দেহে এর নাগরিক ও বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সঙ্কেত দেয়। সে যুগের তাম্র-লিপিগুলিতে চট্টগ্রাম ও রামুর উল্লেখ নেই। শহর দুটির অস্তিত্ব আরব লেখকদের বিবরণ থেকে আন্দাজ করা যায়।[৩১]

সাহিত্যিক ও মুদ্রাতাত্ত্বিক উৎস থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে যে প্রমাণাভাস পাওয়া যাচ্ছে, তা কিন্তু দেব, চন্দ্র ও বর্মণ শাসনকালে তৈরী তাম্রশাসনগুলিতে প্রতিফলিত হয়নি; সমাজ কতটা বাণিজ্য-নির্ভর হয়েছিল, সেই জন্য তা নির্ণয় করা কঠিন। তাম্রলিপিগুলিতে বণিক সম্প্রদায় এবং দক্ষ কারিকর বা তাদের প্রতিনিধি 'সার্থবাহ', 'নগরশ্রেষ্ঠী' এবং 'কুলিক' প্রভৃতির উল্লেখ নেই, যদিও গুপ্তকালীন লিপিগুলিতে তাদের সন্ধান ঘন ঘন পাওয়া যাচ্ছে। তাম্রশাসনগুলির গতানুগতিক অংশে প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই উচচ ও নিম্ন শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী ও তাদের সহযোগীদের উল্লেখ আছে। এতে করে একটি স্থিতিশীল আমলাতন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। 'রাণক' এবং 'রাজ্ঞী' জাতীয় শব্দ বোধ হয় সামন্ত প্রধানদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আভাস দেয়। ব্রাহ্মণ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধিক পরিমাণে যে ভূমি দান করা হয়েছিল, সেই ভূমির সীমার ভিতরে অবস্থিত যে শ্রেণীর লোকজনের কাছে থেকে তারা সেবা লাভ করত, তারা হচ্ছে মালাকার, তৈলিক, কুম্ভকার, কাহ্নিক, চর্মকার, সূত্রধর, স্থপতি, নাপিত, রজক, বৈদ্য এবং

আরো অনেকেই।[৩২] প্রদত্ত ভূমি ছিল করমুক্ত যাতে করে জমির গ্রহীতা ঐ জমি থেকে যথেষ্ট আয় করতে পারত। লিপিগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতে 'পীড়ম্' বা বাধ্যতামূলক শ্রমের উল্লেখ আছে। এই সব তথ্য ত স্পষ্টভাবেই এই ইঙ্গিত দেয় যে, সমাজের গঠন ছিল প্রধানতঃ সামন্ততান্ত্রিক প্রকৃতির। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, শিলালিপিগুলি থেকে কতকগুলি সামাজিক ও আর্থনীতিক শ্রেণী বাদ গেছে, তা হলেও ত দেখা যাচ্ছে যে সমাজ ছিল কৃষি নির্ভর এবং শাসক ও কৃষকের মধ্যে মধ্যস্বত্তভোগীদের একটি ব্যাপক স্তরবিন্যাস বিদ্যমান ছিল। এই সামন্ততান্ত্রিক স্তরবিন্যাসের মধ্যে সে যুগের আমলাতন্ত্র ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র বিশেষ।

সাম্প্রতিক কালের কিছু সংখ্যক লেখায়[৩৩] ময়নামতী-লালমাই ও বিক্রমপুরের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির ভূমি-নির্ভর ভিত্তির প্রতি বোধ হয় কিছুটা সঙ্গতভাবেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভূমিদানের দলিলগুলিতে যে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির ইঙ্গিত বিধৃত, তা' বোধ হয় একটি মান-সম্পন্ন মুদ্রা-ব্যবস্থা দ্বারা লালিত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও নগর কেন্দ্রের উদ্ভবের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয় না। সামন্ত শাসকদের প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলির অবস্থান যদি বাণিজ্যপথের উপর হত এবং তাদেরকে বাণিজ্যিকভাবে চালু রাখার মত কারিকর শ্রেণীসহ তাদের আশেপাশে যদি বেশ কিছু শিল্পকেন্দ্র থাকত, তা হলেই ত প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলির বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিত। উপরে উল্লিখিত ব্যবসা-কেন্দ্রগুলি সম্ভবতঃ এইসব শর্ত পূরণ করেছিল।

কিন্তু এগার ও তের শতকের মধ্যবর্তী যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য ও নগরকেন্দ্রের অবক্ষয়ের স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এ প্রক্রিয়াটি আরো আগেই শুরু হয়েছিল। আমরা দেববংশের রাজাদের নকল স্বর্ণ মুদ্রা-ব্যবস্থার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এই মুদ্রার মোটিফ সংক্রান্ত পূর্ণতা ও ধাতব বিশুদ্ধতা দেব রাজ্যের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং আর্থিক সমৃদ্ধির ইঙ্গিতবাহী—যার সমর্থন আছে ময়নামতীর খননকার্যেও। এ কথা মনে করা যেতে পারে যে, দেব বংশের শাসকদের ধনসম্পদের একটি বিরাট অংশ এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে। কিন্তু শালবন বিহারে আবিষ্কৃত, ষাঁড় ও ত্রিশূলযুক্ত মুদ্রার মানগত অবনতি, দেশে ঐ একই শ্রেণীর রৌপ্যমুদ্রার বহুল প্রচলন এবং বার শতকে দেশী মুদ্রা-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপ সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের নির্দেশ দিচ্ছে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, তা হলে এ ধরনের ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রিয়াশীল কতকগুলি

শক্তির প্রবাহের মধ্যে। চন্দ্রবংশের পতনের পর বর্মণ ও দুর্বল সেন রাজাদের অধীনে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ বোধহয় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের প্রক্রিয়ার আবর্তে পড়ে গিয়েছিল—চন্দ্র রাজারা যে আমলাতন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন, তাও প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। ভূমিদানের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম এই অবস্থায় প্রায় অপরিহার্য ছিল; তা কৃষি ও শিল্প উৎপাদন এবং বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলিকেও সহজে বিপর্যস্ত করতে পারত। ময়নামতী-লাইমাই অঞ্চলের ভূ-স্তর গঠন লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যায় যে, মৃত্তিকা-স্তরে উত্তোলন ক্রিয়া ঘটেছিল। তাতে করে পাহাড়ের পূর্ব দিকে নদীর প্রবাহ পলি মাটিতে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং সমুদ্র তীর আরো দক্ষিণে সরে গিয়েছিল।[৩৪] এই ভূ-তাত্ত্বিক পরিবর্তন ক্রমাগতভাবে দীর্ঘ সময় ধরে নিশ্চয়ই ঘটেছিল; কিন্তু ঐ অঞ্চলের অর্থনীতির উপর এর প্রভাব হয়েছিল মারাত্মক।[৩৫] মেঘনা-ডাকাতিয়া নদী-ব্যবস্থার মাধ্যমে ময়নামতীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন তখন আর সম্ভবপর ছিল না। যে সামুদ্রিক বাণিজ্য এ অঞ্চলের সমৃদ্ধির কারণ ছিল, নগর কেন্দ্রগুলি এবার সেই বাণিজ্যই হারিয়ে ফেলল। বণিক ও কারিকর শ্রেণী বোধ হয় অন্যান্য পেশাদার শ্রেণী-সমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল এবং নগরকেন্দ্রগুলির বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট্যও ক্রমশঃ লোপ পেল। দেব পর্বত এবং পট্টিকেরার যে অবস্থা হয়েছিল, বিক্রমপুরের ভাগ্যেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। যে ধলেশ্বরী-মেঘনার উপর বিক্রমপুর তার আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য নির্ভরশীল ছিল সেই নদীগুলির গতিবিধির পরিবর্তনের ঘটনার সাহায্যেই এই শহরের ক্ষয়িষ্ণুতা বা বিলুপ্তি ব্যাখ্যা করা যায়। বিভিন্ন সময়ে বন্যার দরুন যে পলিমাটি জমত, তাই নদীপথের পরিবর্তন ঘটাত। তার ফলে নদীপথে পণ্যদ্রব্যাদির গতিবিধিতে মারাত্মক রকমের বাধা সৃষ্টি হত এবং নগরকেন্দ্রগুলির বাণিজ্যিক অস্তিত্বও বিপন্ন হত। করমণ্ডল ও জাভার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমাগত বৃদ্ধিই বোধ হয় বহিরাগত শক্তি হিসেবে বাংলার বাণিজ্যিক পরিস্থিতিকে এই পর্যায়ে বিপদসঙ্কুল করে তুলেছিল;[৩৬] ঐ দেশ দুটির সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করার শক্তি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার ছিল না। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ও শ্রীবিজয়ের বৌদ্ধ রাজাদের মধ্যে বোধ হয় সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ১০২১-২৪ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গের উপর রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণ[৩৭] এই সম্পর্ককে দুর্বল করে দেওয়ার জন্যই পরিকল্পিত হয়েছিল। তার ফলে এগার শতকের মাঝামাঝি সময়ে দুই দেশের মধ্যকার পূর্বোক্ত সম্পর্ক বাণিজ্যিক ভিত্তি হারিয়ে ফেলেছিল। রামু বা দিয়াং-এর নিকটবর্তী কোনো বন্দর তখনো বোধ হয় চট্টগ্রাম-আরাকান এলাকার উপর দিয়ে পরিচালিত উপকূলীয় ব্যবসার

ক্ষেত্রে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করছিল;[৩৮] কিন্তু এই ব্যবসার তখন শুধুমাত্র স্থানীয় গুরুত্ব ছিল। তের শতক পর্যন্ত ময়নামতীর নগরকেন্দ্রগুলি টিকেছিল; তার প্রমাণ, সেখানে আব্বাসীয় স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার আবিষ্কার। এই এলাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত যে স্থলপথ ছিল, সেই পথের যোগাযোগ ব্যবস্থাই ঐ নগরগুলির ব্যবসা-বাণিজ্যকে বোধ হয় কোনো রকমভাবে জিইয়ে রেখেছিল; কিন্তু দূরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে এ দেশের বাণিজ্যে চূড়ান্তভাবে ভাটা পড়েছিল।

আট শতক থেকে তের শতক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে যখন ব্যবসা-বাণিজ্য চলছিল, তখন উত্তর ও উত্তর পশ্চিম বাংলায় নগরকেন্দ্রগুলি তাদের বাণিজ্যিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছিল। তাম্রলিপ্ত ও গঙ্গাবন্দর নৌ চলাচলের জন্য তখন আর উপযুক্ত ছিল না; তার ফলে এই বন্দরগুলি থেকে যে বাণিজ্য-পথগুলি বিভিন্ন দিকে চলে গিয়েছিল, তারাও তাদের বাণিজ্যিক প্রয়োজনীয়তা হারাল। বিদেশী বণিকগণকে আকর্ষণ করার মত কোনো পণ্য-দ্রব্য এই বাণিজ্যকেন্দ্র দুটির পশ্চাদভূমিতে আর উৎপন্ন হত না। আঞ্চলিক বাণিজ্যে ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা দিয়েছিল যার ফলে বণিক ও কারিগর শ্রেণী কৃষি-কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিল। বোধ হয় এই পরিস্থিতিই পাল-সেন রাজাদের তাম্রশাসনে প্রতিফলিত হয়েছে—কারণ এই দলিলগুলিতে জমির চাহিদা বৃদ্ধির স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।[৩৯] যখন আমরা দেখি যে, নকল গুপ্ত মুদ্রাগুলির অধিকাংশই দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে পাওয়া গেছে এবং ষাঁড় ও ত্রিশূল চিহ্নযুক্ত মুদ্রাগুলিও চালু হয়েছিল পট্টিকেরা বা হরিকেল থেকে, অথচ পাল-সেন রাজাদের অধীনে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমবঙ্গে মুদ্রা-ব্যবস্থার অস্তিত্ব পর্যন্ত ছিল না, বাংলার দুটি অঞ্চলের আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যকার বিভিন্নতা আমাদের কাছে তখন স্পষ্টভাবে ধরা দেয়। দুটি অঞ্চলে প্রচলিত ভূমি হস্তান্তরের রীতিও এই পার্থক্যকে স্পষ্টতর করে তোলে। সমতট ছিল দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। এই এলাকায় ভূমিদান প্রসঙ্গে Barrie M. Morrison বলেছেন:[৪০]

> In contrast, the copper plates from Samatata record gifts to Buddhists, as well as to Brahmanas, rather than to an individual as is the case else where in the Delta. Many of the property holdings being transferred were much larger than those anywhere else. The large grants to institutions, along with continued minting of a high quality silver currency and the largest known concentration of major building

sites datable in this period in the whole of the Delta suggest that the rulers of Samatata were wealthier and were able to maintain a more stable political administration than other dynasties. Whatever the reason, property transfers in Samatata were different from those found elsewhere in the Delta.

সমতটের রাজাদের সম্পদ এবং সম্পত্তি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি তাঁদের মনোভাব বোধ হয় তাঁদের বাণিজ্যিক যোগাযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। পাল ও সেন রাজাদের তাম্র-শাসনগুলিতে ভূমির পরিমাপের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য ও রাজস্ব-পরিমাণের যে নির্দিষ্ট বিবরণ আছে, তাতে মনে হয় যে, ঘন লোক বসতি-সম্পন্ন, কৃষি অঞ্চলে ভূমি হস্তান্তর করা হয়েছিল। চন্দ্র রাজাদের তাম্রলিপিতে এই সব তথ্য নেই[৪১] বলে ধারণা করা যায় যে, সিলেট-ত্রিপুরা অঞ্চলে জমির উপর চাপ কম ছিল এবং কৃষির উপর নির্ভর না করে বেশ কিছু-সংখ্যক লোক ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। ময়নামতী ও পাহাড়পুরের স্থাপত্যের সাংগঠনিক বিন্যাসে, দুটি স্থানের মধ্যকার সাংস্কৃতিক যোগসূত্র বিধৃত; স্থান দুটিতে আবিষ্কৃত ভাস্কর্যের মোটিফ ও রূপ এবং সর্বোপরি এই বস্তুগুলিতে যে সাধারণ ধর্মীয় আবহ প্রাধান্য পেয়েছে, তা অঞ্চল দুটির মধ্যে আর্থিক ব্যাপারে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ইঙ্গিত দেয়, যদিও হয়ত এই যোগাযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্যের বিশদ বিবরণ কোনো দিনই জানতে পারা যাবে না।

পূর্ব ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই এ অঞ্চলে নগরকেন্দ্র ও বাণিজ্যপথের উদ্ভব ঘটেনি; গিয়াসউদ্দীন ইওয়াজ খিলজী (১২১৩–২৭ খ্রীঃ)[৪২] কর্তৃক মুদ্রার প্রচলনও বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তেমন কোনো পরিবর্তন আনেনি। বাংলার কয়েকজন স্বাধীন সুলতান এবং দিল্লীর সুলতানগণ কর্তৃক নিযুক্ত শাসকগণ তের শতক ধরে লক্ষ্ণণাবতীর টাকশাল থেকে মুদ্রা চালু করেছিলেন সম্ভবতঃ সেগুলিকে সার্বভৌমত্বের প্রতীকরূপে ব্যবহার করার জন্য। বাণিজ্যিক পর্যায়ে লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রাগুলি ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না বললেই চলে; কারণ আরব বণিকগণ কতৃক নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-রীতির সঙ্গে বাংলার যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে এ দেশের বাণিজ্য-পথ, নগরকেন্দ্র এবং শিল্প উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি তখনো যথার্থভাবে বিন্যস্ত ও সক্রিয় হয়ে ওঠেনি। চৌদ্দ শতকের প্রথমদিকে যখন বিভিন্ন শহরে কতকগুলি টাকশালের আবির্ভাব ঘটল এবং বিনিময়ের জন্য যখন পণ্যেরও উৎপাদন শুরু হল,[৪৩] তখনই পূর্বোক্ত স্থবির

পরিস্থিতিতে পরিবর্তন এল। এশিয়ার বাণিজ্য ও নৌ চালনার ক্ষেত্রে আরব বণিকগণ যে ভূমিকা পালন করে আসছিল, তার কথা মনে রাখলেই বোধ হয় বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিলম্বিত পুনরুজ্জীবনের সমস্যাটির ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। আরব বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে বোধ হয় চীনে মোঙ্গল আধিপত্য (১২০৬–১৩৬৮খ্রীঃ) স্থাপনের কিছুটা সম্পর্ক ছিল। যদিও মনে করা হয় যে, মোঙ্গল কর্তৃত্ব মৌলিক শক্তিসম্পন্ন একটি বিস্তৃত মুক্ত বাণিজ্যের এলাকা সৃষ্টি করেছিল, তবুও সবার চেয়ে এ ক্ষেত্রে আরব বণিকদের বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ ছিল। খুর্দাদ্বিহ্, সুলাইমান, চুয়ু (১১১১ খ্রীঃ), চৌ-কু-ফি (১১৭৮ খ্রীঃ) এবং চৌ জু-কুয়ার (১২২৫–৫০ খ্রীঃ) বিবরণ থেকে জানা যাচ্ছে যে, আরবগণসহ বিভিন্ন জাতীয়তার মুসলিম বণিক চীন, জাভা এবং সুমাত্রায় উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল।[৪৪] তের শতকের শেষ ভাগে এবং চৌদ্দ শতকের প্রথম ভাগে করমণ্ডল ও মালাবার উপকূলে চীনা বাণিজ্য অগ্রগতির চূড়ান্ত পর্যায়ে পেঁৗছে গিয়েছিল।[৪৫] চীন ও যাভা-সুমাত্রার মুসলিম উপনিবেশগুলিও এই সময়ে চীনা বণিকদের প্রাধান্যের ফলে ক্ষুণ্ন হয়েছিল। মার্কোপোলো (১২৫৭–৯১ খ্রীঃ) চীনের মুসলিম উপনিবেশ সম্বন্ধে কিছুই লেখেননি কেন, তা এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে; অথচ চীনের এই মুসলিম উপনিবেশগুলিই ত নয় থেকে বার শতকের মধ্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। মোঙ্গল প্রাধান্যের যুগে চীনা বণিকগণ যে বাংলার বন্দরগুলিতে আসত, তার কোনো প্রমাণ নেই ; সেই জন্য বাংলাকে করমণ্ডল উপকূলের অন্তর্গত মনে করে চৌ জু-কুয়া এ দেশের লোকজন ও পণ্যদ্রব্যাদির যে বিশৃঙ্খল বিবরণ দিয়েছেন,[৪৬] তাতে তাঁর এবং চীনবাসীদের এ দেশ সম্বন্ধে অজ্ঞতার ইঙ্গিত আছে। তা ছাড়া, আব্বাসীয় খিলাফতের ক্ষয়িষ্ণুতার যুগে এবং বিশেষ করে ১২৫৮ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদের পতনের পর, আরব বণিকগণ পরিবর্তিত বাণিজ্যিক পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিচ্ছিল। সিরাফ থেকে বসরা ও বাগদাদ পর্যন্ত বিস্তৃত নদীপথের সঙ্গে সংযুক্ত অঞ্চলের ব্যবসায়িক সমৃদ্ধির যে বিবরণ মার্কোপোলো দিয়েছেন[৪৭] তা এতই আন্দাজ-নির্ভর যে তাকে আক্ষরিকভাবে নেওয়ার কোনো কারণ নেই ; কেননা পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের উক্ত বাণিজ্যপথটি যেমন এক দিকে তের শতকের শেষ দিকে গুরুত্ব হারাচ্ছিল, তেমনি আবার অন্য দিকে আলেকজাণ্ড্রিয়া-এডেন-কাম্বে লাইনের দিকে প্রলম্বিত পথটি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক কারণে প্রাধান্য পাচ্ছিল। সেই অঞ্চলে, মালাবারে অবস্থিত কুইলনে[৪৮] এবং অন্যান্য যে সব বন্দরে পণ্য বিনিময়ের জন্য চীনা বণিকদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছিল সে সব স্থানেও আরবগণ তখনো অবশ্য

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যদিও তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল, বাংলার নগরকেন্দ্রগুলিতে তাদের আগমন নিয়মিতভাবে ঘটত না। ১৪০০ খ্রীস্টাব্দের পর যখন পূর্বদিকে মালাক্কা এবং পশ্চিমে কালিকট ও কাম্বে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের কেন্দ্র হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্ব পেল এবং গুজরাটি, করমণ্ডলীয় এবং বাঙ্গালী বণিক শ্রেণীর ভূমিকা যখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দেখা দিল, তখনই শুধু উপরোক্ত পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হল।[৪৯] বাণিজ্য-পথের গতি পরিবর্তন, ইয়োরোপে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মশলার জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে উপ-মহাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এ যুগের আরব-চীনা বণিকদের ভূমিকা বাণিজ্যিক পুনরুজ্জীবনের জন্য সরাসরিভাবে দায়ী ছিল; নগরকেন্দ্রসমূহের উদ্ভব, শিল্প উৎপাদন এবং মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি এই নতুন পরিস্থিতির অপরিহার্য উপাদান বিশেষ।

সামন্ততন্ত্রের প্রশ্নটির সঙ্গে প্রাচীন কালের বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য ও মুদ্রা-ব্যবস্থার সমস্যাটির তাত্ত্বিক সম্পর্ক আছে। যে সকল কৃষি-নির্ভর আর্থনীতিক সংগঠন এবং উপাদান সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি তৈরী করে, বাণিজ্যের প্রবহমানতা এবং মুদ্রা-ব্যবস্থার উপস্থিতি তার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয় না। পুরোহিতদের জমিজমা এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে কারিকর শ্রেণীর অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক ছিল বলে তাদের মধ্যে গতিশীলতার অভাব দেখা দিয়েছিল; সেই জন্য স্থানীয়ভাবে ব্যবহারের জন্য পণ্য সৃষ্টিতেই তারা উৎসাহ বোধ করত, বাণিজ্যিক বিনিময়ের জন্য উৎপাদন-কার্যে তাদের তেমন আগ্রহ থাকার সম্ভাবনা ছিল না। একটি স্থিতিশীল বাণিজ্য-নির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম দিতে পারে, এমনি ধরনের নাগরিকী-করণ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি পূর্বে উল্লিখিত বাণিজ্যিক কার্যাবলীর মাধ্যমে আদৌ সম্ভবপর ছিল না; কারণ বাণিজ্য-লব্ধ মুনাফা হয় বিদেশী বণিকদের হাতে চলে যাচ্ছিল নয়ত সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বা সামন্ত শ্রেণী দ্বারা উজাড় হচ্ছিল। এই অবস্থায় পুঁজির সৃষ্টি অসম্ভব ছিল এবং প্রধানতঃ কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে যে গ্রামীণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, ব্যবসা-বাণিজ্য ও মুদ্রা-ব্যবস্থা তাকে পরিবর্তিত করতে পারেনি।

তথ্য-নির্দেশ

১. D.D. Kosambi, *An Introduction to the Study of Indian History* (Bombay, 1956), ch. IX ; R.S. Sharma, *Indian Feudalism : 300--1200* (Calcutta, 1965) ; নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৫৯ ; সাম্প্রতিক কালের লেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য R.S. Sharma; "Problem of Transition from Ancient to Medival in Indian History," *The Indian Historical Review* (*IHR*), i, no. 1 (March, 1974), 1-9 ; "Methods and Problems of the Study of Feudalism in Early Medieval India," (*IHR*), i, no 1, 81-84 ; "Indian Feudalism Retouched," (*IHR*), i, no 2 (September, 1974), 319–30. ভারতীয় সামন্তবাদ সম্বন্ধে এই ধারণাগুলি খণ্ডনের প্রয়াস পেয়েছেন হরবংশ মুখিয়া, *Was there Feudalism in Indian History?* Presidential Address, Indian History Congress, Waltair, 1971. তাঁর বক্তব্য বিতর্কমূলক এবং শেষ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে হয় না।

২. R.C. Majumdar, ed., *History of Bengal*, 1, (Dacca, 1943), 668.

৩. ঐ ; নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১৯৬।

৪. M. Harunur Rashid, "The Mainamati Gold Coins", *Bangladesh Lalit Kala*, i, no 1 (1975), 41, 57-58 ; "The Origin and Early Kingdom of the Chandras of Rohitagiri," *Bangladesh Historical Studies*, ii (1977), 17-18 ; F.A. Khan, *Mainamati* (Karachi, 1963), 25-26.

৫. *History of Bengal*, i, 666-67.

৬. M.H. Rasaid, "The Mainamati Gold Coins," *Bangladesh Lalit Kala*, i, No. 1, 44.

৭. ঐ, 49-50, pl. XXIII, 3 ; F.A. Khan, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, 25 ; আমাদের এই প্রবন্ধে পরে আলোচিত এই স্বর্ণমুদ্রায় লেখা আছে, "শ্রীবঙ্গাল-মৃগাঙ্কস্য"।

৮. A.H. Dani, "Coins of the Chandra Kings of East Bengal," *Journal of the Numismatic Society of India* (*JNSI*), *xxiv*, nos. 1-2 (1962). 141-42 ; "Mainamati Plates of the Chandras," *Pakistan Archaeology*, iii (1966), 27 ; A.M. Choudhury, *Dynastic History of Bengal* (Dacca, 1967) 163-64.

৯. M.H. Rashid, The Mainamati Gold Coins," *Bangladesh Lalit Kala*, i, no. 1, 45 ; F.A. Khan, পূর্বোক্ত, 25.

১০. *Bangladesh Lalit Kala*, i, 1, 57-58.

১১. শ্রীচন্দ্রের রামপাল ও ধুল্লিয়া তাম্র শাসনে বলা হয়েছে যে, এই বংশের প্রথম শাসক পূর্ণচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল রোহিতাগিরিতে। "রোহিতাগিরি" বোধ হয় "রোসাঙ্গির" (আরাকানের) সংস্কৃত রূপ। নয় ও দশ শতকের চট্টগ্রামে আরাকানী আক্রমণের তথ্য এবং পরবর্তী কালে আরাকানী ও পট্টিকেরা রাজপরিবারের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্কের কথা আরাকানের কিংবদন্তিমূলক সাহিত্য থেকে জানা যায়। নয় শতকে আরাকানের চন্দ্রবংশের লোকজন হরিকেল বা চট্টগ্রামে রাজনৈতিক প্রাধান্য পায়। ত্রৈলোক্য চন্দ্র (৯০০—৯৩০ খ্রী:) কর্তৃক চন্দ্রদ্বীপ অধিকার এবং সমতট ও বঙ্গ বিজয় চন্দ্রবংশকে দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে একটি বড় রকমের রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে; *Pakistan Archaeology*, iii, *28*; A.M. Chowdhury, 158 ff.; *Bangladesh Historical Studies*, ii, 12 ff. ময়নামতী ও আরাকানী মুদ্রায় ষাঁড় ও ত্রিশূলের প্রতীকের ব্যবহার পট্টিকেরা ও আরাকানের চন্দ্র বংশীয় শাসকদের মধ্যকার পারিবারিক ও বংশানুক্রমিক সম্পর্কের নির্দেশক।

১২. *History of* ***Bengal***, 1, 666; নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, ১৯৭, ২৫৪, ৩৪৩ ৩৮২, ৪৬১, ৪৯৭, ৮৩৯—৪৪.

১৩. F.A. Khan, 25-27; *Bangladesh Lalit Kala*, i, no. 1, 58, pl. XXIV, 8.

১৪. মার্কো পোলোর বিবরণ থেকে জানা যাচ্ছে যে, দক্ষিণ চীনের উন্-নান অঞ্চলে এবং উত্তর বার্মায় সোনা ও রূপা পাওয়া যেত; *The Travels of Marco Polo*, tr. Ronald Natham, Penguin Books (London, 1959), 155, 158; চৌ জু-কুয়া বলেছেন যে, স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে বিদেশী বণিকগণ মালয়ের পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করত; Hirth and Rockhill, *Chau Ju-kua: His Work on The Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Centuries* (Taipei, 1964), 68-69; ষোল শতকের লেখক বার্বোসা ও টোমে পিরেসের বিবরণে পেগু এবং কেদার পণ্য বা রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যেও স্বর্ণ-রৌপ্যের উল্লেখ দেখা যায়; M.A.P. Meilink-Roelofsz, *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630* (The Hague, 1962), 70-71. পশ্চিম সুমাত্রার কোনো কোনো অংশে অত্যন্ত সমৃদ্ধ সোনার খনি ছিল; B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, Pt. I. (The Hague, 1955), 43, 52, 55, 56, 259, fn. 403.

১৫. F.A. Khan, 34-35.

১৬. Elliot and Dowson, *History of India As Told By Her Own Historians*, i, reprint (Allahabad, 1969), 5, 14, 361.

১৭. ১৯১০ সালে শুধুমাত্র ত্রিপুরা জেলায় যোগীর সংখ্যা ছিল ৬৮,০০০; I. E. Webster. *District Gazetteer of East Bengal and Assam: Tippera*

(Allahabad, 1910), 26; কল্যাণী মল্লিক, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী (কলিকাতা, ১৯৫০), ৯৫।

১৮. Elliot and Dowson, 5.

১৯. ঐ, 90.

২০. পূর্বোক্ত, ১৪৯।

২১. Simon Digby, *War Horse and Elephant in the Delhi Sultanate* (Oxford, 1971), 44.

২২. পিরেস, বার্বোসা ও ফিচের বিবরণ; Meilink Roelofsz, 68–69; M.R. Tarafdar, *Husain Shahi Bengal: A Socio—Political Study* (Dacca, 1965), 140—41; Arun Dasgupta, "Aspects of Bengal's Sea–borne Commerce in the Pre-European period," *Proceedings of the Third History Congress* (Dacca, 1973), 153.

২৩. G.F. Hourani, *Arab Sea-Fearing in the Indian Ocean in Ancient and Early Medieval Times* (Beirut, 1963), 171.

২৪. F.A. Khan, 11—12, 28; শ্রীবিজয়সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে তান্ত্রিক-বৌদ্ধ প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য G. Coedes, *The Indianised States of South-East Asia* (Hawai, 1968), 81—96.

২৫. শ্রীধারণ রাতার কল্যাণ তাম্রলিপি, *Indian Historical Quarterly* (*IHQ*), XXIII, 225, 237; শ্রীচন্দ্রের পশ্চিম ভাগ তাম্র-শাসন, A.B.M. Habibullah, ed. *Nalinikanta Bhattasali Commemmoration Volume* (Dacca, 1966), 172, 177–78; *Pakistan Archaeology*, iii, 31; A.M. Choudhury, 145–46; দেবপর্বত আট শতকে ছিল একটি রাজধানী শহর, (এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত ভবদেবের তাম্র-শাসন, *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, XVII, 93) এবং দশ শতকে বর্তমান ছিল একটি নগরীরূপে (পশ্চিম ভাগ তাম্র-শাসন)। ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণ অংশের ধ্বংস-স্তূপের সঙ্গে এই স্থানটিকে অভিন্ন বলে মনে করা হয়েছে; *IHQ* XXII, 169-71; Barrie M. Morrison, *Political Centers and Cultural Regions in Early Bengal* (Tucson, 1970), 33.

২৬. ক্ষীরোদা নদী গুঞ্জিয়াজুরি খালের সঙ্গে অভিন্ন। এই খাল কুমিল্লা শহর ও লালমাই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত এবং আরো দক্ষিণে ডাকাতিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত; M. Abu Bakr, *Reports of the Geological Survey of Bangladesh*, i, pt. 2 (Quarternary Geomorphic Evolution of the Brahmanbaria-Noakhali Area, Comilla and Noakhali Districts, Bangladesh) (Dacca, 1977), 40, figs. 11—14.

২৭. "ফখরুদ্দীনের পথ" নামে পরিচিত এই পথের চিহ্ন এখনো আছে। এই পথ ডেমরা-কমিল্লা-চট্টগ্রাম সড়কের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল।

২৮. *Bangladesh Historical Studies*, ii, 21, 23.
২৯. Barrie M. Morrison, 57, 162—63, 164—65, 167—68, 170.
৩০. লড়হচন্দ্রের (১০০০—১০২০ খ্রীঃ) ময়নামতী তাম্র-শাসনে পট্টিকেরকের উল্লেখ আছে। তিনি শ্রীলড়হ মাধব ভট্টারক নাম দিয়ে এখানে বাসুদেবের বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন; *Pakistan Archaeology*, iii, 40, 44, 48, 49; রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেবের ময়নামতী তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, পট্টিকেরক নগরে বৌদ্ধ বিহারের জন্য ভূমি দান করা হয়েছিল; *IHQ*, IX, 282—89; কয়েকজন পণ্ডিত ষাঁড় ও ত্রিশূল চিহ্নিত মুদ্রার লেখাকে "পট্টিকেরক" পড়ার পক্ষপাতী; *JNSI*, xxiv, 141; A.M. Choudhury, 162-64.
৩১. আরো দ্রষ্টব্য *Bangladesh Historical* Studies, ii 21.
৩২. এই পেশাদার শ্রেণীগুলির উল্লেখ আছে পশ্চিমভাগ তাম্র শাসনে; *N.K.B. Commemmoration Volume* 179, 180, 186-87; K.K. Gupta, *Copper Plates of Sylhet* (Sylhet, 1967), 92, 99, 106—7.
৩৩. Barrie M. Morrison, S53; "Changing Forms of Government in Early Bengal", *A.K. Sayhitya Visarad Commemmoration Volume*, ed. Enamul Haq (Dacca, 1972), 63—64.
৩৪. Barrie M. Morrison, *Political Centres*, 8; Abu Bakr, 5, 44 [J.P. Morgan and W.G. Mc Intire, "Quarternary Geology of the Bengal Basin, East Pakistan and India," *Bulletin of the Geological Society of America*, IXX (1959), 319—42, প্রবন্ধটি Morrison ও Abu Bakr কর্তৃক উল্লিখিত।]
৩৫. Abu Bakr, 44.
৩৬. করমণ্ডলে প্রাপ্ত "রেশমের রঙ্গীন সুতাযুক্ত সুতীবস্ত্র এবং সুতীবস্ত্র" এবং চোল রাজ্যে আরব বণিকদের যাতায়াত চৌ জু-কুয়া উল্লেখ করেছেন; পূর্বোক্ত, ৯৬, ৯৭; স্থানটির সুতীবস্ত্রের চাহিদা এবং বণিকদের উন্নত পর্যায়ের ব্যবসায়িক নীতি মার্কো পোলোরও নজরে পড়েছিল; পূর্বোক্ত, ২৪৭, ২৫০; চৌ কু'ফী (১১৭৮ খ্রীঃ) জাভার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছেন; Hirth and Rockhill 23, 78; আরো দ্রষ্টব্য B. Schrieke, 234--35 এবং Meilink Roelofsz, 16-17.
৩৭. *History of Bengal*, I, 137—39; A.M. Choudhury, 155, 156.
৩৮. *Bangladesh Historical Studies*, ii, 21.
৩৯. নীহাররঞ্জন রায়, ২৩৬—৩৭, ২৫৪।
৪০. Barrie M. Morrison, *Political Centers*, 125.
৪১. ঐ, ৯৯-১০০।
৪২. একটি মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু করার সময়ে ইওয়াজ খিলজী যে বাণিজ্যিক লেনদেনের কথাই ভাবছিলেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ৯৬ রতি বা ১৭২.২ গ্রেনের মুদ্রা অঙ্কনে। এই ওজন প্রাচীন পুরান মুদ্রার ৩২ রতি ওজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গিয়াসউদ্দীন

ইওয়াজ খিলজী কর্তৃক প্রবর্তিত এই ওজন প্রাক-মোগল যুগের ভারতে ব্যাপকভাবে মুদ্রায় ব্যবহৃত হয়েছিল; এমন কি সাম্প্রতিক কালের টাকাও ছিল এই ওজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ; M.R. Tarafdar, "Bengal's Relations with Her Neighbours–A Numismatic Study", *N.K, Bhattasali Commemmoration Volume, 228–29.*

৪৩. চৌদ্দ শতকের প্রথম দিকে লখনৌতি, সাত-গাঁও, গিয়াসপুর ও ফীরুজাবাদে মুসলিম সুলতানগণ কর্তৃক টাকশাল স্থাপন স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, নদীপথের উপর অবস্থিত এই শহরগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। ওয়াং টা-য়ুয়ান (১৩৪৯—৫০ খ্রী:) এ দেশের সুতীবস্ত্রসহ অন্যান্য পণ্যের উল্লেখ করেছেন; Rockhill, *T'oung pao*, 1915, p. 436. ইবন্ বতুতাও বাংলায় সোনা ও রূপার মুদ্রার প্রচলন দেখেছিলেন; Mahdi Husain, *The Rihla of Ibn Battuta* (Baroda, 1953), 234.

৪৪. Hourani, 72, 76–77; Hirth and Rockhill, 16-18, 22-23, 60, 64, fn. 2. 76, 80, fn. 3.

৪৫. B. Schrieke *Indonesian Sociological Studies*, pt. ii (The Hague and Bandung, 1957), 232.

৪৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৯৭।

৪৭. ঐ, ২১।

৪৮. ঐ, ২৬১।

৪৯. B. Schrieke, pt. i, 9–15; Meilink Roelofsz, 15, 19–20.

বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য ও যুগ-বিভাগ সমস্যা

এক

পাক-ভারত-বাংলাদেশ অঞ্চলের ইতিহাস আলোচনায় যুগ-বিভাগের (Periodisation) প্রশ্নটির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আজ পর্যন্ত অল্প-বিস্তর আলোচনা হয়েছে। লেখকগণ এ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন দলে বিভক্ত। এক দল মার্কস্‌বাদী পদ্ধতির অনুসারী এবং অন্য একটি দল ওয়েবারপন্থী। এ ছাড়া আরো আছে গতানুগতিকতার ছকে-ফেলা এক ধরনের রীতি যা বহুদিন ধরে ভারতীয় ও বিদেশী ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়ে আসছে। প্রাগৈতিহাসিক, অনার্য, বৈদিক, বৌদ্ধ, হিন্দু, এই ধরনের যুগ-বিভাগের পদ্ধতির মধ্যে পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর ঐতিহাসিক যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজে পান এবং তাঁরা এই পুরনো পদ্ধতিকে অবৈজ্ঞানিক বলে মনে করেন। কাল-বিভাজন সংক্রান্ত বিভিন্ন থিওরীর মূল্যায়ন বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর মধ্যে পড়ে না। তবে বর্তমান লেখকের ধারণা, উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে কোনো একটি যুগকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে গেলে সে প্রচেষ্টা সত্যিকারভাবে বিজ্ঞানসম্মত বা সার্থক হতে পারে না। যে সকল মতবাদের কথা উপরে উল্লিখিত হয়েছে, তাতে মধ্যযুগ কমই গুরুত্ব পেয়েছে। মার্কসবাদী ইতিহাসতাত্ত্বিকগণ সামন্ততন্ত্রকে মধ্যযুগের সমপর্যায়ে ফেলেছেন এবং এ ধরনের ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, যখন থেকে ধনতন্ত্র দানা বাঁধল, তখন থেকেই আধুনিক যুগের সূচনা। এই সমস্ত আলোচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, সমগ্র উপমহাদেশকে একটি ইউনিট রূপে ধরে নিয়ে ঐতিহাসিকগণ, অর্থনীতি বা সমাজতত্ত্বের ভিত্তিতে তাঁদের মতামত গড়ে তুলেছেন এবং এই বিশাল ও বহুবিচিত্র দেশটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলির ভূগোল ও অর্থনীতির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেননি। বাংলার ইতিহাসে কাল-বিভাজনের ক্ষেত্রে এই আঞ্চলিক গুরুত্বকে অগ্রাহ্য করা যাবে না। ভূগোল ও অর্থনীতির প্রতি গুরুত্ব দিলে এ কথা বলা যেতে পারে যে, অন্যান্য আঞ্চলিক রাজ্যের মধ্যে গুজরাট ও বিজয়নগরের ইতিহাসেও যে সকল বাণিজ্যিক ও সার্বিক পর্যায়ের আর্থনীতিক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল, তা ছিল মধ্যযুগের বাংলার পরিস্থিতির সঙ্গে অনেকটা সমান্তরাল। বাংলার মতই দেশ দুটি সমুদ্রতীরবর্তী এবং মধ্যযুগের বাংলায় যেমন, সমকালীন গুজরাট ও বিজয়নগরেও

তেমনি, আরব, পারসিয়ান ও চীনা বণিকদের আগমন ঘটেছে। দ্য বারোজ এই তিনটি দেশের বাণিজ্যিক সম্পদ সম্বন্ধে বলেছেন:[১]

> ...the King of Bengalla alone held as much as he (গুজরাটের বাহাদুর শাহ) and the King of Narsinga (বিজয়নগর) held jointly.

তিন দেশের মধ্যকার বাণিজ্য-লব্ধ ধনের এই আনুপাতিক সম্পর্ক ঠিক হোক আর নাই হোক, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ খুব কম যে, এরা একই বাণিজ্য-পথের রেখার উপরে এবং একই ধরনের বাণিজ্য-রীতির মাঝখানে পড়েছিল। কাল-বিভাজনের ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক ইতিহাসের ধারায় এই অঞ্চল তিনটিতে বিস্ময়কর রকমের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে কি না, সে প্রশ্নের উত্তর অবশ্য গবেষণা-সাপেক্ষ। প্রাক-মোগল যুগে প্রায় একই সময়ে এই দেশগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর গড়ে উঠেছিল ও শক্তিশালী বণিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তিনটি দেশ একই সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ নিয়ে এক বিশাল, আন্তর্জাতিক, ব্যবসায়িক জগতের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল।

প্রথম বাংলাদেশ-ইতিহাস-সম্মিলনীতে পঠিত 'ইতিহাস লেখার সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে[২] বর্তমান লেখক এ ধরনের ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, মুসলমানগণ ভারতে এসে এ দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি ধর্মীয়-ভাব-বর্জিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন এবং এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে উপমহাদেশের তৎকালীন সাহিত্য ও শিল্প-কলায়। এ কথাও বলা হয়েছিল যে, ঐ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই হয়ত রয়েছে মধ্য যুগের সূচনা। প্রবন্ধটিতে এ ধরনের ইঙ্গিত আছে যে, বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যতিক্রম ও বৈশিষ্ট্য ধর্তব্যের মধ্যে নিলে মধ্যযুগের ব্যাখ্যাসূচক পূর্বোক্ত সূত্রটির রদবদল হতে পারে। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে মধ্যযুগ কখন এসেছিল, এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়েও ঐ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কথাটিই বিশেষভাবে ভেবে দেখা দরকার। এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিলে এ কথা মানতে হয় যে, উপমহাদেশের সব অঞ্চলে মধ্যযুগ বা আধুনিক যুগ এক সঙ্গে আসেনি, এসেছে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন গতিতে। এই মন্তব্যে যথেষ্ট সরলীকরণ আছে। কিন্তু এ জাতীয় সরলীকরণ এ ক্ষেত্রে এড়িয়ে চলা মুশকিল। প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগকে আলাদা করে দেখতে গেলে বিশেষ বিশেষ আর্থনীতিক বিবর্তন বা সামাজিক বিপ্লবের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা অপরিহার্য। সমাজ-জীবনে এ জাতীয় পরিবর্তন আসে নতুন প্রকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে।

দুই

আলোচ্য অঞ্চলের ইতিহাসের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিকদের কাছে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। খ্রীস্টীয় সাত শতক থেকে শুরু করে বার শতকের বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যাচ্ছে না। এই সময়ে মুদ্রার প্রচলন কমে এসেছিল এবং সেন আমলে খুব সম্ভব মুদ্রার ব্যবহার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ; কেননা সেন যুগের কোন মুদ্রাই আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ যে কড়ির আদান-প্রদানের মাধ্যমে চলত, তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে 'তাবকাত-ই-নাসিরী'তে। সেইজন্য মনে হয় যে, ঐ যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যে, বিশেষ করে সামুদ্রিক বাণিজ্যে ভাটা পড়েছিল।[১] প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলির সঙ্গে যদি পণ্য-বিনিময় প্রথার মাধ্যমে সীমিতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চলেও থাকে, উপযুক্ত তথ্যের অভাবে সে সম্বন্ধে কিছুই জানবার উপায় নেই। আবিষ্কৃত তাম্র শাসনগুলিতে যে সমাজ-বিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তাতে বণিকদের প্রতিপত্তির তেমন কোনো লক্ষণ নেই। কিংবদন্তিমূলক সাহিত্যে এ ধরনের জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, বল্লাল সেন স্বুবর্ণ বণিকদেরকে পংক্তিচ্যুত করে নিম্নশ্রেণীর জাতিতে পরিণত করেছিলেন। এই জনশ্রুতির যদি কিছুমাত্র মূল্য থাকে, তবে মানতে হয় যে, বণিকদের একটি বিরাট অংশের সঙ্গে রাজশক্তির দ্বন্দ্ব হয়েছিল এবং বণিকগণ তখন রীতিমত দুর্দশাগ্রস্ত। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন—সত্যিই কি তবে পাল ও সেন আমলের সমাজ, পুরোপুরি কৃষিভিত্তিক হয়ে পড়েছিল? রোমান সভ্যতার বিপর্যয়, ভারতীয় উপকূলের সঙ্গে পশ্চিমের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত যোগসূত্রের বিলোপ প্রভৃতি ঘটনাকে এ দেশের বাণিজ্যিক অবনতির কারণ হিসাবে গ্রহণ করা যায় কি না—এগুলোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তথ্যের অভাবের দরুন এসব প্রশ্নের উত্তর নিতান্তই অনুমান-ভিত্তিক হতে বাধ্য। তবে মুসলিম অধিকারের পূর্ববর্তী কালে বাংলায় যে একটি বিশেষ সামাজিক ও আর্থনীতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ খুবই কম।

মুসলমানদের আগমনের পর এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। এ বিষয়ে অবশ্য বিশদভাবে কিছুই জানা যায়নি। যে ধরনের ইতিহাসের উপকরণ আমরা হাতে পেয়েছি, তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, মুসলিম আমলে ব্যবসা-বাণিজ্য নতুন করে চালু হয়েছিল। তার ফলে দেশের জীবনে যে পরিবর্তন এসেছিল, তা ছিল অনেকটা সুদূর-প্রসারী। মুসলমান সুলতানগণ প্রায় নিয়মিতভাবে মুদ্রা অঙ্কিত করেছিলেন। মুদ্রাগুলো বোধ হয় শুধুমাত্র শাসকদের সার্বভৌমত্বের প্রতীকই নয় ;

এগুলো ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হত। আরো দেখা যাচ্ছে যে, মুসলিম শাসনের স্থিতিশীলতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এই মুদ্রার সংখ্যা ও শ্রেণী-বিভাগ ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল। মনে হয়, বাংলার মুদ্রাতত্ত্বের এই বৈশিষ্ট্যও আন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের ক্রমপ্রসারমানতার প্রতিই ইঙ্গিত দিচ্ছে। আমাদের এই অনুমান মা হুয়ানের বিবরণে পরোক্ষ সমর্থন পাচ্ছে। মা হুয়ান বলেছেন :[8]

> ···in every purchase and sale they all use this coin for calculating prices in petty transactions. The cowrie goes by the foreign name of *k'ao-li*; [and] in trading they calculate in units [of this article].

মা হুয়ানের লেখা ছাড়াও এই তথ্য *Ying Yai Shenglan, Sing Yang Ch'ao Tien Lu* প্রভৃতি চৈনিক বিবরণেও স্থান পেয়েছে।[৫] মা হুয়ান বাংলায় এসেছিলেন পনর শতের একেবারে প্রথম দিকে এবং তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন এ দেশের রৌপ্যমুদ্রা বা 'টঙ্কা'র বর্ণনা প্রসঙ্গে। এ অনুমানে বিশেষ কোনো বাধা নেই যে, দীর্ঘ দিন ধরে, খুব সম্ভব সমগ্র চৌদ্দ শতকে, এমন কি তের শতকের শেষ ভাগেও রৌপ্যমুদ্রার ব্যবহার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমরূপে প্রচলিত হয়ে মা হুয়ানের সময়ে এসে একটা স্থায়ী রীতিতে পরিণতি পেয়েছিল।

চৌদ্দ-পনর শতকের দিকে সাতগাঁও, সোনারগাঁও ও চট্টগ্রামের মত গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দর বা সামুদ্রিক বন্দর গড়ে উঠে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছিল। সুলতানী আমলে বিভিন্ন স্থানে টাকশাল স্থাপনের দরুন যে শহরগুলি গড়ে উঠেছিল, তাদের সংখ্যা ও গুরুত্ব আদৌ কম ছিল বলে মনে হয় না।

বাণিজ্যিক ও সামাজিক পরিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এ দেশের যুগ-বিভাগ প্রসঙ্গ আলোচনা করছি। সেইজন্য বাণিজ্যিক ও সামাজিক পরিস্থিতির প্রতি প্রথমেই গুরুত্ব দিচ্ছি।

মা হুয়ানের বিবরণে ও এই বিবরণের ভিত্তিতে লেখা পরবর্তী কালের আরো কয়েকটি চৈনিক বিবরণে এ দেশের শিল্পদ্রব্য ও বিভিন্ন ধরনের কৃষিদ্রব্যের যে তালিকা দেয়া হয়েছে[৬] তাতে এই দেশটির বাণিজ্যিক সম্পদের ইঙ্গিত আছে। তা ছাড়া বাঙ্গালীদের বাণিজ্য-নৈপুণ্য সম্বন্ধে এই লেখকদের বক্তব্য অত্যন্ত ঋজু। ষোল শতকের প্রথম দিকে ভার্থেমা লিখেছেন[৭] যে, এ দেশের সুতী ও রেশমী বস্ত্র যেত

> ···through all Turkey, through all Syria, through Persia, through Arabia Felix, through Ethiopia, and through all India.

যদিও ভার্থেমার বিবরণের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন,[৮] আরব, পারস্য ও ইয়োরোপে বাংলায় প্রস্তুত বস্ত্রের যে যথেষ্ট চাহিদা ছিল, তার প্রমাণ আছে বার্বোসা ও টোম পিরেসের (Tome Pires) লেখার মধ্যে।[৯] ভার্থেমা ও বার্বোসা বাংলায় তৈরী বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রের যে নামগুলি দিয়েছেন,[১০] তা বোধ হয় আদিতে ছিল বাংলা-হিন্দী অথবা আরবী-ফারসী শব্দ এবং তা এই ইয়োরোপীয়দের ভাষা ও উচ্চারণের প্রভাবে অনেকটা রূপান্তরিত হয়েছে। এই পরিব্রাজকদের এক শত বৎসর পূর্বে লেখা মা হুয়ানের বিবরণে বাংলার কাপড়ের যে নামগুলির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে,[১১] তা দেখে মনে হয় যে, মৌলিক শব্দগুলি বেশ খানিকটা চাইনিজ পোশাক পরেছে। বস্ত্রের এই নামগুলির সঠিক পরিচয় কোনো দিন নির্ণয় করা যাবে কি না কে জানে; তবে এই বিপুল ও বিচিত্র বস্ত্র-সম্ভার যে যথেষ্ট পরিমাণে আরব, পারস্য, ইয়োরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিক্রী হত, সে বিষয়ে বিশেষ কোনো সন্দেহ নেই। ভার্থেমা ও বার্বোসার সমসাময়িক কালে টোম পিরেস এশিয়ান বাণিজ্যের সুবিস্তৃত বিবরণ লিখেছেন।[১২] তাতে তিনি বলেছেন যে রফতানীর জন্য বিশ রকমের অতি সূক্ষ্ম, সাদা, সুতী বস্ত্র উৎপাদিত হত এবং সমগ্র প্রাচ্য ও ইয়োরোপের বাজারে এগুলির খুবই চাহিদা ছিল।[১৩] তুলার চাষ ইয়োরোপে কম থাকায় সূতী বস্ত্রের ব্যাপারে তখন ভারতের উপরে সে দেশের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের মশলা ইয়োরোপের চাহিদা মিটাত এবং প্রধানতঃ এই মশলার বাণিজ্যে যোগ দিয়ে আরব ও ভারতীয় বণিকগণ, বাংলা, দক্ষিণ ভারত ও গুজরাটের বস্ত্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিক্রী করে লাভবান হত।

টোম পিরেসের বিবরণে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য সম্বন্ধে বেশ কিছু নতুন ও মূল্যবান তথ্য আছে। Meilink-Roelofsz তাঁর *Asian Trade and European Influence* গ্রন্থে এই তথ্যগুলি বিশদভাবে ব্যবহার করেছেন। Aspects of Bengal's Sea-Borne Commerce in the Pre-European Period[১৪] শীর্ষক একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে বাংলার সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক যোগাযোগ প্রসঙ্গে টোম পিরেস কর্তৃক পরিবেশিত তথ্যের প্রতি অরুণ দাশগুপ্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। এই সাম্প্রতিক রচনা দুটি ব্যবহার করে প্রধানতঃ টোম পিরেসের বিবরণের ভিত্তিতে আমরা বাংলার সামুদ্রিক

বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনার জের টানছি। প্রত্যেক বৎসর চার বা পাঁচটি জাহাজে করে এ দেশের পণ্য সরাসরি রফতানী হত মালাক্কায় ও সুমাত্রার অন্তর্গত পাসেই-এ। ক্ষুদ্র জাহাজের মালপত্র ছাড়াও চাইনিজ জাংক জাতীয় বড় ও ভারী একটি বা দুটি জাহাজে মালাক্কায় যে দ্রব্য-সামগ্রী যেত তার মূল্য ছিল ৮০,০০০ থেকে ৯০,০০০ ক্রুসেডো। এই দ্রব্যগুলির মধ্যে ছিল সূতী বস্ত্র, চিনি, চাল, লবণ মাখানো শুকনো মাছ-মাংস, সংরক্ষিত তরিতরকারি, আদা, কমলা লেবু, লেবু, ডুমুর, শশা প্রভৃতি। মালাক্কা থেকে যে দ্রব্যগুলি আনা হত, তার ফিরিস্তিতে আছে বোর্নিও থেকে আগত কর্পূর ও গোল মরিচ, লবঙ্গ, জৈত্রী, জায়ফল, চন্দন কাঠ, মোতি, রেশম, চীন ও লিউ কিউ দ্বীপপুঞ্জের সাদা ও সবুজ মৃৎপাত্র, তামা, টিন, সীসা, পারদ, এডেনের আফিম, কাজ-করা সাদা ও সবুজ রেশম বস্ত্র (damask), কার্পেট, জাভায় তৈরী ছোরা ও তলোয়ার এবং আরো অনেক কিছু।[১৫] উত্তর সুমাত্রার অন্তর্গত পাসেই ও পেদিরে বাংলার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় হত। এ বন্দর দুটি থেকে বণিকগণ ক্রয় করবার মত অতি অল্প দ্রব্যই পেত। সেই জন্য বাংলার সঙ্গে মালাক্কার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বোর্নিও, লিউ কিউ দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে এ দেশের সূতী কাপড় বিক্রী হত। তা ছাড়া সিয়াম, পেগু, বার্মা ও আরাকানের সঙ্গেও বাংলার বাণিজ্যিক যোগসূত্রের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।[১৬] পশ্চিম দিকে সিংহল, মালাবার উপকূল, মালদ্বীপ, চৌল, দাবোল, কাম্বে, পারস্যোপসাগরীয় অঞ্চল ও আরব উপকূল বাংলার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। বার্বোসা, ভার্থেমা ও রাল্‌ফ্ ফিচের লেখাতেও এই দেশগুলির কয়েকটির সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক লেনদেনের কথা উল্লিখিত হয়েছে।[১৭]

এই বাণিজ্য যে অত্যন্ত লাভজনক ছিল, সে কথা টোম পিরেস স্পষ্টভাবেই বলেছেন। মালাক্কায় ৩$\frac{১}{৪}$% রফতানী কর ও বাংলায় ৩৫% আমদানী কর দিয়েও যে লভ্যাংশ দাঁড়াত, তা ছিল ২০০% থেকে ৩০০% ভাগ।[১৮] সোনারূপা ও কড়ির ক্রয়-বিক্রয় ছিল মুনাফার অন্যতম উৎস। মালাক্কার তুলনায় বাংলায় সোনার দাম $\frac{১}{৬}$ ভাগ বেশী হওয়ায় এবং বাংলা থেকে মালাক্কায় রূপা নিয়ে গেলে তার দাম সেখানে $\frac{১}{৪}$ বা $\frac{১}{৫}$ ভাগ বেশী হওয়ায় বণিকগণ স্বর্ণরৌপ্যের ব্যবসায় মনোযোগ দিত। তারা কড়ি আমদানী করে যথেষ্ট মুনাফা লাভ করত;[১৯] কারণ কড়ির চাহিদা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম হিসেবে এখানে চিরদিন খুব বেশী ছিল। এ দেশের মুদ্রা মালাক্কায় চালু ছিল[২০] — এটাও বাংলার **favourable balance of trade** বা বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্তের লক্ষণ। বণিকগণ বিদেশী মুদ্রা নিয়ে আসত এবং

তাও হস্তান্তর করে লাভবান হত।[২১] পূর্ববর্তী বিবরণের ভিত্তিতে ১৫২০ খ্রীস্টাব্দে সঙ্কলিত Sing Yang Ch'ao Kung Tien Lu নামক যে চৈনিক বিবরণে পনেরো শতকের প্রথম দিকের বাংলায় আগত কূটনৈতিক মিশনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তাতে এই কথাগুলো আছে:[২২]

> To conclude, Bengal is rich and civilised. To our ambassador they presented gold basins, gold girdles, and gold bowls and to our vice ambassador the same articles in silver. To our officials of the ministry of foreign affairs they presented golden bells and long gowns of white hemp and silk. Our soldiers got silver coins. If they had not been rich how could they do it in such an extravagant way ?

এই উক্তিগুলিতে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে, তবে এ অনুমানে বোধ হয় বিশেষ কোনো বাধা নেই যে, বাংলার এই ঐশ্বর্য এসেছিল অনেকটা তার বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে।

বাংলায় তথা ভারতের উপকূলে ও সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য বৃদ্ধির কারণ ঐতিহাসিকগণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। ডাচ ঐতিহাসিক Bernard Schrieke-এর ধারণা:[২৩] ক্রুসেড যুদ্ধ, মোঙ্গলগণ কর্তৃক আব্বাসীয় খিলাফতের ধ্বংস সাধন এবং রিনাইসাঁস-কালীন ইয়োরোপের মশলার চাহিদা, দূর প্রাচ্যে মুসলমানদের বাণিজ্যিক প্রভাব বৃদ্ধির ও ইসলাম প্রচারের কারণ হিসেবে সক্রিয় হয়েছিল। মোঙ্গল আক্রমণ ও ক্রুসেডের পরবর্তীকালে এশিয়া ও ইয়োরোপের অন্তর্গত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-পথ গতি পরিবর্তন করে এবং তার ফলে আলেকজান্ড্রিয়া থেকে কুশ, এডেন ও কাম্বে হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে প্রলম্বিত পথ বেয়ে এশিয়ার পণ্য পশ্চিমে চলে যেতে থাকে এবং পশ্চিম এশিয়া ও ইয়োরোপের দ্রব্যাদি ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আসতে থাকে। এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তাগিদেই চৌদ্দ শতকের দিকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে কাম্বে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালাক্কার মত গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বন্দর গড়ে উঠে। এই বন্দর দুটি ছিল পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ইয়োরোপ, আরব, পারস্য ও ভারতের পণ্য যেমন কাম্বে থেকেই সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চলে যেত, তেমনি আবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের দ্রব্যাদি, বিশেষ করে মশলা, স্বর্ণ-রৌপ্য, রেশম, মালাক্কাকে কেন্দ্র করে ভারত, সিংহল, আরব ও ইয়োরোপে পৌঁছত। অন্যান্য ঐতিহাসিক Schrieke-এর এই মতামত মেনে নিয়েছেন।[২৪]

বাংলা, দক্ষিণ ভারত ও গুজরাট বা সমগ্র করমণ্ডল উপকূল ও মালাবার উপকূল পূর্বোক্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-ক্ষেত্রের মাঝখানে পড়ে গিয়েছিল। প্রধানতঃ এই কারণেই দীর্ঘকাল পরে আবার এ দেশ সামুদ্রিক বাণিজ্যে অংশ নিল। সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রাম ও সোনারগাঁর উদ্ভবের পেছনে এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যই সক্রিয় ছিল বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। অরুণ দাশগুপ্ত বলেছেন যে, তের ও চৌদ্দ শতকে আরব ও ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে চীনা ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা বা সহযোগিতা এ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম প্রচারও এই বাণিজ্যিক প্রসারের কার্যে সহায়ক হয়েছিল।[২৫] তবে চীনের ভূমিকা তের শতক ও চৌদ্দ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্তই সক্রিয় ছিল। চৌদ্দ ও পনর শতকে ভারত মহাসাগরে, এমন কি সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, চীনা প্রভাব হ্রাস পেয়েছিল এবং এটাই ছিল ভারতীয় বাণিজ্যের ইতিহাসে একটি গৌরবময় যুগ। এই সময়ে চীনা বণিকগণ, জাভা, মালয় ও ভারতের উদীয়মান বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কর্তৃত্ব তখন এই শেষোক্ত দেশগুলির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল।[২৬] পনেরো শতকের প্রথম দিকের চেং হো অভিযানসমূহ হয়ত শুধু কূটনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হয়নি; এগুলোর পেছনে খুব সম্ভব বাণিজ্যিক অভিপ্রায়ও প্রচ্ছন্ন ছিল। চেং হো মিশনের গুরুত্ব বর্তমান প্রসঙ্গে অত্যন্ত বেশী, কারণ এই মিশন বাংলায় এসেছিল এবং বাংলার কয়েকজন সুলতান বেশ কয়েক বার প্রচুর উপহার-দ্রব্যসহ চীনে দূত পাঠিয়েছিলেন। চীন থেকে প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে কয়েক বার বাংলায় দূত এসেছিলেন। চেং হো মিশনের অন্যতম সদস্য মা হুয়ান যে বিবরণ লিখেছেন, তাতে বাংলা সম্বন্ধে বহু তথ্য আছে। এই বিবরণের ভিত্তিতে লেখা পরবর্তীকালের আরো কয়েকটি চীনা বিবরণেও এ দেশ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। এই বিবরণগুলি বাংলার কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সংস্কৃতির উপর আলো ফেলেছে। কিন্তু চেং হো মিশনের নাটকীয় আরম্ভ ও আকস্মিক পরিসমাপ্তি দেখে মনে হয় যে, অভিযানগুলির মাধ্যমে চীন ভারত মহাসাগরে প্রভাব বৃদ্ধি করতে পারে নি। এই সময়ে চীনের বাণিজ্যিক প্রতিপত্তি ক্ষুন্ন হওয়ার মূলে ছিল মিং সম্রাট কর্তৃক অনুসৃত এক বিশেষ ধরনের বৈদেশিক নীতি।[২৭] আবার ইসলাম প্রচারের ঘটনাটিকে মুসলমানদের বাণিজ্যিক প্রভাব বৃদ্ধির পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। **Schrieke** দেখিয়েছেন যে, পর্তুগীজদের আগমনের পরে তাদের বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় তৎপরতা এবং মুসলিম বিদ্বেষ প্রতিহত করার জন্য মুসলিম বণিকদের প্রচেষ্টাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম প্রচারের জন্য দায়ী এবং ইসলামের

ব্যাপক প্রসার ঘটেছে ষোল শতকে এবং তারও পরবর্তী কালে।[২৮] অথচ বহু আগেই ভারতে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে মুসলিম বণিকগণ অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে পড়েছিল। বাংলায় ও এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে বাণিজ্য বৃদ্ধির মূলে যে শক্তিগুলি কাজ করেছিল, তার মধ্যে মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রভাব অন্যতম। তের শতকে ভারতে ও বাংলায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল মুসলমানের অধিকারে এবং এই সময় থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এই মুসলিম রাজ্যগুলির কাছে থেকে আরব ও ভারতীয় মুসলিম বণিকগণ যে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছিল, তা ত অত্যন্ত স্বাভাবিক। বাংলা বা গুজরাট জন-সংখ্যার দিক দিয়ে কখনো মুসলিম-প্রধান ছিল না; কিন্তু মুসলিম রাজশক্তির গুরুত্ব এ দেশগুলির বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও সক্রিয় ছিল। ক্রুসেডের পরবর্তীকালে ইয়োরোপে মশলার চাহিদা, আরব ও ভারতীয় বণিকদের ভূমিকা, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ও ইন্দোনেশিয়ার কোনো কোনো স্থানে মুসলিম রাজ্য স্থাপন প্রভৃতি একত্রিত হয়ে চৌদ্দ ও পনর শতকে এশিয়ার বাণিজ্যে নতুনভাবে প্রাণ সঞ্চার করেছিল। তার ফলে বাংলা, দক্ষিণ ভারত ও গুজরাটের জীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছিল।

আগেই বলেছি যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দরুন বাংলায় কয়েকটি বন্দরের উদ্ভব হয়েছিল। এই একই কারণে এ দেশের শ্রেণী-বিন্যাসেও কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল বলে মনে হয়। একটি বণিক শ্রেণী গড়ে উঠে অন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে অংশ নিচ্ছিল—এ কথার প্রমাণ আছে সমকালীন বাংলা সাহিত্যে ও বিদেশী লেখকদের রচনায়। মঙ্গল কাব্যের বিখ্যাত চাঁদ সদাগর এবং ধনপতি-শ্রীমন্ত সদাগরের চরিত্র খুব সম্ভব মুসলিম আমলেরই সৃষ্টি। কাব্য-সাহিত্যে চিত্রিত এই মূল, ব্যবসায়ী চরিত্রগুলোর পরিক্রমণ-পথ সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী থেকে শুরু করে, (খুব সম্ভব করমণ্ডল উপকূল ধরে) সিংহল হয়ে গুজরাট পর্যন্ত প্রলম্বিত। এসব তথ্যের মাধ্যমে মঙ্গল কাব্যের কবিগণ যদি সুদূর অতীতের গঙ্গা-হৃদয় অথবা রোমান যুগের স্মৃতি রোমন্থন না করে থাকেন, তবে হিন্দু বণিকদের সীমিত বাণিজ্য ও গতিবিধির কারণ সমকালীন হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই খুঁজতে হবে। প্রাক্-মোগল যুগে শূলপাণি, বৃহস্পতি, রঘুনন্দন প্রমুখ ধর্মশাস্ত্রবিদগণ স্মৃতি-নিবন্ধ রচনার মাধ্যমে হিন্দুদের জীবনকে আচার-সংস্কারের গণ্ডীর মধ্যে সীমিত করে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রচেষ্টার ফলেই বোধহয় ব্রাহ্মণ্য সমাজে এবং হিন্দু সমাজের অন্যান্য অংশেও রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। **Meilink-Roelofsz**

বলেছেন যে, গুজরাটের হিন্দু বণিকগণ মুসলমান বণিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত অর্থ ও পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে ; তবে তারা ধর্মীয় বিধি-নিষেধের বাধা এড়িয়ে মুসলমানদের জাহাজে উঠে ব্যবসা করতে পারত না।[২৯] বাংলার হিন্দু বণিকগণও বোধ হয় অনুরূপ আচারানুষ্ঠানের বাধার ফলেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যেত না। অথচ করমণ্ডল উপকূলের হিন্দু বণিকদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে ঐ ধরনের কোনো বাধা তাদের ছিল না।[৩০] অবশ্য এও হতে পারে যে, মঙ্গল কাব্যের কবিগণ দক্ষিণ-পূর্ব দিকের বাণিজ্য-পথটির খোঁজ রাখতেন না। তবে হিন্দু বণিক শ্রেণীর স্পষ্ট উল্লেখ আছে পনেরো ও ষোল শতকের বাংলা কাব্যেই। বিপ্রদাস সপ্তগ্রামের যে উজ্জ্বল বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে 'চৈতন্য-ভাগবতে' উল্লিখিত, ঐ বন্দরের বণিককূলের গৃহে নিত্যানন্দের কীর্তন-প্রসঙ্গ স্মর্তব্য।[৩১]

মা হুয়ান বাঙ্গালীদের বাণিজ্যিক নৈপুণ্য লক্ষ্য করেছিলেন পনেরো শতকের প্রথম দিকে।[৩২] এ বিষয়ে বেশ কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে টোম পিরেসের বর্ণনায়। মালাক্কায় বাঙ্গালী বণিকদের একটি দল প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। খুব সম্ভব, এই বণিকদেরকে কেন্দ্র করেই সেখানে জেলে ও দর্জি শ্রেণীর সাধারণ বাঙ্গালীর আবাসও গড়ে উঠেছিল।[৩৩] উত্তর সুমাত্রার অন্তর্গত পাসেই-এ বাঙ্গালীদের কলোনী ছিল। টোম পিরেসের ধারণা, এখানে প্রথম মুসলিম রাজ্য স্থাপিত হয় চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এবং তা বাঙ্গালীদের দ্বারাই।[৩৪] এই তথ্য ঠিক হলে এ অনুমানে বাধা নেই যে, এই রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ যারা নিয়েছিল, তারাও ছিল বাঙ্গালী বণিক। যে সকল বিদেশী বণিক বাংলায় আসত তাদের মধ্যে ছিল আরব, পারসিয়ান, আবিসিনিয়ান ও ভারতীয়[৩৫] যাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে এ দেশের ব্যবসায়িক সম্প্রদায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ নিত। আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মা হুয়ান বলেছেন যে, সুলতানগণই ব্যবসার জন্য জাহাজ বোঝাই করে বিদেশে পণ্য পাঠাতেন[৩৬] এবং টোম পিরেসের বিবরণে এ তথ্য আছে যে পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে এডেন, হরমুজ, কাম্বে ও বাংলার শাসকগণ মালাক্কার সুলতানের নিকট পত্র ও উপহার-দ্রব্য পাঠাতেন এবং তাঁদের দেশের বণিকগণকে সেখানে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে উৎসাহ দিতেন।[৩৭] এতে মনে হয়, সে কালের রাজতন্ত্র ব্যবসায়ে সরাসরি অংশ নিত এবং বণিকদের সহায়তায় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্তিশালী করে তুলত। বৈদেশিক বাণিজ্য রাজতন্ত্র ও বণিকতন্ত্রকে এক অবিচ্ছিন্ন স্বার্থের সূত্রে বেঁধে দিয়েছিল। ষোল শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত বাংলায় যারা রাজত্ব করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন তুর্কী, আবিসিনিয়ান ও আরব। তাঁরা যে তাঁদেরই

দেশ থেকে আগত বণিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেছিলেন এবং এই বণিকদেরই কাছে থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন, এতে আর আশ্চর্য কি? মা হুয়ানের বর্ণনায় আছে :[৩৮]

> **Wealthy individuals who build ships and go to various foreign countries are quite numerous ; ···**

এই সম্পদশালী ব্যক্তিগণ সমাজ-বিন্যাসের কোন পর্যায়ে পড়েছিলেন? তাঁরা কি সুলতানদের অধীনস্থ চাকুরীজীবী সামন্ত শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া গেলেও বুঝতে পারা কঠিন নয় যে, তাঁরাও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুলতানদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। মা হুয়ানের সূত্র ধরে আমরা আগেই বলেছি যে, এ দেশের শাসকগণও সামুদ্রিক বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। ভার্থেমার বিবরণে 'বাঙ্গালা' শহরের "সবচেয়ে ধনী বণিকদের" উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে : And here there are the richest merchants I ever met.[৩৯] আবার বাণিজ্য-লব্ধ ধনের উপর নির্ভর করে যে আয়েশী, বিলাস-পরায়ণ, মুসলমান ধনী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল, খুব সম্ভব তারই বর্ণনা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে বার্বোসার লেখায়। এই সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ ছিলেন অমিতব্যয়ী ও ভোজনবিলাসী। তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ, মণিমুক্তাখচিত অঙ্গুরীয়, গৃহসংলগ্ন স্নানাগার, বহু-বিবাহের রেওয়াজ এবং সার্বিকভাবে তাঁদের জীবন-যাত্রার পদ্ধতির মধ্য দিয়েই তাঁদের বিত্ত ও আর্থিক প্রাচুর্য প্রকাশ পেত। তাঁরা তাঁদের স্ত্রীলোকদেরকে ঘরে অবরুদ্ধ করে রাখতেন এবং স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার ও মিহি রেশমের পোশাক দিয়ে তাঁদের মন জোগাতেন। মহিলারা রাত্রে পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে বের হতেন— তখন তাঁদের মধ্যে চলত আনন্দ-উৎসব, মদ্যপান ও সঙ্গীত-চর্চা। যন্ত্র-সঙ্গীতে তাঁদের ছিল অদ্ভুত নৈপুণ্য।[৪০] সমসাময়িক কালের গুজরাটে যে বিত্তবান বণিক শ্রেণী বাস করত তারও বিলাস ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন বার্বোসা।[৪১]

সামুদ্রিক বাণিজ্য থেকে আগত ধনসম্পদের কিছু অংশই বোধহয় গৌড়-পাণ্ডুয়ার শ্রী ও ঐশ্বর্য বাড়িয়ে দিয়ে নাগরিক সভ্যতার মান উন্নত করেছিল। বিদেশী লেখকদের বর্ণনায় উল্লিখিত বিরাট, সুন্দর, জাঁকজমকপূর্ণ রাজপ্রাসাদ, মদ্যপান, আমোদ-প্রমোদ এবং ধনী মহিলাদের মধ্যেও নৈশ ভোজ, পানাভ্যাস ও যন্ত্রবাদনে নৈপুণ্য এবং শাসকগণ কর্তৃক সাহিত্য ও বিশিষ্ট মানের স্থাপত্যের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা নাগর সভ্যতারই দ্যোতক। আর এসব কিছুর বুনিয়াদ ছিল অন্তত আংশিকভাবে, বহির্বাণিজ্য-লব্ধ ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

উল্লিখিত তথ্যের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বোধ হয় এ কথা বলা যায় যে, মুসলিম আমলে এ দেশের অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন এসেছিল, তা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামুদ্রিক বাণিজ্য দীর্ঘদিন পরে আবার শুরু হওয়ায় তার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে এ দেশের যোগাযোগ নতুন করে স্থাপিত হয়েছিল। মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলে বলা যায় যে, পণ্য-বিনিময় প্রথার স্থানে মুদ্রার প্রচলন করে সুলতানগণ কৃষিভিত্তিক সভ্যতার ক্ষেত্রে ব্যবসা-নির্ভর নাগরিক সভ্যতার সূত্রপাত করেছিলেন। **Natural economy** বা দ্রব্য-বিনিময়-ভিত্তিক অর্থনীতির স্থানে **money economy** বা মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির প্রচলন নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে শ্রেণী-বিন্যাসে যে পরিবর্তন এসেছিল, সেই সামাজিক পরিবর্তনও উপেক্ষা করবার মত নয়।

তিন

বাংলার অর্থনীতিতে ও সমাজে আমরা যে পরিবর্তন লক্ষ্য করছি, তা কোনো ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার নয়। সমগ্র প্রাক-মোগল মুসলিম আমল ধরে বৈদেশিক বাণিজ্য চালু ছিল। এই বাণিজ্যের ফলে দেশে যে ধনসম্পদ বেড়ে গিয়েছিল, তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে সে কালে অঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রার প্রাচুর্যে ও বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায়। এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনকেই আমরা মধ্যযুগের সূচনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। শুধু মুসলমানদের আগমন সময়ের বুকে ছেদ টেনে দিয়ে নতুন যুগের সূচনা করল, এ কথা হয়ত সত্য নয়। নতুন লোক-গোষ্ঠীর আগমনের সঙ্গে যদি আমরা পূর্বোক্ত অর্থনৈতিক বিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তনকে সম্পর্কিত করে দেখি, তবে তা হয়ে উঠে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কোনো প্রাকৌশলিক পরিবর্তন এ যুগকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল কি না, এটি আরেক জরুরী প্রশ্ন। জাহাজ ও দালান-ইমারৎ নির্মাণ, বাণিজ্যিক ও সামরিক কার্য পরিচালনা, মুদ্রাঙ্কন ও পথঘাট তৈরীর কাজ, এর কোনোটাতেই নবাগত লোকজন কোনো নতুন প্রকৌশল প্রয়োগ করেনি, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। শুধু মাত্র ঘোড়ার বহুল ব্যবহারের ফলেই পাল ও সেন আমলের তুলনায় এ যুগের যোগাযোগ ব্যবস্থায় অন্তত: কিছুটা উন্নতি যে দেখা দিয়েছিল, সে অনুমানে বোধ হয় বিশেষ কোনো বাধা নেই। ১৯৬৯ সালের ইণ্ডিয়ান হিসট্রি কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে ইরফান হাবিব বলেছেন যে, প্রাক-মোগল আমলের ভারতে চরকা ও তুলা পেঁজার যন্ত্রের আমদানীর ফলে এ দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। আলোচ্য যুগের বাংলার সূতী বস্ত্রের উৎপাদন

বৃদ্ধির সঙ্গে এই প্রাকৌশলিক পরিবর্তনের কোনো সম্পর্ক আছে কি না, সে কথাও ভেবে দেখা দরকার। ইরফান হাবিবের অভিমতটি অবশ্য বিতর্কমূলক।

জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছিল বলে মনে হয়। ষোল-সতেরো শতকের বাংলা কাব্যগুলি পড়লে মানসিক বিবর্তনের একটি বিশেষ ধারা চোখে পড়ে। কাব্যগুলিতে মানবীয় উপাদান যেন ক্রমশ বেড়েই চলেছে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'— কবির এই উক্তির মধ্যে আমরা যেন কোনো এক নতুন যুগের প্রতিভূকেই খুঁজে পাচ্ছি। বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন খুব সম্ভব এই মানববাদী আন্দোলনেরই অংশ বিশেষ। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ও ইসলামের প্রভাব এই মানববাদকে সম্ভব করে তুলেছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।

এ দেশে মধ্যযুগ শেষ হল কবে এবং কি ভাবে, এগুলিও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন। স্যার যদুনাথ বলেছেন:[৪২]

> **On 23rd June, 1757, the middle ages of India ended and her modern age began···It was truly a Renaissance, wider, deeper and more revolutionary than that of Europe after the fall of Constantinople.**

ইংরেজ আগমনের ফলে হয়ত বা ভারতের অঞ্চল বিশেষের ভাষা, সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজ গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এবং আমূল রূপান্তরিত হয়েছিল; হয়ত বা জীবনের সমস্যার প্রতি মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গিও অনেকটা বেড়েছিল। কিন্তু এই রূপান্তর কি ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুনেই ঘটেছিল? ওগুলি ত উনিশ শতকের ঘটনা। আঠারো শতকের শেষার্ধকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিকাল রূপে ধরে নেওয়া যায়। বেশ কিছু দিন ধরে বিদেশী **mercantile capitalism** বা বাণিজ্যকেন্দ্রিক ধনতন্ত্র ও দেশের পুরনো সামন্ততন্ত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। এই দ্বন্দ্বের মূল কারণ, পলাশীর যুদ্ধের বহু পূর্ব থেকেই ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ক্রমাগত বর্ধিত হারে পুঁজি বিনিয়োগ। এই দ্বন্দ্বই ১৭৫৬-৫৭ খ্রীস্টাব্দের ঘটনার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত সংঘর্ষের রূপ নিয়েছিল। তাতে করে সামন্ত-তন্ত্রের বুনিয়াদ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া বহু আগে থেকেই সামন্ততন্ত্রে অবক্ষয়ের লক্ষণগুলি প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই সকল কারণে ধনতন্ত্র ঘনিষ্ঠভাবে দানা বাঁধার সুযোগ পেয়েছিল। বহু বছর ধরে ইয়োরোপীয় বণিকগণ যৌথ সঙ্গ বা **joint stock company** গঠন করে সমগ্র এশিয়ার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে আসছিল। এ ধরনের ব্যবসায়িক সংগঠনপদ্ধতি এশীয় বণিকদের জানা

ছিল না। তা ছাড়া যখন ইয়োরোপীয়গণ এ দেশে বাষ্পচালিত নৌযান বা সমুদ্রযান চালু করল, তখন থেকে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ইয়োরোপের বণিকদের আশেপাশে আসবার সামর্থ্যও আর এশীয়দের রইল না। পলাশীর ঘটনাটি না ঘটলেও আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে প্রাকৌশলিক ও বাণিজ্যিক নৈপুণ্যের বলে এ দেশের প্রশাসন, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে পশ্চিমের বণিকদের আধিপত্য স্থাপিত হতই। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে সমগ্র পূর্ব ভারতের রাজস্বের উপরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃত্ব স্থাপন পশ্চিমের ধনতন্ত্রের অগ্রগতি বাড়িয়ে দিয়েছিল বলে মনে করার কারণ আছে। মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে এতটা সংঘবদ্ধভাবে পুঁজি নিয়োগ ও সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে শ্রমশক্তির ব্যবহার ইতিপূর্বে আর কখনো হয়েছে কি না তা ভেবে দেখা দরকার। ধনতন্ত্রের সক্রিয় প্রভাবে সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসেও পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল। কোম্পানীর সহায়ক হিসেবে বেনিয়ান-গোমস্তাদের উদ্ভব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই নতুন শ্রেণীর লোকজন প্রথমে ব্যবসায়ী রূপে এবং পরবর্তীকালে তাদের বংশধরগণ জমিদার রূপে বিদেশী ধনিক শ্রেণীর প্রবল সমর্থক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছিল। উনিশ শতকের বুদ্ধিদীপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমবিকাশও উল্লিখিত আর্থনীতিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে হয়। সুবিধার খাতিরে আমরা ধরে নিতে পারি যে, সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের এই অভূত-পূর্ব পরিবর্তনই একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিল। তথাকথিত রিনেসাঁস থেকে পূর্বোক্ত জমিদার শ্রেণী ও বুদ্ধিদীপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা বুর্জোয়াদেরকে আলাদা করে দেখা যায় না, কারণ সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা ও অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি আর্থনীতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যখন এই নতুন লোকগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটল, তখন থেকেই আধুনিক যুগের সূত্রপাত বলে আমরা ধরে নিতে পারি। এই আধুনিক যুগের তাৎপর্য একদিক দিয়ে অত্যন্ত ব্যাপক এবং অন্যদিকে আবার খুবই সীমিত। কলিকাতাকেন্দ্রিক বাংলাদেশে পাশ্চাত্যের প্রভাব সক্রিয় হয়ে একটি বিশেষ অঞ্চলের ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতি ও সাহিত্যে বিপ্লব বয়ে আনে এবং ভারতের অন্য কতকগুলি অঞ্চলেও তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কৃষির ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো নতুন প্রকৌশল প্রয়োগ না করার ফলে গ্রাম বাংলার জীবন-ব্যবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেল। সেই জন্য গ্রামাঞ্চল আধুনিকতার স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে রইল। আবার আধুনিক যুগের সূত্রপাত যেখানে হল, সেখান থেকে মধ্যযুগের ভাবদৃষ্টি, সংস্কার ও সমাজ ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ তিরোহিত হল তাও সত্য নয়।

তথ্য-নির্দেশ

১। *Da Asia* র উদ্ধৃতি ; M. L. Dames : *The Book of Duarte Barbosa*, vol. II, Hakluyt Society, London, 1921, p. 246.

২। ইতিহাস, প্রথম বর্ষ (১৩৭৪), তৃতীয় সংখ্যা, পৃঃ ২৩৪-৪৪।

৩। নীহাররঞ্জন রায়ঃ বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৩৫৯, পৃঃ ১৯৪-২০০ ।

৪। Ma Huan, *Ying-yai Sheng-lan* : The Overall Survey of the Ocean's Shores [1433] ; translated and edited by J.V.G. Mills ; Hakluyt Society Publication, Cambridge, 1970, p. 161.

৫। প্রবোধচন্দ্র বাগচী কর্তৃক অনূদিত ; *Visva-bharati Annals*, 1944, I, pp. 117, 123 and 125.

৬। মা হুয়ানের বিবরণ, পূর্বোক্ত, pp. 161—63 ; অন্যান্য চীনা বিবরণের অনুবাদ, *Visva-bharati Annals*, 1945, pt. I, pp. 119-20, 123, 125-26, 132; মমতাজুর রহমান তরফদারঃ 'চৈনিক পরিব্রাজকের দৃষ্টিতে মুসলিম বাংলা', বাংলা একাডেমী পত্রিকা, প্রথম বর্ষ (১৩৬৪), ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৪১-৪২, ৪৬, ৪৮।

৭। Ludovico di Varthema : *The Travels of Varthema*, John Winter Jones কর্তৃক অনূদিত এবং George Percy Badger কর্তৃক সম্পাদিত; Hakluyt Society, London, 1863, p. 212.

৮। Meilink-Roelofsz : *Asian Trade And European Influence In The Indonesian Archipelago Between 1500 And About 1630*. The Hague, 1962. p. 40 ; p. 339, n. 25.

৯। Barbosa : পূর্বোক্ত, pp. 145-46 ; Tome Pires : *Suma Oriental of Tome Pires*, A Cortesao কর্তৃক সম্পাদিত, Hakluyt Society, London, 1944, vol. I, p. 93.

১০। Varthema : পূর্বোক্ত, p. 212; Barbosa: পূর্বোক্ত, pp. 145-46 ; আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ M.R. Tarafdar : *Husain Shahi Bengal* : Dacca. 1965, p. 147.

১১। মা হুয়ানের বিবরণ, পূর্বোক্ত, pp. 162-63 ; অন্যান্য চৈনিক বিবরণের অনুবাদ, *Visvabharati Annals*, পূর্বোক্ত, pp. 119-20, 125-26 এবং 132.

১২। এই বিবরণের সংস্করণের জন্য দ্রষ্টব্য পাদটীকা ৯। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও আবশ্যকীয় দলিল-দস্তাবেজের ভিত্তিতে এই বিবরণ সঙ্কলিত হয়েছিল ১৫১২ থেকে ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। এশীয় বাণিজ্য সম্পর্কে তথ্যের যে ঐশ্বর্য এই বিবরণে বিধৃত, তা সমসাময়িক কালের অন্য কোনো পর্যটকের বর্ণনায় আদৌ চোখে পড়ে না।

১৩। Pires : I, P. 93 ; Meilink-Roelofsz : পূর্বোক্ত, p. 68.

১৪। Aspects of Bengal's Sea—borne Commerce in the Pre-European Period, তৃতীয় বার্ষিক ইতিহাস সম্মেলন (১৯৭৩), অভিভাষণ, প্রবন্ধাবলী ও কার্য বিবরণী, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃঃ ১৪১-৫৪।

১৫। Pires : পূর্বোক্ত, I, pp. 88, 92, 93; Barbosa : পূর্বোক্ত, II, pp. 142, 145, 146; Meilink-Roelofsz, পূর্বোক্ত, pp. 68 and 69. অরুণ দাশগুপ্ত : পূর্বোক্ত, p. 154.

১৬। Pires, I, pp. 96, 97, 100, 104, 109, 111, 130, 131, 133. 136, 139, 140, 142, 143, 174, 186, 227; II, 270-271 ; অরুণ দাশগুপ্তের প্রবন্ধ।

১৭। Pires, I, pp. 13, 17, 45; বার্বোসা কর্তৃক উল্লিখিত দেশগুলি হচ্ছে—"Charamandel, Malacca, Camatra, Peeguu, Cambaya and Ceilam," পূর্বোক্ত, II, p. 145 ; ভার্থেমা বলেছেন যে, বাংলার বস্ত্র ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যেত। পূর্বোক্ত, p. 212. রাল্‌ফ্ ফিচ উল্লেখ করেছেন "India, Ceylon, Pegu, Malacca, Sumatra and other countries", *Purchas His Pilgrims*, vol. X, Glasgow, 1905, p. 185.

১৮। Pires, I, p. 93; Meilink-Roelofsz : পূর্বোক্ত, p. 8.

১৯। Pires, I, pp. 93, 94, 95; Meilink-Roelofsz : পূর্বোক্ত. p. 69.

২০। Pires, I, p. 92 ; Meilink-Roelofsz : পূর্বোক্ত, p. 69.

২১। ঐ।

২২। প্রবোধচন্দ্র বাগচীর অনুবাদ থেকে বাংলা একাডেমী পত্রিকায় উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪।

২৩। B. Schrieke : *Indonesian Sociological Studies,* Selected Writings. pt. I, The Hague, 1955, pp. 7-18.

২৪। Meilink-Roelofsz : পূর্বোক্ত, p. 15 এবং অরুণ দাশগুপ্তের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ১৪৩-৪৪।

২৫। ঐ, পৃঃ ১৪৪-৫১।

২৬। এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করে Schrieke বলেছেন যে, চৌদ্দ শতক থেকে কাম্বের ব্যবসায়িগণ যখন ইয়োরোপের চাহিদা মিটাতে লাগল, তখন থেকেই চীন, ভারতের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়েছিল এবং ১৪০০ খ্রীস্টাব্দের দিকে এসে চীনাদের কাছে থেকে ভারতীয়দের কাছে এই বাণিজ্যিক হস্তান্তরের ঘটনাটি একটা স্থায়ী রূপ নিয়েছিল ; পূর্বোক্ত, p. 25 ; ষোল-সতেরো শতক পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল ; Schrieke. pp. 29-30, 55-56 ; J.C. Van Leur : *Indonesian Trade and Society,* The Hague, 1955, p. 125 ; Meilink-Roelofsz : পূর্বোক্ত, pp. 76, 78, 79, 146, ইত্যাদি।

২৭। ঐ, p. 74.

২৮। Schrieke : ***Indonesian Sociological Studies.*** Selected Writings,

pt. II, The Hague, 1957. pp. 231. 232-37.

২৯। Meilink-Roelofsz : পূর্বোক্ত, pp. 63-64.

৩০। করমণ্ডল উপকূলে একটি শক্তিশালী বণিক সম্প্রদায় গড়ে উঠে ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যে অংশ নিচ্ছিল। বিদেশী লেখকদের বর্ণনায় এরা kling রূপে অভিহিত, ঐ, pp. 66-67.

৩১। বিপ্রদাস : মনসা-বিজয় : সম্পাদক : সুকুমার সেন, Bibliotheca Indica, কলিকাতা, ১৯৫৬, পৃঃ১৪২-৪৩ ; বৃন্দাবনদাস : শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, ৪৪০ গৌরাঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৮১।

৩২। পূর্বোক্ত, pp. 160, 161 এবং 165.

৩৩। Pires, I, 93 ; II, 240, 265, 270-71.

৩৪। ঐ, I, 142-43; পিরেসের এই অভিমত সমর্থন করে Meilink-Roelofsz বলেছেন যে শ্রীবিজয় ও বৌদ্ধ আমলের বাংলার মধ্যে সম্পর্ক ছিল বলে এ ধরনের ঘটনা অসম্ভব নয় ; তা ছাড়া বার শতকের শেষদিকেই বাংলায় মুসলিম রাজ্যও স্থাপিত হয়েছিল, পূর্বোক্ত, p.21. Schrieke মনে করেন যে পাসেই-এর মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আল-মালিক-উস-সালিহ কাম্বে থেকে এসেছিলেন ; II, pp. 233-34 এবং এই রাজ্যের সুলতানদের সমাধি-সৌধের সঙ্গে গুজরাটের সমাধি-স্থাপত্যের মিল আছে ; ঐ, p. 261 ; পিরেসের বিবরণ Schrieke-এর অজানা ছিল।

৩৫। Barbosa, II, p. 139 এবং Pires, I, 88.

৩৬। পূর্বোক্ত, p. 165.

৩৭। Pires, II, p. 445.

৩৮। পূর্বোক্ত, p. 160.

৩৯। Varthema: পূর্বোক্ত, p. 212.

৪০। Barbosa : pp. 147-48. মমতাজুর রহমান তরফদার : 'বার্বোসার দৃষ্টিতে বাংলাদেশ', ইতিহাস (কলিকাতা), ষষ্ঠ খণ্ড (১৩৬৩), চতুর্থ সংখ্যা, পৃঃ ২৩৮ ; 'Bengal As Seen By A Portuguese Traveller'. *New Values* (Dacca), vol. x (1959), No. I, p. 25; *Husain Shahi Bengal*, p. 313.

৪১। Barbosa, I, pp. 127, 128.

৪২। J. N. Sarkar : *History of Bengal*, vol. II, Dacca, 1948, pp. 497, 498.

ইতিহাস-রচনা প্রসঙ্গে

শাব্দিক অথবা বৈয়াকরণিক অর্থে 'ইতিহাস' শব্দটির জাত্যর্থ (connotation) নিরূপণ কোনো দুরূহ কাজ নয়। কিন্তু শব্দটির প্রচলিত ব্যাপক অর্থের দিকে নজর রেখে এর কোনো সঠিক সংজ্ঞা দেয়া মুশকিল। সেইজন্য আলোচনার শুরুতে অতি পরিচিত একটি সংজ্ঞাই উল্লেখ করছি: **History is a movement in time:** সময়সীমার মধ্যে ইতিহাস একটি আন্দোলন। এই অভিধা মেনে নিলে দেখা যায় যে, ইতিহাস অতীতের কঙ্কাল নয়, শবাধারে পাঁচ হাজার বছর ধরে বন্ধ করে রাখা মমির মত কোনো নিশ্চল পদার্থ নয়। এ হচ্ছে আন্দোলন, যার গতি আছে--যা অতীত থেকে শুরু করে বর্তমানের সময়-সীমার ভিতর দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলে। এই গতিশীলতাকে মেনে নিলেই বুঝতে হবে যে, ইতিহাসে ধারাবাহিকতা আছে এবং সে ক্ষেত্রে আমাদের কাজ ইতিহাসে প্রবহমানতা, পরিবর্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা; অর্থাৎ রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির রূপ ও প্রতিষ্ঠান যেমন বদলে যায়, তেমনি এদের মধ্যকার কতকগুলি আবার টিকেও থাকে এবং কতকগুলি অদৃশ্য হয়।

ইতিহাস যেহেতু সময়-সীমার মধ্যে আন্দোলন বিশেষ, সময়ের বৈশিষ্ট্য নিরূপণও ঐতিহাসিকের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এখানে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে আছে সময়ের পরিবর্তন লক্ষ্য করা এবং আবশ্যক মত যুগ-বিভাজন বা periodisation-এর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যার আলোচনা। যুগ-বিভাজন বিভিন্ন উপায়ে সম্ভব। "তবে বর্তমান লেখকের ধারণা, উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে কোনো একটি যুগকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে গেলে সে প্রচেষ্টা সত্যিকারভাবে বিজ্ঞানসম্মত বা সার্থক হতে পারে না।"[১] মার্কসবাদী বা ওয়েবারপন্থী রীতির যান্ত্রিক অনুসরণে সমগ্র উপমহাদেশকে একটি ইউনিটরূপে ধরে নিয়ে এই বিশাল ভূখণ্ডকে অর্থনীতি বা সমাজতত্ত্বের ভিত্তিতে একই ছকে ফেলে যুগ-বিভাগে চিহ্নিত করতে গেলে তা সুষ্ঠু নাও হতে পারে। যুগ-বিভাগের প্রসঙ্গে আঞ্চলিক ভূগোল ও অর্থনীতির প্রতি গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক। বাংলার যুগ-বিভাগের আলোচনায় অন্যত্র বলেছি যে, তের শতকে **natural economy** বা দ্রব্যবিনিময়-ভিত্তিক অর্থনীতির স্থানে **money economy** বা মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির প্রচলন, বৈদেশিক বাণিজ্যের আরম্ভ ও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, এবং সেই কারণে

সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে পরিবর্তন এবং কোনো না কোনো ধরনের প্রাকৌশলিক পরিবর্তন তথা-কথিত মুসলিম বাংলায় যুগান্তরের সূচনা করেছিল। সেকালের ভারতের সবগুলো অঞ্চলেই যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা দিয়েছিল, তা বোধ হয় সত্য নয়। আবার বিদেশী **mercantile capitalism** বা বাণিজ্যকেন্দ্রিক ধনতন্ত্র আঠার শতকের শেষার্ধে বাংলায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, তাকে অন্য এক যুগান্তরের নিয়ামক হিসেবে ধরে নেয়া যায়।[২] ইরফান হাবিব কর্তৃক উল্লিখিত, মধ্যযুগের ভারতে প্রাকৌশলিক উদ্ভাবন এবং সমাজ-বিন্যাসের পরিবর্তনকে কাল-বিভাজনের চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করা যায় কি না, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে।[৩] উপমহাদেশের প্রত্যেক অঞ্চলকে একই সূত্রের অনুসরণে বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করতে গেলে যে সে প্রচেষ্টা একটি জটিল সমস্যার সরলীকরণ হয়ে দাঁড়াবে, এ কথা একটু আগেই বলেছি।

উপরে উল্লিখিত ইতিহাসের ব্যাখ্যাসূচক সংজ্ঞাটির মধ্যে সময় সংক্রান্ত সমস্যা ছাড়া স্থানিক সমস্যাও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। স্থান-নিরপেক্ষ কালের অস্তিত্ব নেই বলে কোনো স্থানের বা দেশের ইতিহাস রচনাই সম্ভব। গবেষণার ক্ষেত্র-নির্বাচনের সঙ্গে এই সমস্যাটি জড়িত। বিশেষ কোনো দেশকে এবং যুগকে ঐতিহাসিক আলোচনার জন্য কেন বেছে নিচ্ছেন, এ ধরনের কৈফিয়ৎ তাঁর কাছ থেকে স্বভাবতই আশা করা হয়ে থাকে। এই কৈফিয়ৎ বিভিন্ন রকমে দেয়া যেতে পারে। *Economic and Social History of Europe* লিখতে গিয়ে **Henri Pirenne** রোমান সাম্রাজ্যের সময় থেকে শুরু করে পনের শতক পর্যন্ত সময়ের পশ্চিম ইয়োরোপকে একটি ইউনিট রূপে ধরে নিয়েছেন। এই ইউনিটের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ ছিল।[৪] ঐ একই কারণে রোমান আমলের সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অন্তর্গত এশিয়া, আফ্রিকা ও ইয়োরোপের অংশগুলিরও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচিত হতে পারে। চসারের (১৩৪০-১৪০০ খ্রীঃ) সমকালীন ইংল্যাণ্ড বিশিষ্ট ; কারণ সেখানে জাতি হিসেবে এবং সংস্কৃতির দিক দিয়ে একটি একক ইংরেজ লোকগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে এবং এই জাতির সাহিত্য, ধর্ম, অর্থনীতি এবং যুদ্ধ-কৌশলের ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যাচ্ছে, তা চরিত্রগতভাবে এ্যাংলো-স্যাক্সন্ নয়, ফরাসী নয়, বরং তা একান্তভাবে ইংল্যাণ্ড-দ্বীপের লোকজনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই জন্য চসারের ইংল্যাণ্ড **G. M. Trevelyan**-এর *English Social History*-তে[৫] একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করেছে। মুসলিম যুগের বাংলার ইতিহাস রচনার সপক্ষেও অনেকগুলি যুক্তি দেখানো যেতে পারে। এই যুগে বাংলার ছিন্নবিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলি

একই রাজশক্তির অধীনে একত্রিত হয়ে একটি রাজনৈতিক ইউনিটে পরিণতি পায়। বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিকাশের মাধ্যমে সমগ্র অঞ্চলের উপর প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। এ দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের মারফৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং অন্য দিকে আবার আরব, পারস্য এবং আফ্রিকা ও ইয়োরোপের কতকগুলি অঞ্চলের সঙ্গে অর্থনৈতিক সূত্রে সম্পর্কিত হয়। আসাম-আরাকানের সীমান্ত থেকে পূর্নিয়া, রাজমহল এবং ভাগলপুর পর্যন্ত ঐবং হিমালয়ের সানুদেশ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলটির ভৌগোলিক বৈচিত্র্যও ভারতের অন্যান্য এলাকা থেকে অনেকটা ভিন্ন ধরনের। জাতিতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলেও এ দেশে লোকজন সম্পূর্ণভাবে একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হলেও অন্ততঃ সমশ্রেণীভুক্ত (homogeneous)। এ জাতীয় মন্তব্যের ভিতর কিছুটা সরলীকরণ আছে। এ দেশের ইতিহাসের ও লোকগোষ্ঠীর প্রকৃতিগত জটিলতাও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, টিবেটো, চাইনিজ, আর্য, আলপাইন, তুর্কী, হাবশী, আরব, পারসিয়ান, আফগান, মোগল ও ইয়োরোপীয় লোকগোষ্ঠীর এখানে বিভিন্ন সময়ে আগমন ঘটে। এই বিপুল জনস্রোত হাজার হাজার বছর ধরে এ দেশে লোকগোষ্ঠীর শরীরে একদিকে যেমন অদ্ভুত রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি আবার ভাষা ও সংস্কৃতি গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীর উপস্থিতির ফলে এ দেশের ধর্ম, সংস্কার ও মূল্যবোধে এবং সমগ্র সংস্কৃতিতে এক অসাধারণ জটিলতা দেখা দিয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্র-নির্বাচন করার সময় ঐতিহাসিকের তরফ থেকে তাই চূড়ান্ত মূল্য-চেতনা ও পরিবেশ-চেতনা অপরিহার্য। এ দেশের ইতিহাস আলোচনা সার্থক হতে পারে যদি বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতা বা রূপান্তরের সঙ্গে বিহার, গুজরাট বা অন্য কোন সমকালীন সামাজিক ইউনিটের তুলনা করা যায়।[৬] বাংলার ইতিহাসে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে, তার সঙ্গে তুলনা করে মধ্যযুগের অন্যান্য প্রাদেশিক রাজ্যের ইতিহাস অনুরূপ পদ্ধতিতে রচিত হতে পারে। এই আলোচনার আওতায় আসবে নতুন ও পুরনো লোকগোষ্ঠীর সংস্পর্শ, সংঘাত ও সংমিশ্রণ।

ইতিহাসকে রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিধায় চিহ্নিত করার রেওয়াজ বহুদিন হল চালু হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ এবং সংস্কৃতি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এ জাতীয় বিভাগের উপর জোর দেয়া হয় সীমিত-শক্তি গবেষকের সুবিধার জন্য। বিশেষ অর্থনীতির উপর সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত—রাজনীতিও গড়ে ওঠে এবং পূর্ণতা পায় সমাজের উপর নির্ভর করেই। আমাদের দেশে এবং অন্যত্র রাজনৈতিক ইতিহাসে

গবেষণার গুরুত্ব সাম্প্রতিক কালে অনেকটা কমে গেছে। ইতিহাসের এই শাখাটিকে উপেক্ষা করার কোনো কারণ নেই। রাজনীতি একটি রূপরেখা বা কাঠামো যাকে বাদ দিলে সামাজিক ও আর্থনীতিক ইতিহাসের অনেক কিছুই বোধগম্য হবে না। মধ্যযুগে, এমন কি প্রাচীন কালেও রাষ্ট্র থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রবল কারণিক প্রভাব উদ্ভূত হয়ে সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরে বিচিত্রভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে। সেইজন্য রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোচনায় রাষ্ট্রকে কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়। তবে রাজনীতিকেও সমাজ ও অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখলে তখনই রচিত হবে পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ইতিহাস। রাজরাজড়ার আচার-আচরণ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের ফিরিস্তির চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রকাঠামো, রাষ্ট্রীক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ ও পরিবর্তন এবং যে সকল সামাজিক প্রভাব ও আর্থনীতিক শক্তি রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পেছনে ক্রিয়াশীল, তাদের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন। এরূপ ক্ষেত্রেই রাজনীতি বা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, সমাজ ও অর্থনীতির বহিরঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

কার্লমার্কসের **dialectical materialism**-সংক্রান্ত মতবাদ প্রচারের পর থেকে সামাজিক ও আর্থনীতিক ইতিহাস রচনার প্রতি ঝোঁক অনেকটা বেড়েছে। সমাজ বিশেষের লোকগোষ্ঠীর কার্যকলাপ, আচার-ব্যবহার, সংস্কার এবং তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক আলোচনা সামাজিক ইতিহাসের বিষয়বস্তু এবং ধন উৎপাদনের বিভিন্ন পন্থা বা প্রক্রিয়া এবং উৎপাদন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও পেশার ভিত্তিতে গঠিত সমাজ-কাঠামোর বিন্যাস আর্থনীতিক ইতিহাসের আওতায় পড়ে। তবে রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতি মানুষের জৈবিক প্রয়োজনে গড়ে ওঠে এবং এগুলিই জৈবিক চাহিদাই মেটায়। জৈবিক প্রয়োজনের অনেক ঊর্ধ্বে সংস্কৃতির স্থান এবং এই সংস্কৃতি মানুষের বুদ্ধিমত্তার সৃষ্টি এবং তা তার মানসিক অনুশীলন ও পরিশীলনের পরিচয় বহন করে। সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতি সংস্কৃতির অঙ্গ। এগুলি নাগরিক জীবনের সৃষ্টি এবং এইগুলির বাইরেও আছে গ্রামীণ বা লোকজ শিল্পের এক বহুবিচিত্র এলাকা। এই বিষয়গুলির আলোচনাতেও সামাজিক ও রাষ্ট্রীক পটভূমিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যে সকল মালমশলা ব্যবহার করি তাকে সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক, এই ধরনের প্রধান দুটি শ্রেণীতে চিহ্নিত করা যায়। প্রত্নতত্ত্বের আওতা থেকেই জন্ম নিয়েছে **auxiliary sciences** যা ইতিহাস রচনায় অত্যন্ত সহায়ক এবং অনেক ক্ষেত্রে আবার এগুলির যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। সহায়ক-বিজ্ঞানগুলো হচ্ছে স্মৃতি-সৌধাদির আলোচনা-

বিদ্যা, লিপিতত্ত্ব, হস্তলিপি-বিজ্ঞান, মুদ্রাতত্ত্ব ইত্যাদি। প্রত্ন-তাত্ত্বিক মালমশলা থেকে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা সাহিত্যিক উপকরণের তথ্যের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশী নির্ভরযোগ্য। এই মালমশলাগুলি এবং কোনো দলিল-দস্তাবেজে বর্ণিত ঘটনা বা তথ্য ইতিহাস নয়, তারা ইতিহাসের উপাদান মাত্র। তারা ইতিহাসে ব্যবহারের জন্য সমালোচনামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচনের অপেক্ষায় থাকে এবং নির্বাচিত তথ্য যখন ঐতিহাসিকের অতীত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার স্পর্শ পায় এবং ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিশেষ মূল্য ও ঘটনার সম্পর্কের ভিত্তিতে বিন্যস্ত হয়, তখনই তারা ইতিহাস রূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

ইতিহাস-রচনার পদ্ধতি গবেষণা বা অনুসন্ধানের সঙ্গে সংযুক্ত এবং এই অনুসন্ধান আবার ঐতিহাসিকের সমালোচনা-ভিত্তিক চিন্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই চিন্তন অতীতের মানবগোষ্ঠীর কার্যকলাপ ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে। **R. G. Collingwood**-এর মতে ইতিহাস হচ্ছে **re-enactment of past experience.**[৭] এই মন্তব্য সম্পূর্ণরূপে মেনে নিলে বলতে হয় যে, অতীত সম্বন্ধে চিন্তন পুরোপুরি একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়াটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও অতীত সম্বন্ধে আংশিক জ্ঞানলাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়; তবে পরিপূর্ণ জ্ঞান কখনো সম্ভব নয়; কারণ মানবীয় অতীতের সামগ্রিকতাকে জানতে হলে অতীত ঘটনার ফটোগ্রাফিক চিত্রণ অপরিহার্য। এই কাজটি অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে দুটি প্রধান কারণে। আমরা হাতের কাছে অতীতের যে প্রতীকগুলো পাই, তা নিতান্ত সীমিত এবং তার শত শত, এমন কি হাজার হাজার গুণ তথ্য সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়েছে; তারা প্রত্ন-প্রতীকে অথবা লিপিবদ্ধ অবস্থায় আদৌ ধরা পড়েনি। অন্য একটি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তথাকথিত **fact** বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ঘটনা তেজাবি সোনার মত কোনো নিরেট ও খাঁটি পদার্থ নয়। প্রত্যেক ঘটনাই **reported fact** বা নিতান্ত পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত ঘটনা। প্রথম যিনি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁর প্রবণতা, সমসাময়িক কালের মূল্যবোধ ও মানসিক গঠন এবং বর্তমানে যে ঐতিহাসিক ঐ ঘটনাকে কাজে লাগাচ্ছেন, তাঁর মন ও পরিবেশ বিভিন্ন পর্যায়ের। সময়-সীমার দুই প্রান্তে অবহিত এই দুই ব্যক্তির মানসিকতা কিছুতেই এক হতে পারে না। প্রথম যিনি ঘটনাকে কাগজে লিখেছেন অথবা পাথরে উৎকীর্ণ করেছেন, তিনি ঐ কাজটি করেছেন হয়ত বা বিশেষ কোনো তাগিদে, হয়ত প্রচারণার উদ্দেশ্যে। যদি তাঁর আন্তরিকতা বা সততা নিঃসন্দেহ বলেও প্রমাণিত হয়, তবুও ঐ বিধৃত ঘটনায় তাঁর মন অবচেতনভাবে সম্পাদনার কাজ করেছে।

তিনি ঘটনাকে যেমনভাবে বুঝেছেন, তেমনিভাবে তা ধরে রেখেছেন এবং সবগুলি ঘটনাকে তিনি সমানভাবে গুরুত্ব অনুসারে গাণিতিক অনুপাতের মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে পারেননি। পরবর্তীকালে যাঁরা ঐ ঘটনাগুলিকে তাঁদের লেখায় স্থান দিচ্ছেন, তাঁদের নির্বাচন-ক্রিয়ার মধ্যেই এক ধরনের ব্যাখ্যাসূচক ও সম্পাদনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তারপর ঐ ঘটনাগুলির সম্পূর্ণ বা আংশিক রূপান্তর ঘটে পরবর্তীকালের ব্যক্তিদের নির্বাচনের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাখ্যায়।

এ কথা বলছি না যে, ঘটনাকে কিছুতেই জানা যায় না। আমরা ঘটনা সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করি, তা অনেকটা প্রতিসরিত আলোকের মত এক বিশেষ ধরনের অন্তর্দৃষ্টি, যাতে অতীতের আংশিক চেহারা ধরা পড়ে এবং অতীত সম্বন্ধে এই আংশিক জ্ঞানই অত্যন্ত মূল্যবান। ঘটনার ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপকরণগুলির আংশিক পরিশোধন সম্ভব নির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যাত ও গৃহীত কোনো তুলনামূলক আলোচনার মানদণ্ডের সাহায্যে। বিশেষ ধরনের কতকগুলি তাথ্যিক বিকৃতি অথবা ঘটনার আদর্শায়নও এড়াতে পারা যায় সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই। পলাশীর যুদ্ধের সমকালীন ভারতীয় লেখকগণ এই যুদ্ধ ও অন্যান্য ঘটনা উল্লেখ করেছেন অনেকটা আবেগবর্জিতভাবে। তাঁদের মধ্যকার একজন আবার অন্ধকূপ রহস্যের ঘটনাও উল্লেখ করেছেন।[৮] কিন্তু উনিশ ও বিশ শতকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে ঐ ঘটনাগুলি ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিল। এসব ক্ষেত্রে আপেক্ষিকভাবে বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার প্রয়াস কোনো দুরূহ কাজ নয়।

ইতিহাস-রচনা বা ইতিহাসের পুনর্গঠন সম্ভব প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে এবং সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর লাভের প্রচেষ্টার মাধ্যমে। যে ক্ষেত্রে উত্তর লাভের সম্ভাবনা কম, সেখানেও প্রশ্ন উত্থাপন পদ্ধতির দিক দিয়ে একটি জরুরি কাজ। সুষ্ঠু ইতিহাস-রচনা আংশিকভাবে নির্ভর করে ঐতিহাসিকের প্রশ্ন উত্থাপনের নৈপুণ্য, অন্তর্দৃষ্টি ও অন্যান্য গুণের উপর। এই পদ্ধতিতে গবেষণা চালিয়ে গেলে দেখা যাবে যে, অতীতের কার্যাবলী, প্রতিষ্ঠান, সংস্কার, রীতিনীতি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ প্যাটার্নে বা বিন্যাসে শ্রেণীবদ্ধ এবং ঘটনাগুলির পেছনে কারণ আছে। এই কারণ হতে পারে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। সম্ভাব্য উপায়ে কারণগুলিকেও পারম্পর্যের ছকে ফেলে বিশ্লেষণ করা ঐতিহাসিকের কাজ। Francois Simiand কারণ ও শর্তের (Condition) মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন।[৯] ঐতিহাসিক ঘটনার কারণগুলো অবশ্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ঘটনার কারণসমূহের মত নির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যাত ও নির্ধারিত নয়। সূর্যগ্রহণ,

চন্দ্রগ্রহণ, মৌসুমী বৃষ্টিপাত প্রভৃতিকে যেমন সুনির্দিষ্ট কারণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়, ইতিহাসের ঘটনাকে এ ধরনের কারণিক শৃঙ্খলার ধরা-বাঁধা ছকের মধ্যে ফেলে বুঝতে পারা যাবে না। মানবীয় ঘটনা মানুষের সৃষ্টি এবং মানুষের মনোজগৎ ও ব্যবহার আবার বহুবিচিত্র। সেইজন্য ইতিহাসের ঘটনার কারণেও অনেক সময় অনন্ত জটিলতা থাকতে পারে। কার্যকারণের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আছে নিমিত্তবাদ বা **determinism** এবং ইতিহাসে আকস্মিকতা বা **accident**-এর সমস্যা। Hegel ও Karl Marx থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালের Carr প্রমুখ লেখক এসব বিষয়ে জটিল যুক্তির অবতারণা করেছেন। এ দুটি বিষয়ে আমাদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। ঘটনা কারণ-পরম্পরা দ্বারা নির্ধারিত। কারণে পরিবর্তন যদি দেখা দেয় তবে ঘটনাতেও পরিবর্তন প্রকাশ পাবে এবং এ ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছা-শক্তি ও কর্মশক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়াই যুক্তিসঙ্গত। আকস্মিকতা কারণ নয় এবং এর সামান্যীকরণ সম্ভব নয়। সেইজন্য আকস্মিকতার ক্রিয়াশীলতার ফলে ঘটনা কতদূর প্রভাবিত হল, তাই নির্ণয় করা একটি জরুরী কাজ।

আমরা দেখেছি যে ঐতিহাসিক গবেষণার নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য আছে। আবশ্যক মত ইতিহাস রচনায় সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতির সাহায্য নেয়া যেতে পারে ঐতিহাসিক পদ্ধতিকে বিসর্জন না দিয়ে।[১০] জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে ইতিহাস একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশ।

পরিশিষ্ট

রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা কমিয়ে আনার সপক্ষে যুক্তি দিতে পারা যায়। ইতিহাসের এই উভয় দিকই আবার দেশবিশেষের অর্থনীতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ঊনিশ শতকের সাহিত্যে ডিকেন্স ও টলস্টয়ের মানববাদ সুস্পষ্ট। তবুও এ কথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে, কার্ল মার্কস ও এঙ্গেল্সের Communist Manifesto প্রচারের বেশ কিছু কাল পর থেকে সামাজিক ও আর্থনীতিক ইতিহাস রচনার গুরুত্ব বেড়ে যায়। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও বোধ হয় তেমনি মার্কসবাদের প্রভাব সক্রিয় হয়েছিল। ভারতে কুনওয়ার মুহম্মদ আশরাফ এবং ইংল্যাণ্ডে Trevelyan মনে হয় স্পষ্টভাবেই এই প্রভাবের আওতায় এসেছেন। সময় ও স্থানের মধ্যে সীমিত সমাজবিশেষের বিকাশের ধারাবাহিকতার বর্ণনাই ইতিহাস। এই বর্ণনা দিতে গেলে দেখা যাবে যে পরিবর্তন ও প্রবহমানতাই ইতিহাসের আন্দোলনে প্রাণশক্তি যোগায়। সেইজন্য অস্ট্রেলিয়া বা ভারতের আদিবাসীদের cultural anthropology বা সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব ইতিহাসের পর্যায়ে পড়ে না; বিদ্যার এই শাখাটি ফটোগ্রাফিক চিত্রণের মত,

যা ইতিহাসের মালমশলা হিসেবে গৃহীত হতে পারে। ইতিহাসের আলোচনায় সমাজ-তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও অর্থনীতির নিয়মকানুনের ব্যবহার সম্ভব, ইতিহাসের নিজস্ব পদ্ধতিকে বাদ না দিয়ে। গবেষণার ক্ষেত্র-নিবাচন বা selection of the unit of investigation এবং কাল-বিভাজন বা periodisation ইতিহাসের আলোচনায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। প্রথম সমস্যাটির দিকে নজর দিতে গিয়ে ঐতিহাসিককে ক্ষেত্র-বিশেষের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে এবং দ্বিতীয় সমস্যাটির সঙ্গে প্রাকৌশলিক বা আর্থনীতিক পরিবর্তনের প্রশ্ন জড়িত হয়ে থাকে। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা উল্লেখ না করে ইতিহাসে কাল-বিভাজন প্রায় অসম্ভব। দরবারি ইতিবৃত্ত বা সরকারী নথিপত্র ছাড়াও অরাজনৈতিক সূত্র, যেমন সুফীদের রচনা বা তাঁদের জীবন-বৃত্তান্ত এবং সমকালীন কাব্য ও গদ্যসাহিত্য থেকে ইতিহাসের উপাদান গৃহীত হতে পারে। সাহিত্যিক উৎস ছাড়াও আছে প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণের আকরসমূহ; যেমন, মুদ্রা, শিলালিপি, ইমারৎ এবং ঐ জাতীয় মালমশলার আরো বহুবিচিত্র ক্ষেত্রগুলি। শিল্পকলার জন্ম মানসিক পরিশীলন থেকে; তাই তা জৈবিক প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে এবং এই শাখাটির ইতিহাস স্বতন্ত্রভাবে রচিত হওয়া দরকার। ইতিহাসও জৈবিক প্রয়োজনে আসে না; তাই তার প্রয়োগ-মূল্য নেই। আমরা ইতিহাস আলোচনা করি মানসিক অনুশীলন ও পরিশীলনের তাগিদেই। তাই ইতিহাসের প্রয়োগবাদী থিওরী বা pragmatic view অচল।

তথ্য-নির্দেশ

১। 'বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য ও যুগ-বিভাগ সমস্যা', থেকে উদ্ধৃত; বর্তমান সঙ্কলনের ২১ পৃঃ দ্রঃ।

২। ঐ, পৃঃ ৩৩।

৩। ইতিহাস, ষষ্ঠ বর্ষ (১৩৭৯), তৃতীয় সংখ্যা, পৃঃ ২২৬ এবং ২৪৩ পৃষ্ঠায় সুশোভন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৩৩তম অধিবেশনে প্রদত্ত অভিভাষণের সারাংশ।

৪। Henri Pirenne, *Economic and Social History of Medieval Europe*, Harvest Books, New york, p. v.

৫। G. M. Trevelyan, *English Social History*, London, 1962, pp. XI-XII, 1-55.

৬। Barrie M. Morrison, 'Social and Cultural History of Bengal: Approach And Methodology', *Nalini Kanta Bhattasal Commemoration Volume* (ed): A. B. M. Habibullah, Dacca 1966, p. 337.

৭। R. G. Collingwood, *The Idea of History*, London, 1963, pp. 282-302.

৮। ইউসুফ আলী খান, তারিখ-এ বাঙ্গালা মহাবত জঙ্গী; *Bengal Past Present*, LXXVII (1958), no. 143, p. 10 এবং rotograph.

৯। Francois Simiand, 'Causal Interpretation and Historical Research' প্রবন্ধের অনুবাদ; ইতিহাসের দর্শন (সঃ) মমতাজুর রহমান তরফদার, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ২০৪। ঘটনার কারণ নির্ণয় সম্বন্ধে E. H. Carr : 'What is History ?' pp. 87-108 পঠিতব্য।

১০। ম্যাক্স্ ওয়েবারের অনুসরণে G. C. Van Leur এবং B. Schrieke সমাজতত্ত্বের নিয়মকানুন অনুসরণ করেছেন, *Indonesian Trade and Society*; The Hugue, 1955. *Indonesian Sociological Studies*, pts. I and II. The Hague. 1955 and 1957. Meilink-Roelofsz আবার ঐতিহাসিক পদ্ধতির অনুসরণই সমীচীন মনে করেছেন, *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago Between 1500 and About 1600*. The Hague, 1962.

বাংলার ইতিহাসে সামন্তবাদ ও ধনতন্ত্রের বিকাশের সম্ভাবনা

কোনো ইতিহাস সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা আমার নেই। এই দুরূহ কাজটি করতে রাজি হলেও আমি একটি বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন: আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তির সংখ্যা আমাদের দেশে আদৌ কম নয় এবং আপনারা তাঁদের মধ্যে কাউকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত করলে ইতিহাসের পদ্ধতি ও সমস্যা সম্বন্ধে অনেক নতুন তত্ত্ব তাঁর কাছ্ থেকে শুনতে পারতেন। তবুও ইতিহাস পরিষদের কর্ম-সংসদের দেয়া এই সম্মান আমি মাথা পেতে গ্রহণ করছি।

আমরা যারা ইতিহাসের গবেষক বা ইতিহাস-অনুরাগী, তারা এক বিশেষ ধরনের মানসিক সংকীর্ণতায় ভুগছি বলে মনে হয়। যেমন খণ্ডিত আকারে আজকাল এ দেশের ইতিহাসকে আমরা দেখছি, তাতে মনে হয় যেন আমরা ইতিহাসের বৃহত্তর কোনো পরিপ্রেক্ষিতের সন্ধান রাখি না। যে কোনো আলোচনাসভা বা ইতিহাস-সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনের অভিভাষণ ও প্রবন্ধগুলো লক্ষ্য করলেই চোখে পড়বে একক প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ বা ব্যক্তিত্ব, বিচ্ছিন্ন যুগ বা সমস্যা অথবা অত্যন্ত শোকাবহভাবে সীমিত কোনো অঞ্চলের উপর কতকগুলো কথাবার্তা। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে যে বিশেষ কোনো গভীর ভাবাদর্শ, বৃহত্তর ভৌগোলিক সীমানা বা বিশালতর পটভূমির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত, এ কথা যেন আমাদের মনে কমই স্থান পায়। বিচ্ছিন্ন উপাদান মূল্যবান, যখন তা আমাদের হাতে আসে আবিষ্ক্রিয়ার ফসল হিসেবে। কিন্তু যখনই আমরা উক্ত উপাদানের ব্যাখ্যা দিতে যাই, তখন তা আর বিচ্ছিন্ন থাকে না, বরং অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের বলে তা কোনো সাধারণ concept বা category-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এই কথার তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুভূত হবে যদি আমরা সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন বা রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শের ইতিহাস আলোচনায় অগ্রসর হই। আমাদের দেশের সঙ্গে সম্পর্কিত দর্শন ও রাষ্ট্রিক চিন্তাধারার ইতিহাস প্রায় অলিখিত এবং বাংলা সাহিত্য ও শিল্পকলার উপরে লেখা যে বইগুলো হাতে আসে সেগুলির বর্ণনামূলক ঢং ও পূর্বোল্লিখিত পরিপ্রেক্ষিতের অভাব রীতিমত পীড়াদায়ক। এ জাতীয় বৈশিষ্ট্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক ইতিহাস-গ্রন্থে আরো

প্রকট ; বরং এ কথা বলা যায় যে, এসব ক্ষেত্রে যে সামান্য গবেষণাও হচ্ছে, তা primitive level-এর উপর কিছুতেই উঠতে পারছে না। এই অবনত মানের অন্যতম কারণ খুব সম্ভব পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের চিন্তাধারা থেকে আমাদের সংস্কৃতির ও সংস্কৃতিসেবীদের অন্ততঃ আপেক্ষিক বিচ্ছিন্নতা। নতুন নতুন ধারণার সংস্পর্শে ও সংঘাতে যখন কবি, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক আসেন, তখনই ত তাঁদের মানসিকতা সক্রিয় হয় এবং নতুন সৃষ্টি ও নতুন ব্যাখ্যা তখনই ত সম্ভব। বিদেশ থেকে যাঁরা পি-এইচ.ডি. নিয়ে আসেন, তাঁরাও এই বিচ্ছিন্নতার শিকার। তাঁরা যে school of thought-এর নিকট এবং যে সকল পণ্ডিতের নিকট ডিগ্রী-প্রার্থী, সেই school এবং সেই সকল ব্যক্তিত্বও ডিগ্রীলাভের গতানুগতিক পথেই তাঁদেরকে পরিচালিত করেন। আমাদের দেশে যদি উন্নত মানের একাধিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান থাকত, তাদের প্রাণকেন্দ্রে যদি পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা কাজ করত এবং তাদেরই কোনোটিতে যদি আবার এই বিরোধের সংশ্লেষণধর্মী মনোভাব সক্রিয় থাকত, তা হলে ঐ সীমিত ও বদ্ধ মানসিক orientation-এর প্রতিষেধক খুঁজে পাওয়া যেত। অন্যতম প্রতিষেধক হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষণার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি ও ভাবধারা অনুসৃত হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের দেশের গবেষণা-লব্ধ জ্ঞানের ক্রমাগত যোগাযোগ, ঘাত-প্রতিঘাত এবং কোনো সংশ্লেষণধর্মী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের জন্য মৌলিক গবেষণা-পদ্ধতি ও ভাবাদর্শ গড়ে তোলা।

এই মুহূর্তেই আমাদের জন্যে প্রয়োজনীয় কাজ হচ্ছে আর্থনীতিক ইতিহাসের উপর গুরুত্ব আরোপ এবং সেই অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির যোগসূত্র নির্দেশ। এগুলির মধ্যে যোগসূত্র যে আছে, তাতে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। উৎপাদন-ব্যবস্থা, উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে সমগ্র উৎপাদন কাঠামো ও অর্থনীতি। আর এই অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপরই সমাজ, সংস্কৃতি, ও রাজনীতির উদ্ভব, স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তন নির্ভর করে। এই সম্মেলনে বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি দিক নিয়ে আমি কিছু কথাবার্তা বলছি।

এ দেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগ এবং মৌর্য-শুঙ্গ যুগ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট। তবে মনে হয় যে, গুপ্ত রাজাদের সময়ে ধনতন্ত্র দানা বেঁধেছিল। তার প্রমাণ তাম্রলিপ্ত ও গঙ্গাবন্দরের মত বিখ্যাত সমুদ্র-বন্দর বা নদী-বন্দরের অস্তিত্ব এবং কিছু সংখ্যক তাম্রলিপিতে উল্লিখিত 'সার্থবাহ', 'নগরশ্রেষ্ঠী' ও 'কুলিক' শ্রেণীর সামাজিক গুরুত্ব। শব্দগুলি নাগর সভ্যতার দ্যোতক। এ কথাও অনেকটা স্পষ্ট যে, একটি বাণিজ্য-নির্ভর ধনতন্ত্র ও তার উপর নির্ভরশীল বণিক

banker ও কারিগর-শিল্পীদের একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। লিপিগুলি আরো প্রমাণ দিচ্ছে যে, বাণিজ্যের সঙ্গে তুলনায় সম্পদ হিসেবে ভূমির গুরুত্ব অনেকটা কম ছিল। এ অনুমানে বাধা নেই যে, বাণিজ্যলব্ধ উদ্বৃত্ত ধনের সৃষ্টি হয়েছিল; তার কারণ ধন উৎপাদনের ব্যবস্থার উপর বোধ হয় গঙ্গাবন্দর-তাম্রলিপ্ত এলাকার এবং নগর দুটির পশ্চাৎভূমির লোকদের নিয়ন্ত্রণ-অধিকার ছিল। যদি এই কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে উত্তর ভারতীয় বা বিদেশী বণিকদের হাতে থাকত, তবে মুনাফার সবটুকু অংশ দেশের বাইরে চলে যেত এবং উদ্বৃত্ত ধনের উপর নির্ভর করে কোনো বাণিজ্যপুষ্ট লোকগোষ্ঠী জন্ম নিত না। মৌলিক মালমশলার অভাবে এ যুগের উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দেয়া মুশকিল। তবে শ্রেণী-সম্পর্ক সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় যে, নাগর শ্রেণীগুলির ভিতর সহযোগিতা ছাড়া ধন উৎপাদন সম্ভব হত না। নগর-বন্দরগুলির পশ্চাৎভূমিতে শিল্পী-কারিগরদের কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান সক্রিয় ছিল এবং তাদের সঙ্গে ছিল ব্যবসায়িক শ্রেণীর যোগাযোগ। ব্যবসায়ী, শিল্পী ও ব্যাংকারদের প্রতিষ্ঠানগত সম্পর্ক সম্বন্ধে উপাদানের অনুপস্থিতির দরুন কিছুই বলা যাবে না। আরো দেখা যাচ্ছে যে, জমিজমার ভোগ দখলের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীর অসংখ্য স্তরের সৃষ্টি হয়নি। এই পরিস্থিতিও বোধ হয় ছিল বাণিজ্য-নির্ভর অর্থনীতিরই পরিপূরক। দূরবর্তী অঞ্চলসমূহের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে কৃষি ব্যবস্থায়, বিশেষ করে উৎপাদনে এবং কৃষি-নির্ভর লোকগোষ্ঠীর শ্রেণী-সম্পর্কেও কিছু পরিবর্তন এসেছিল বলে মনে হয়। তবে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতিই প্রমাণ দিচ্ছে যে, বাণিজ্যই ছিল এ যুগের ধনের প্রধান উৎস। কৃষিভিত্তিক সামন্ত জীবনে যে বিলাস ও আড়ম্বর দেখা যায়, এ যুগের ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে এবং তাম্রলিপির ভাষায় তা অনেকটা অনুপস্থিত। Eastern Indian School of Art তখনো যথার্থভাবে গড়ে ওঠেনি; এ যুগের আর্টের চেহারা ও প্রকৃতি বাণিজ্যিক যোগাযোগের দরুন অনেকটা সর্ব-ভারতীয় এবং আঞ্চলিকতার প্রভাব থেকে অনেকটা মুক্ত।

পন্ডিতেরা মনে করেন যে, এই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির মূলে ছিল রোমান বণিকদের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র। রোমান বাণিজ্য-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার ফলেই ভারতের এবং তাম্রলিপ্তি গঙ্গাবন্দরের সঙ্গে সম্পর্কিত অঞ্চলের বাণিজ্যও লোপ পায়। নগর-কেন্দ্র, বণিক-কারিগর শ্রেণী, শিল্প উৎপাদন ও মুদ্রা-ভিত্তিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যে চূড়ান্ত বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল, তার প্রমাণ পাল-সেন-চন্দ্র-বর্মণ রাজাদের শিলালিপিতে পূর্বোক্ত 'সার্থবাহ', 'নগরশ্রেষ্ঠী' ও 'কুলিক' শ্রেণীর সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি, গঙ্গাবন্দর-তাম্রলিপ্তির অর্থনৈতিক গুরুত্বের বিলোপ এবং পাল

ও সেন রাজাদের আমলে তৈরী মুদ্রার চূড়ান্ত দুষ্প্রাপ্যতা। রাঢ়, গৌড় ও বরেন্দ্র অঞ্চলেই বোধ হয় এই পরিস্থিতি প্রকটভাবে দেখা দিয়েছিল। ময়নামতী-লালমাই-কেন্দ্রিক দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ব্যতিক্রমধর্মী আর্থনীতিক ও সামাজিক অবস্থার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ে খননের ফলে বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা অনেকগুলি নগর-কেন্দ্রের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাছাড়া মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল বৈদেশিক বাণিজ্যও যে এই অঞ্চলে কয়েক শত বছর ধরে চলে আসছিল, তার প্রমাণ এই অঞ্চলেই সাম্প্রতিক কালে গুপ্ত মুদ্রা, **imitation** গুপ্তমুদ্রা, বৃষ ও ত্রিশূলের প্রতীকযুক্ত মুদ্রা ও আব্বাসীয় দিনার ও দিরহামের আবিষ্কার। পট্টিকেরা, দেবপর্বত, ও চট্টগ্রামের রামুর নিকটবর্তী কোনো বন্দরই ছিল বোধ হয় গুপ্ত আমল থেকে শুরু করে মুসলিম আগমন পর্যন্ত এ অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। ভূমিসম্পদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিও এ অঞ্চলের লোকজনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রাঢ়-গৌড়-বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেকটা আলাদা। বৌদ্ধ ধর্ম ও বাণিজ্যের মাধ্যমে এ অঞ্চল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমাজ ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঙ্গে নিবিড় সূত্রে গ্রথিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

রাঢ়-গৌড়-বরেন্দ্রে খুব সম্ভব কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতি দানা বাঁধে। গড়ে ওঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ইউনিট যা দূরবর্তী অঞ্চলগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য হারিয়ে বাইরের জগৎ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বৈদেশিক বাণিজ্য চালু থাকলেও হয়ত তার গুরুত্ব ছিল এই সময়ে নিতান্তই সীমিত এবং ধন উৎপাদনের প্রধানতম উৎস ছিল তখন কৃষি। শিলালিপি ও সমকালীন সাহিত্য প্রমাণ দিচ্ছে যে, মহারাজাধিরাজের নীচে মহাসামন্ত-মহামান্ডলিক, সামন্তমান্ডলিক, মহামহত্তর ও মহত্তর প্রভৃতি সামন্তের একটি স্তরবিন্যাস কৃষক ও কারিগর শিল্পীকে স্পর্শ করেছিল। এই সামন্ত-ব্যবস্থায় ইয়োরোপীয় ফিউড্যাল ব্যবস্থার **sub-infeudation** কতটা প্রকট ছিল সঠিকভাবে তা বলা মুশকিল। আইনশাস্ত্রে যেমন ইয়োরোপীয় প্রথাটি স্বীকৃতি লাভ করেছিল, আলোচ্য আমলের পালসেন রাজাদের ভূমি-ব্যবস্থাটি তেমনি আইনসম্মতভাবে চলে আসছিল কি না তা আজও জানা যায়নি। তবু এই ব্যবস্থাকে সামন্ততন্ত্র না বলে উপায় নেই। এখানেও দেখছি ভূমির উপর সমগ্র শ্রেণীবিন্যাসের চূড়ান্ত নির্ভরশীলতা এবং ধন উৎপাদনের পন্থা হিসেবে কৃষির ব্যাপক গুরুত্ব। প্রায় অধিকাংশ শিলালিপিতে 'পীড়ম' বা বাধ্যতামূলক শ্রমের উল্লেখও এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য। উৎপাদন-ব্যবস্থায়, উৎপাদন-সম্পর্কে ও উৎপাদন-কাঠামোতে গুপ্ত যুগের তুলনায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল। আর

এই পরিবর্তনই সমকালীন রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির উপর ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছিল। নগর-বন্দরগুলি ক্ষয়িষ্ণু হওয়ায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ভাটা পড়ায় যেমন কৃষক-শ্রেণী কৃষিতে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিল তেমনি শিল্পী-কারিগর শ্রেণীও সামাজিক গতিশীলতা হারিয়ে সামন্ত-প্রভুদের চাহিদা পূরণে এবং সীমিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ আর্থনীতিক ইউনিটের আঞ্চলিক বা স্থানীয় চাহিদা মিটাতে বাধ্য হয়েছিল। উৎপাদন-কাঠামো এবং উৎপাদন-সম্পর্কের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দরুন কৃষকগণ ইয়োরোপীয় সার্ফের মতই ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিল বলে মনে হয়। এই কারণে বাধ্যতামূলক শ্রম ছিল সহজলভ্য। কাজেই উৎপাদনের উপর কৃষকদের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকার কথা নয়। কৃষিব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে এ ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ধনতন্ত্র গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। উদ্বৃত্ত ধন বিভিন্ন শ্রেণীর সামন্ত ও মহারাজাধিরাজের বিলাসময় জীবন-ব্যবস্থা ও যুদ্ধলিপ্সার চাহিদা মিটিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল। ইতিপূর্বে সমতট অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেছি। মনে হয়, এই বাণিজ্যের মুনাফার প্রায় সবটাই আরব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বণিকদের কাছে হস্তান্তরিত হচ্ছিল। নইলে দেব-চন্দ্র-বর্মণ রাজাদের শিলালিপিতে বাণিজ্যনির্ভর কোনো লোকগোষ্ঠীর পরিচয় কেন পাওয়া যাচ্ছে না ? সমতটের ভূমি-ব্যবস্থা বোধ হয় এ অঞ্চলের বাণিজ্যের গুরুত্বেরই প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছে। ভূমি দানের দলিলগুলিতে দান করা জমির মাপ ও রাজস্ব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উল্লেখিত হয়নি, যেমনটি হয়েছে রাঢ়-বরেন্দ্র প্রভৃতি এলাকার তাম্রলিপিগুলিতে। অন্যান্য এলাকার দান করা জমির গ্রহীতারা ব্যক্তি হিসেবে জমি পেতেন। সমতটে জমি দেয়া হয়েছে ব্রাহ্মণ-ভিক্ষুর দলকে অথবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে। এ দুটি কারণে মনে হয়, এ অঞ্চলে জমির চাহিদা রাঢ়-বরেন্দ্র-গৌড়ের তুলনায় কম ছিল। বোধ হয় বহু লোক কৃষিকার্য বাদ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকেই ঝুঁকে পড়েছিল। তবুও মনে হয়, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে এ অঞ্চলে ধনতন্ত্র গড়ে ওঠেনি এবং বাণিজ্যনির্ভর বণিকশ্রেণীর অস্তিত্বেও স্থিতিশীলতা আসেনি। পূর্বেই বলেছি, মুনাফা বাইরে চলে যাচ্ছিল এবং পণ্যদ্রব্য, বিশেষ করে সূতীবস্ত্র তৈরীর ও তার জন্য বাজার সৃষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই অঞ্চল করমণ্ডল উপকূল ও জাভার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেও পারছিল না। তবু মনে হয়, **balance of trade** এ অঞ্চলের অনুকূলে ছিল বহুদিন ধরে। পণ্যের বিনিময়ে সোনা-রূপা বিদেশ থেকে পেয়ে রাজারা মুদ্রা তৈরী করছিলেন। কিন্তু ধনতন্ত্রের সৃষ্টি না হওয়ায় সমাজ কৃষিভিত্তিক রয়ে গেল। সমতটের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আরো কয়েকটি কথা বলা দরকার। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আওতায় এখানে

ব্যবসা-বাণিজ্যও চলছিল। ময়নামতী ও চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান দেখে মনে হয় যে, প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলি ও তীর্থস্থানগুলির অবস্থান ছিল বাণিজ্যপথের উপরে। এগুলির আশে পাশে বা পশ্চাৎভূমিতে ছিল বোধ হয় শিল্পী-কারিগরপুষ্ট শিল্পকেন্দ্রের অস্তিত্ব। এই সব কারণেই উক্ত কেন্দ্রগুলি বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণতি পেয়েছিল। অথচ ভূমিদানের দলিলগুলি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সমাজ ছিল প্রধানতঃ সামন্ততান্ত্রিক যদিও মধ্যস্বত্বভোগীদের স্তরবিন্যাসে রাঢ়-গৌড়-বরেন্দ্র এলাকার তুলনায় শ্রেণীর সংখ্যা এ অঞ্চলে অনেকটা কম ছিল। থিওরির দিক দিয়ে বলা যায়, সামন্ততন্ত্র ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সহ-অবস্থান অঞ্চল বিশেষে বিশেষ কতকগুলি কারণে সম্ভব।

সামন্ত-ব্যবস্থার কাঠামোর উপরই আলোচ্য যুগের রাজতন্ত্র স্থাপিত। ধর্ম ও সংস্কৃতিও এই ব্যবস্থারই অনুষঙ্গ হিসেবে গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয়। দেবদেবীর স্তরবিন্যাসে সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীবিন্যাসেরই প্রতিফলন। আবার পুরোহিততন্ত্র বোধ হয় তখন অন্যতম মধ্যস্বত্বভোগী—অন্ততঃ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ত তাই লক্ষ্য করা গেছে। শিলালিপি ও সাহিত্যের আড়ম্বরপূর্ণ উপমা-উৎপ্রেক্ষায় ও যৌন আবেদনে, ভাস্কর্যে দেবদেবীর শারীরিক গঠনের ইন্দ্রিয়পরায়ণ আবহে, তান্ত্রিক দেবীদের পূজার্চনার সঙ্গে সম্পর্কিত দর্শনে এবং 'রেখা' শ্রেণীর মন্দিরের বিলাসময় সাংগঠনিক সমৃদ্ধিতে ভোগপরায়ণ সামন্ত জীবনেরই পরিচয় পূর্ণতা পেয়েছে। কোনো কোনো অঞ্চলে ব্যবসাবাণিজ্য অব্যাহত থাকলেও এ ধরনের ব্যয়বাহুল্যের ফলে এবং বাণিজ্যলব্ধ মুনাফা বিদেশী বণিকদের হাতে চলে যাওয়ায় ধনতন্ত্রের উদ্ভব সম্ভব ছিল না।

যে যুগের কথা বলছি, সে যুগে কোনো সর্ববঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় চেতনা অথবা সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শ গড়ে ওঠেনি। রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল ছিল পরস্পর থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন কতকগুলি ভৌগোলিক ইউনিট যার কতকগুলির উপর বিভিন্ন সময়ে কোনো কোনো রাজশক্তি প্রাধান্য পাচ্ছিল। এই বিচ্ছিন্নতার দরুন ভাব আদান-প্রদানের জন্য কোনো সাধারণ মাধ্যমের সৃষ্টি হয়নি বলে আজকের দিনের বাংলা ভাষাভাষী লোকজনের মত কোনো একক লোকগোষ্ঠীরও সৃষ্টি হয়নি। প্রাক্-মুসলিম যুগের ইতিহাস আলোচনায় তাই আঞ্চলিক সীমানার নির্দেশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। উপরে উল্লেখিত অঞ্চলগুলির সব কয়টি একই ধরনের উৎপাদন-কাঠামো এবং একই সাংস্কৃতিক পরিবেশের আওতায় পড়েছিল, এ কথা কখনো বলা যাবে না। মুসলিম আমলে ঐ অঞ্চলগুলি একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে এল এবং খুব সম্ভব চৌদ্দ শতকের প্রথম

দিকে ভাব বিনিময়ের জন্যে একটি সাধারণ সাহিত্যিক ভাষাও জন্ম নিল। উৎপাদন-ব্যবস্থায় এই সময়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। এই পরিবর্তন সবগুলি অঞ্চলে সমানভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছিল কিনা, তা ভেবে দেখা দরকার। সংস্কৃতিতে ত বর্তমান কালেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। কাজেই সর্ব-বঙ্গীয় ভিত্তিতে মুসলিম আমলের ইতিহাস লিখতে গিয়েও সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার বৈশিষ্ট্যও মনে রাখা দরকার।

এর পর যে সমস্যাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা **periodisation** বা কাল-বিভাজনের সঙ্গে সম্পর্কিত। পাল রাজত্বের সময়ে যদি সামন্ততন্ত্র শুরু হয়ে থাকে, তবে এই আমলকেই মধ্যযুগের সূচনা-পর্ব রূপে চিহ্নিত করতে হয়। এই আমল থেকে শুরু করে মুসলিম রাজত্বের সূত্রপাত পর্যন্ত সামন্ততন্ত্রের প্রাণশক্তির একমাত্র উৎসই ছিল কৃষি-ভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। হয়ত বা এই নিয়মের উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছিল সমতটে যেখানে কৃষির সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যও যুক্ত হয়েছিল। মুসলমান আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধির ফলে সামন্ততন্ত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে; কিন্তু বাণিজ্য বা শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত উৎপাদন-ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে কোনো ধনতন্ত্রের উদ্ভব হয়নি বলেই এবং উৎপাদন-কাঠামো অনেকটা কৃষি-ভিত্তিক রইল বলেই এই যুগকে মধ্যযুগের পর্যায়ে ফেলতে পারা যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে এক বিশেষ ধরনের সামন্ত-প্রথা বিদেশী **mercantile** ধনতন্ত্রের পরিপূরক হিসেবে গড়ে উঠলো। উৎপাদন-সম্পর্ক ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের এ জাতীয় পরিবর্তনকে বোধ হয় একটি নতুন যুগের নির্দেশক বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

এবার আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি-ভিত্তিক সামাজিক সম্পর্কের প্রসঙ্গে আবার ফিরে যেতে পারি। আলেকজান্দ্রিয়া-কুশ-এডেন-কাম্বে থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালাক্কা পর্যন্ত প্রসারিত বাণিজ্য পথটি যখন চৌদ্দ-পনের শতকে বিশেষ কতকগুলি কারণে গুরুত্ব পেল, তখন মালাবার উপকূল, করমন্ডল উপকূল ও বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। বাংলার ইতিহাসে তের শতককে এই বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের প্রস্তুতি-পর্ব রূপে আখ্যাত করা যায়। মুসলিম বাংলায় **money economy** বা মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির সূচনা ঠিক এই সময়েই। তারপর চৌদ্দ শতকে যখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে এ দেশের যোগসূত্র স্থাপিত হল, তখন থেকেই সোনা ও রূপার টাকা এবং পরে সীমিতভাবে তামার টাকাও লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগল। এই মুদ্রা-ব্যবস্থার সঙ্গে আরো পরিলক্ষিত হচ্ছে বেশ কয়েকটি

সমুদ্র-বন্দর ও নগরের উদ্ভব, শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং একটি বণিক শ্রেণীর সৃষ্টি। পনের-ষোল শতকে বাংলার সূতিবস্ত্র, চিনি, চাল প্রভৃতি পণ্য একদিকে বার্মা-পেগু, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীন-জাপান এবং অন্যদিকে সিংহল, মালদ্বীপ, মালাবার উপকূল, এডেন এবং হয়ত বা ইয়োরোপ ও আফ্রিকায় পোঁছে যেত। মালাক্কায় ও উত্তর সুমাত্রার অন্তর্গত পেদিরে বাঙ্গালী বণিকদের কলোনী ছিল। আরো জানা যাচ্ছে যে, চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পেদিরে ও মালদ্বীপে মুসলিম রাজ্য স্থাপিত হয় বাঙ্গালীদের দ্বারাই।

এই বাণিজ্যের ফলে দেশে যে সমৃদ্ধির সৃষ্টি হয়, বোধ হয়, তারও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বার্বোসা কর্তৃক উল্লিখিত, বাংলার আয়েশী, ধনী সম্প্রদায়ের বিলাসময় জীবন ব্যবস্থায়, গৌড়-পাণ্ডুয়ার শ্রী ও ঐশ্বর্যে এবং চীনা পর্যটকদের লেখায় চিত্রিত আড়ম্বরপূর্ণ রাজসভার জাঁকজমকে। সাময়িকভাবে হলেও বাণিজ্যলব্ধ ধন যে এ দেশে এসেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। সমগ্র মুসলিম আমল ধরে বিদেশ থেকে সোনা-রূপার সরবরাহ ও নগর-বন্দরের একটানা অস্তিত্ব বোধ হয় সমৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। মোগল আমলে বাংলার বাণিজ্যিক গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল বলে মনে হয় না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাণিজ্যের ফলে শ্রেণীবিন্যাসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছিল কি না। জমিজমার উপরে মানুষের নির্ভরশীলতা কমে যাওয়ার কথা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় বাংলার সমাজে গতিশীলতা আসার কথা। ভূমি-ব্যবস্থা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এ যুগেও শাসকের সঙ্গে কৃষকদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। বখতিয়ার খিলজী তাঁর সহচর সেনাপতিদের মধ্যে বিভিন্ন এলাকা 'ইক্‌তা' বা 'জাগীর' হিসেবে ভাগ করে দিয়েছিলেন। মোগল যুগের বাংলা ও ফারসী সাহিত্য ও দলিলদস্তাবেজে 'চৌধুরী', 'অধিকারী', 'জমিদার', 'তালুকদার' ও 'মজমুয়াদার' শ্রেণীরও উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এরা সবাই রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল চুক্তির ভিত্তিতে রাজস্ব-আদায়কারী এবং অন্যেরা বোধ হয় ছিল অনেকটা স্থায়ী ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী। পাল-সেন আমলের তুলনায় যদি sub-infeudation এক্ষেত্রে হ্রাস পেয়ে থাকে তা হলে বলা যায় যে, সামন্ততন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং এই দুর্বলতার কারণ বোধ হয় বৈদেশিক বাণিজ্য। কিন্তু বাণিজ্য-নির্ভর কোনো শক্তিশালী লোকগোষ্ঠীর সন্ধান কেন পাওয়া যাচ্ছে না? মালাক্কা ও পেদিরে যারা কলোনী গড়ে তুলেছিল, আরব, গুজরাটি বা করমন্ডল অঞ্চলের বণিক শ্রেণীর তুলনায় তাঁদের শক্তিশালী বলে মনে হয় না। টোম পিরেস জানাচ্ছেন যে, তাদের বাণিজ্যিক ন্যায়নীতি ছিল অত্যন্ত নিম্ন মানের; অথচ

অন্যান্য দেশের বণিকদের ন্যায়নীতি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার শক্তি সম্বন্ধে প্রশংসা-সূচক মন্তব্যই উক্ত লেখকের রচনায় পাওয়া যাচ্ছে। সেইজন্য মনে হয়, প্রাক-মোগল যুগে যদি কোনো বণিক শ্রেণীর স্থষ্টি হয়েও থাকে, তারা ছিল মূলত: আরব ও গুজরাটি বণিকদের দালাল বা বাণিজ্যিক সহায়ক। মনে হচ্ছে, জাহাজ নির্মাণ, নৌ-চালনা, মূলধন নিয়োগ ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপর কর্তৃত্ব ছিল বিদেশী বণিকদের হাতেই। এ ক্ষেত্রে মুনাফার বেশীর ভাগ যে বাইরেই চলে যাবে এবং উদ্বৃত্ত ধনের স্থষ্টি না হওয়ার ফলে ধনতন্ত্র যে জন্ম নেবে না, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এ ব্যাপারে মালাবার ও করমন্ডল উপকূলে ভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল বলে সে অঞ্চল দুটিতে মধ্যবিত্ত বণিক-শ্রেণী জন্ম নিয়েছিল। বাংলার স্থলতান, জমিদার, জাগীরদার প্রভৃতি শ্রেণীর ব্যয়বহুল, বিলাসময় জীবনযাত্রা ও সমকালীন যুদ্ধবিগ্রহের খরচ কৃষিকেন্দ্রিক ধনতন্ত্র স্থষ্টির পথও বন্ধ করে দিয়েছিল বলে মনে হয়। মধ্যযুগের শেষদিকে বিদেশী কোম্পানীর এজেন্ট হিসেবে যে বেনিয়ান, গোমস্তা বা দালাল শ্রেণীর উদ্ভব হয় ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, শিল্প-সংগঠন ও পুঁজি নিয়োগের দায়িত্ব তাদের হাতে ছিল না, বরং চলে গিয়েছিল বিদেশী কোম্পানীগুলির অধিকারে। জগৎশেঠ পরিবার ব্যাঙ্কার হিসেবে টাকা-পয়সার লেনদেন করত। এরা বোধ হয় লাভের অংশ তাদের দেশে পাঠিয়ে দিত। এ অবস্থায় বাণিজ্য বা শিল্পকে কেন্দ্র করে উদ্বৃত্ত ধনের স্থষ্টি ও মধ্যবিত্তের উদ্ভব বোধ হয় সম্ভব ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উৎপাদনে যেমন আশা করা হয়েছিল, তেমনিভাবে কোনো কৃষিভিত্তিক ধনতন্ত্রের স্থষ্টি না হয়ে পুরনো সামন্ততন্ত্র নতুন চেহারা নিয়ে ফিরে এল।

মধ্যযুগের ধর্ম, সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা, জীবনবোধ ও ভাবাদর্শে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ছাপ সুস্পষ্ট এবং মূল্যবোধেও সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতা প্রকট। নাগরিক চেতনা জীবনের সর্বত্র প্রায় অনুপস্থিত। ব্যবসা-বাণিজ্য ও নাগরিক জীবনের প্রভাব বাঙ্গালী জীবনে খুবই কম পড়েছে। তার কারণ সমাজের মর্মমূলে অধিকাংশ সময় কাজ করেছে কৃষি-জীবনের আঞ্চলিক চেতনা। উৎপাদন ব্যবস্থায় দীর্ঘকালের ব্যবধানেও সত্যিকার পরিবর্তন দেখা দেয়নি এবং সমাজ ও সংস্কৃতি তাই অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়া হচ্ছে সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে সমাজ-জীবনের রূপান্তর। এই প্রক্রিয়াটি বাঙ্গালীদের জীবনে শত শত বৎসরেও কার্যকর হয়নি।

আমরা এখানে আর্থনীতিক স্থবিরতার একটি বিশেষ দিক লক্ষ্য করলাম। বাংলার আর্থনীতিক ইতিহাসের অন্যান্য দিক সম্বন্ধে আলোচনা করলে রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশের উপর নতুনভাবে আলোকপাত হবে বলে আশা করা যায়। তাতে করে গতানুগতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের আলোচনার ধারায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে।

ইতিহাস লেখার সমস্যা

এক

সম্প্রতি আমাদের দেশে সামাজিক ইতিহাস রচনার জন্য যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে এই আগ্রহ রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতার পরিচায়ক। সামাজিক ইতিহাসের সমস্যা সম্বন্ধে এবং এই জাতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গবেষককে যে সকল মৌলিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, তাদের সম্বন্ধে, আমাদের চেতনা কতটা প্রখর, সে কথা বুঝতে পারা যায় না ; কেননা আমাদের দেশের পন্ডিতগণ আজ পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেননি। প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও বর্তমান যুগ—কাল-বিভাজনের এই কাঠামো ইয়োরোপের ইতিহাস থেকে ধার করা। এই কাল-বিভাগ ইয়োরোপের ইতিহাসে বিশেষ অর্থ বহন করে এবং এই ধরনের কাল-বিভাগ ইয়োরোপীয় অর্থে এ দেশের ইতিহাসের প্রতি আদৌ প্রযোজ্য কি না, সে সম্বন্ধে এ দেশের কোন পন্ডিতের লেখা সচরাচর চোখে পড়ে না। এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আলোচনা পাওয়া যায় ম্যাক্স ওয়েবার ও ভ্যান লিউর কর্তৃক লিখিত গ্রন্থাবলীতে। কিন্তু এই লেখাগুলোয় অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপিত বলে কাল-বিভাজনের ধারণাও উক্ত গুরুত্বের প্রভাবে বিশেষভাবে ভারাক্রান্ত। এইজন্য ঐ কাল-বিভাজনের রূপরেখা সীমিত-শক্তি ঐতিহাসিকের কাছে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। কাল-বিভাগের সমস্যা ছাড়া আরো কতকগুলো বাস্তব সমস্যা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। এদের মধ্যে একটি হচ্ছে মাল-মশলার দুষ্প্রাপ্যতা এবং অপরটি, একটি বিশেষ ধারণার প্রতি আমাদের আত্যন্তিক মোহ—আমরা অতি সহজেই বিশ্বাস করি যে এই উপমহাদেশে শত শত বৎসরেও বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

রোমের পতন, সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও তার ফলে ইয়োরোপীয় সমাজ জীবনের মৌলিক পরিবর্তন, কন্‌স্ট্যানটিনোপলের পতন, রিনেসাঁস, শিল্প-বিপ্লব—এই ধরনের কোনো ঘটনা পাক-ভারত উপমহাদেশে সংঘটিত হয়নি বলে পূর্বোক্ত কাল-বিভাগে এ দেশের ইতিহাসকে চিহ্নিত করতে যাওয়া বিপজ্জনক। তবু কিন্তু ঐতিহাসিককে অনন্ত কালের বুকে কোথাও না কোথাও নির্দিষ্ট ছেদ টানতে হয়

এবং স্পষ্টভাবে একটি সীমারেখা অঙ্কিত করতে হয়। এই সীমারেখা অনেক ক্ষেত্রে সুবিধার খাতিরে অঙ্কিত এবং এটি কোনো দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মত শক্তিশালী নয়। এর এপারে ওপারে যে সমাজ, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি বর্তমান, তাদের মধ্যে একটু আধটু সাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, এই ছেদ-বিন্দু বা সীমারেখার অবলম্বন কি? অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতির প্রতি আরোপিত গুরুত্বের তারতম্য অনুযায়ী এই প্রশ্নের বিভিন্ন রকমের উত্তর হতে পারে।

তথাকথিত প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের দেশে অল্পবিস্তর আলোচনা হয়েছে। বর্তমান লেখক নিজেও তথাকথিত মধ্যযুগের সীমাবদ্ধ ও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ কোনো একটি এলাকায় বিচরণ করে থাকেন। কাজেই এই মধ্যযুগ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বিষয়টি নিয়ে কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই মনে করি। প্রাক-মুসলিম আমলে সমাজ জীবনে ধর্মের প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রবল এবং মুসলিম শাসনকালেও ধর্ম তার নিজস্ব পথে অগ্রসর হয়েছে। তবু একটি বৈশিষ্ট্য এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং ধর্মের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য এক্ষেত্রে সীমা-নির্দেশের কাজ করছে বলে মনে হয়। সুদীর্ঘ কাল ধরে সাহিত্য ও শিল্পের বিভিন্ন শাখা ধর্মের ছোপ গায়ে লাগিয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে এবং ধর্মও আবার মানুষের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ছোঁয়া পেয়ে যুগে যুগে জটিল আকার ধারণ করেছে। হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মকে বাদ দিয়ে কি কখনো ইলোরার ভাস্কর্য ও অজন্তার চিত্রকলার কথা কল্পনা করতে পারা যায়? হিন্দু পুরাণের আবহ থেকে যদি কালিদাসের কাব্যিক পরিমন্ডলকে দূরে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করা যায়, তবে সেই চেষ্টা কি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে না? এ কথা ঠিক যে ধর্মীয় প্রবণতার সঙ্গে ঐ যুগের ঐহিক ও যথার্থ মানবীয় মানসিকতা মিশ্রিত হয়ে গেছে। উর্বশী-পুরুরবার প্রেম-কাহিনীর মনস্তত্ত্ব হয়ত বা মানবীয়। কিন্তু এখানে প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে এক জনের প্রতি স্বর্গীয় সত্তা আরোপিত না করে কাহিনীটি লিখতে পারা যায়নি। 'মেঘদূতে'র বিরহী যক্ষ ও যক্ষপত্নীর স্থানে কালিদাস যদি মানব-মানবীকে প্রতিস্থাপিত করতেন, তা হলে যথেষ্ট শিল্পগুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কাব্যটি সমকালীন পাঠক-সমাজে সমাদর পেত কিনা এবং যুগের চাহিদাকে অগ্রাহ্য করে কবি ঐ ধরনের দুঃসাহসিকতার কাজে আদৌ অগ্রসর হতে পারতেন কি না, এগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমাদের মনে হয়, কালিদাসের কাব্য জগৎ থেকে ধর্মীয় পরিবেশকে বাদ দিলে সেখানে কালিদাসের কালের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। ধর্মীয় আবহের উপস্থিতি ছাড়া

সেকালের শিল্প বা সাহিত্য আদৌ পুষ্টিলাভ করতে পারে না, যদিও সেখানে মনোজগতের সমগ্র বাতাবরণ একান্তভাবে মানবীয়। কবি দেবতা নন, যক্ষ নন, তিনি মানুষ ও মানবীয় জগতের বাসিন্দা। তাই তিনি দেব-দেবী, যক্ষ প্রভৃতির প্রতি যে মানবিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের আরোপ করেছেন, তা নিতান্ত মানবীয়; কিন্তু তিনি মানুষকে নিয়ে খুব কমই নাড়াচাড়া করেছেন। শিল্পী যখন তাঁর শিল্পকর্মের বিষয়বস্তুর মধ্যে মানুষকে এনে ফেলেছেন, তখন তাকে কিন্তু কোনো না কোনো ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত করেই দেখা হয়েছে। যে যুগের মানুষের দৃষ্টিতে ধর্মের এতটা গুরুত্ব এবং মানুষেরই গুরুত্ব এতটা কম, সেই যুগকে যদি প্রাচীন কাল রূপে চিহ্নিত করা যায়, তা হলে কি খুব অন্যায় হবে?

মুসলমানদের আগমনের পরে এই উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে কতকগুলো বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে দেখা দিল। নতুন লোকগোষ্ঠীর আবির্ভাবের সঙ্গে এই পরিবর্তনের কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে করা যেতে পারে। সাহিত্য ও শিল্পকলায় ধর্মীয়ভাব-বর্জিত ঐহিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা পেল এবং মানুষের সৃষ্ট সাংস্কৃতিক জগতে মানুষই মুখ্য হয়ে দাঁড়াল। কালিদাস ও তাঁর অনুকরণে বহু হিন্দু কবি 'দূত কাব্য' রচনা করেছিলেন। মুসলমান কবি আবদুর রহমান 'সংনেহয় রাসয়' নামক একটি 'দূত কাব্য' লিখেছেন ঐ একই ঐতিহ্যের অনুসরণে। এই কাব্যে কালিদাসের যক্ষ ও যক্ষ-পত্নীর স্থান দখল করেছে মানব ও মানবী এবং 'মেঘদূতে'র কুয়াসাচ্ছন্ন অলকাপুরীর স্থানে আমরা পাচ্ছি খম্ভাইত্ত নামক একটি স্থান যার অবস্থিতি এই মাটির পৃথিবীতে। বিরহিণী তার দয়িতের কাছে যে বাণী পাঠিয়ে দিচ্ছে, তা আবেগের উষ্ণতায় সম্পূর্ণভাবে মানবীয়, তা কিন্তু বিরহী যক্ষের হিসেবী মনের উত্তাপ-বিহীন মন্ত্রোচ্চারণ মাত্র নয়। আমরা বুঝতে পারি যে কালিদাসের জগৎ থেকে আমরা একটি স্বতন্ত্র জগতে চলে এসেছি। আসলে 'মেঘদূত' ও 'সংনেহয় রাসয়' কাব্যের মাঝে রয়েছে দুটি যুগের ব্যবধান। মুসলমানদের শাসনকালে ভারতের ফারসী কাব্যে ও আঞ্চলিক ভাষায় লিপিবদ্ধ কাব্যে মানবীয় অনুভূতি, মানবীয় প্রেম ও কামনা-বাসনার অভিব্যক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কোন রূপক কাব্যে যখন বিশেষ কোন ধর্মীয় ভাবকে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল, তখন এই ভাবকে পরিস্ফুট করে তোলা হল মানবীয় পরিবেশের মধ্যে দিয়ে ও মানবীয় আচার-আচরণের মাধ্যমে। প্রাক-মুসলিম যুগের কোন ভারতীয় ইতিহাস সাহিত্য আজও আবিষ্কৃত হয়নি। প্রাচীন সাহিত্যে প্রাপ্ত, 'ইতিবৃত্ত', 'ইতিহাস' প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের উপর জোর দিয়ে আধুনিক কালের কোনো কোনো পন্ডিত মনে করেছেন যে, ইতিহাস রচনার প্রথা

এ দেশে অজানা ছিল না। লিখিত ইতিহাসের কোন নমুনা হাতের কাছে না পেলে এই ধরনের থিওরীকে বিনা আপত্তিতে কখনো গ্রহণ করা যাবে না। খুব সম্ভব, সে যুগের পন্ডিতগণ পুরাণগুলোকেই যথার্থ ইতিহাস বলে মনে করেছিলেন। পুরাণ সাহিত্যে কিংবদন্তিমূলক রাজ-রাজড়ার কাহিনী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাহিনীগুলো সন-তারিখ-বিহীন কোনো এক অনন্ত অতীতের মাঝে স্থাপিত এবং তাদের সমগ্র আবহ ধর্মীয় ভাবধারায় সম্পৃক্ত। মানুষের ঐহিক কার্যাবলীর ফিরিস্তিকে অবলম্বন করে ইতিহাস-সাহিত্য গড়ে উঠে। প্রাক-মুসলিম যুগের ভারতীয় মানসের কাছে এই ফিরিস্তির কোনো আবেদন ছিল বলে মনে হয় না। মুসলমানদের হাতে যে ইতিহাস-সাহিত্য গড়ে উঠল, তার পরিমাণ বিপুল ও বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। এক্ষেত্রেও বোধ হয় দুটি যুগের বৈশিষ্ট্য ও দুটি মানসিকতার বিভিন্নতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। মুসলিম আমলের স্থাপত্য ও চিত্রকলাতেও ধর্মীয় প্রভাব খুবই কম এবং ঐহিক মানসিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। মুসলিম স্থাপত্যের একটি অংশকে আমরা ধর্মীয় স্থাপত্য রূপে অভিহিত করে থাকি শুধুমাত্র তার ব্যবহারিক দিকের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার জন্য। ধর্মীয় স্থাপত্যের উপাদান ও বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করলে তাদের মধ্যে যথার্থ ধর্মীয় উপকরণ কমই পাওয়া যায়। কিন্তু মন্দির শিল্পের প্রসঙ্গে কি কখনো এই কথা বলা যায়? জীবন ও জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনকে সত্যিই কি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না? এই পরিবর্তন যে যুগকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল, সেই যুগকে মধ্যযুগ বলে অভিহিত করা কি অযৌক্তিক? রোমের পতনের পরে বাণিজ্যভিত্তিক সভ্যতার অবসান হয় এবং তার পরিবর্তে কৃষিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতা বিকাশ লাভ করে সেই মহাদেশের জীবনে এক ব্যাপক ও সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। এই গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরের সাহায্যে প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়। পাক-ভারতের ইতিহাসে যখন এই ধরনের কোনো অর্থনৈতিক রূপান্তরের সন্ধান মিলছে না, তখন পূর্বোক্ত মানসিক রূপান্তরকে এ দেশের মধ্যযুগের আত্মিক বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নিলে বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। এ কথা এখানে পরিষ্কারভাবে বলে রাখা ভাল যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের এই সংজ্ঞাটি কোনো স্থায়ী ও অনমনীয় সূত্র নয়। কাজ চালিয়ে নেবার মত যুগ-বৈশিষ্ট্য-ভিত্তিক এই কাল-বিভাগটি অত্যন্ত সাধারণ ধরনের—এই বিভাগে সমগ্র উপমহা-দেশকে চিহ্নিত করতে গিয়ে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ও ব্যতিক্রমকে আদৌ ধর্তব্যের মধ্যে নেওয়া হচ্ছে না। অধিকতর স্পষ্ট ও নির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যাত কোনো সূত্রের সন্ধান পেলে এটিকে অনায়াসে পরিত্যাগ করা যেতে পারে।

দুই

মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাসের উপাদান খুবই কম। যে সকল ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থ পন্ডিত সমাজে সুপরিচিত, তাদের অধিকাংশই সমাজ ও অর্থনীতি সম্বন্ধে নীরব। বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্য এ সম্বন্ধে যথেষ্ট কাঁচামাল সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু এই কাঁচামালের মধ্যে আমাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো তৈরী অবস্থায় রাখা হয়নি। বিশেষ ধরনের প্রশ্ন নিয়ে তথ্যগুলোর সম্মুখীন হয়ে জেরা-জবানবন্দীর সাহায্যে তাদের কাছে থেকে উত্তর আদায় করতে পারলে সামাজিক ইতিহাসের বহু অন্ধকারময় স্থানে আলোকপাত করা সম্ভব হবে বলে আমাদের ধারণা। এই সওয়াল-জওয়াবের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক কল্পনা একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এই হাতিয়ারের প্রয়োগ-ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আছে স্থান, কাল ও মানবীয় দৃষ্টিকোণের এক জটিল পরিপ্রেক্ষিত, যার চেহারা পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্নতা নিয়ে দেখা দেয়। পূর্ব-ভারতের সাহিত্য থেকে একটি উদাহরণ দেয়া যাচ্ছে। বিদ্যাপতি 'কীর্তিলতা' কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের একটি চিত্র এঁকেছেন। বর্ণনাটি পড়তে গিয়ে কবির মানসিকতা ও স্থানকালের গুরুত্বের প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গেলে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। বিদ্যাপতি মিথিলার লোক। সে দেশে তখন একটি হিন্দু রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত এবং সে দেশ মুসলিম শাসনের আওতায় আসে মুসলমানদের ভারত আক্রমণের বহু পরে। তখনকার দিনে মিথিলাতে কম মুসলমানই বসবাস করত। এই অবস্থায় কবি তাদের সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পরিবেশন করেছেন, সেগুলো আদর্শায়িত হওয়া খুবই সম্ভব এবং সেগুলো তাঁর পূর্ব-ধারণা-প্রসূত হওয়াও অসম্ভব নয়। 'শূন্য পুরাণে' মুসলমান আক্রমণকে ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধর্ম ঠাকুরের আক্রোশ রূপে বর্ণনা করে মুসলিম পীর-পয়গম্বরকে হিন্দু পুরাণের দেব-দেবীর সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে কবি মুসলিম আক্রমণকে স্বাগতঃ জানিয়েছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সদ্ধর্মীদের সম্পর্ক সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে কবির এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিকভাবে বুঝতে পারা যাবে না। চৈতন্য-জীবনীতে ও মনসা-মঙ্গল কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের যে বর্ণনাগুলো বিধৃত, তাদের সমগ্র পটভূমিতে কোনো ধর্মীয় নেতা বা দেব-দেবীর অবস্থান। এখানে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে, সেটি হল উক্ত মহাপুরুষ বা দেব-দেবীর অসাধারণ শক্তির প্রতি কবিদের গুরুত্ব আরোপের প্রশ্নটি। অতএব মুসলিম সমাজের প্রতি কবির বিদ্বেষ বা সহানুভূতির প্রশ্ন বিচার করতে গেলে সমগ্র পরিপ্রেক্ষিতের মূল্যায়ন আবশ্যক হয়ে পড়ে। 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের কবি

মুকুন্দরাম শাসকদের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেছেন এবং কালকেতুর গুজরাট পত্তন প্রসঙ্গে মুসলমানদের আচার ব্যবহার ও শ্রেণী-বিভাগের বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে মুসলিম সমাজের সঙ্গে কবির অপরিচয়ের প্রশ্নটি ত আছেই ; তা ছাড়া বর্ণনাটি সম্পর্কিত হয়ে আছে দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে। হিন্দু-মুসলিম সংক্রান্ত এই সকল বর্ণনার ক্ষেত্রে যদি উক্ত পরিপ্রেক্ষিতকে আদৌ বিচার না করে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে পরবর্তী বিন্দু পর্যন্ত ঐতিহাসিক কল্পনার সূত্রকে টেনে নেয়া যায়, তাহলে এই ধরনের ঐতিহাসিক কল্পনা যে ইতিহাসের নামে এক ভ্রান্তিকর চিত্রের সৃষ্টি করবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইতিহাসের উপকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তাই কোনো একটি সমালোচনামূলক পদ্ধতির প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

Trevelyan-এর *English Social History*, Henri Pirenne কর্তৃক দক্ষিণ ইয়োরোপের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপর লিখিত গ্রন্থগুলো এবং Marc Bloch-এর বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলোর পাতা উল্টালে এ কথা ভেবে বিস্মিত হ'তে হয় যে, ইংল্যান্ড ও ইয়োরোপের ইতিহাসের মাল-মসলা কত প্রচুর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। সে তুলনায় এই উপমহাদেশের যে কোনো অঞ্চলের ইতিহাসের উপাদান অত্যন্ত পরিমিত। এই পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে যে উপকরণসমূহ বিধৃত, তাদের যথাযথ বিশ্লেষণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অবশ্য একথা বলার কোনো কারণ নেই যে, ভ্রমণকাহিনী, দালান-ইমারত, মুদ্রা ও শিলালিপি এক্ষেত্রে গুরুত্ববিহীন। এদের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে এবং সামাজিক ইতিহাস লিখতে গিয়ে সাহিত্যের মাল-মশলার সঙ্গে আবশ্যক মত প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ নিশ্চয়ই মিশ্রিত করা যেতে পারে। রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে উঠে জৈবিক তাগিদে এবং এরা সভ্যতার অঙ্গ বিশেষ। সাহিত্য, স্থাপত্য ও শিল্পকলা এই সভ্যতার পরিশীলিত, সূক্ষ্ম অবদান। সামাজিক ইতিহাস লিখতে গিয়ে এদের ইতিহাসের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া দরকার। সমাজের এই অংশের ইতিহাস স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হওয়া আবশ্যক। তবে সাহিত্যে মানুষের আত্মার সন্ধান পাওয়া যায়। অতীতের ইতিহাসের আত্মার কাছাকাছি আসতে হলে সে যুগের সাহিত্যের আত্মার ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। সব রকমের উপকরণ একত্রিত করেও ইতিহাসের কোনো যুগ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদান আদৌ সম্ভব নয়। অতীতের এক বিরাট অংশ সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সাহিত্য, সমকালীন ভ্রমণ কাহিনী, দালান-ইমারত, মুদ্রা ও শিলালিপির মাধ্যমে অতীতের প্রতীকের যে ক্ষুদ্র অংশটি আমাদের কাছে পেঁ ৗছেছে,

অতীতের সামগ্রিকতার সঙ্গে তুলনা করলে তা অত্যন্ত তুচ্ছ, অত্যন্ত নগণ্য। কিন্তু এই তুচ্ছ ও নগণ্য অংশই ঐতিহাসিকের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। ঐ ছিন্নবিচ্ছিন্ন প্রতীকগুলোকে একত্রিত করে তিনি অন্ততঃ একটি মনগড়া চিত্র অঙ্কিত করতে পারেন। এই চিত্র বাস্তবের কতটা কাছাকাছি, তা নির্ভর করে ঐতিহাসিকের মানসিক গুণাবলী, তাঁর কল্পনা-শক্তি ও তাঁর পরিপ্রেক্ষিত-জ্ঞানের উপর। ঐ ক্ষুদ্র, তুচ্ছ প্রতীক যদি আমাদের হাতের কাছে না থাকত, তা হলে অতীতের খণ্ডিত, কুয়াসাচ্ছন্ন রূপটিও আমাদের কাছে বোধগম্য হত না, অতীত বর্তমানের দৃষ্টি-সীমার বহুদূরে নিশ্চিহ্ন হয়ে লোপ পেয়ে যেত।

তিন

মধ্যযুগের সমাজ জীবনে বিশেষ কোনো পরিবর্তন সংগঠিত হয়নি, এই ধারণাটি আমাদের মনে বদ্ধমূল। সে কথা এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই বলেছি। দীর্ঘকাল ধরে এই দেশের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে কৃষিকে অবলম্বন করে। এমন কি আজকের দিনেও যাঁরা শহরে-বন্দরে বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত রূপে পরিচিত, তাঁদের অনেকেরই গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং জোত-জমা তাঁদের জীবিকার অন্যতম অবলম্বন। আমাদের দেশে এখনো কোনো নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠতে পারেনি। কৃষিনির্ভর জীবনে পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুবই কম। এই ধরনের সমাজ বহির্জগতের সঙ্গে সচরাচর কোনো সংঘাতে লিপ্ত হয় না। একটি বিশেষ এলাকা পরিত্যাগ করে কোনো মানব গোষ্ঠী এক্ষেত্রে অন্য কোথাও চলে যায় না, কোনো অপরিচিত লোকগোষ্ঠীর সংস্পর্শেও আসে না। তার ফলে কৃষিজীবীদের সমাজে যে সকল আচার, অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রতিষ্ঠান জন্ম নেয়, দেশের মাটিতে তাদের ভিত্তিমূল গভীরভাবে প্রোথিত, তারা নিশ্চল। কিন্তু কৃষিভিত্তিক এই স্থবির জীবনেও পরিবর্তন আসে। সে পরিবর্তনের ধারা হয়ত বা মন্থর ; তাকে অগ্রাহ্য করা ঐতিহাসিকের কাজ নয়।

জৈবিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সামান্য প্রকৌশলগত পরিবর্তনের ফলে কি অসাধারণ বিপ্লবই না সাধিত হতে পারে। হাজার হাজার বছর আগে এ দেশে যখন অস্ট্রিকদের আগমন হল, কল্পনা করুন, তখন দেশের চেহারাটা কেমন ছিল। নদ-নদী, জলাভূমি, শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য ও পাহাড়-পর্বতের সে কি এক ভয়াবহ পরিবেশ। তারপর সেই আদিম মানবগণ বিরাট ভূখণ্ডকে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলল, পাহাড়ের গা কেটে স্তরে স্তরে সেখানে আবাদ করল, লাঙ্গল দিয়ে

জমি চষল, ধান, নারিকেল, সুপারী, কলা, কার্পাস প্রভৃতির খেত করল। মানুষের সবল হস্ত প্রসারিত হয়ে প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করল, তার চেহারাকেও পরিবর্তিত করল, শুধুমাত্র প্রকৃতির আইন-কানুনগুলোকে বদলাতে পারল না। ভাষাতত্ত্বের কল্যাণে আজ আমরা এই ইতিহাসের সঙ্গে সুপরিচিত। কৃষির সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির পরিভাষায় যে শব্দগুলো স্থান পেয়েছে, তাদের প্রায় সবগুলোই অস্ট্রিক শব্দ। কৃষি-ব্যবস্থা ও খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রিকদের নিকট থেকে আমরা বহু পরিভাষা ও শব্দসমষ্টি লাভ করেছি উত্তরাধিকার সূত্রে। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সঙ্গে তুলনা করে এবং ধ্বনি-বিজ্ঞানের সাহায্যে ভাষাতাত্ত্বিকগণ এই শব্দগুলোর একটি রূপ-বিন্যাস নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ইতিহাস বিলুপ্তির নির্মম গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়েছে। প্রকৌশলের কথাটি আর একটু ভেবে দেখা দরকার। অস্ট্রিক চাষী যখন লাঙ্গলের সাহায্যে জমি চাষের ব্যবস্থা প্রবর্তিত করল, তখন এই লাঙ্গলকে কেন্দ্র করে মানব-সমাজে এক নতুন শ্রেণী-বিন্যাসের সৃষ্টি হল। কাঠুরিয়া, সূত্রধর ও কর্মকারদের পূর্বপুরুষ চাষীর সঙ্গে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য এগিয়ে এল এবং আজকের দিনেও সেই সহযোগিতা অব্যাহত।

প্রাচীন কালে যদি এই ধরনের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে, মধ্য-যুগে কি অনুরূপ অথবা আপেক্ষিকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সম্ভাবনা আদৌ ছিল না? তুর্কী, আফগান, আরব, আবিসিনিয়ান ও মোগল লোকগোষ্ঠী এই উপমহাদেশে প্রবেশ করে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছে। তারা কি শুধু খালি হাতে এসেছিল, সঙ্গে করে কি কোনো প্রকৌশল নিয়ে আসেনি? সেই প্রকৌশলের প্রয়োগের ফলে সমাজ জীবনে শ্রেণী-বিন্যাসের ক্ষেত্রে কি কোনো পরিবর্তন দেখা দেয়নি? প্রশ্নগুলোর কোনো জবাব পাওয়া যাচ্ছে না, কেননা লিখিত দলিল-দস্তাবেজে তাদের সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত নেই। এ কথা চিন্তা করা মুশকিল যে উক্ত নতুন নতুন লোকগোষ্ঠী কোনো প্রকৌশলকেই বহন করে এ দেশে আনেনি। ইন্দো-মুসলিম আর্থনীতিক ইতিহাসের উপর লিখিত, মোরল্যান্ডের গ্রন্থগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়লে কিন্তু কতকগুলো প্রকৌশলের ব্যবহার সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এগুলো কারিগরি শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, জাহাজ নির্মাণ ও সামরিক কার্যাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত। এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে মোগল শাসন কালেই এদের সবগুলোর উদ্ভব ঘটেছে।

অন্য কতকগুলো পরিবর্তনের কথা আমাদের জানা আছে। পশ্চিমের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে এ দেশের খেত-খামারে ও বাগানে নতুন নতুন শস্য ও ফলের আমদানি হয়েছে। এগুলোর মধ্যে তামাক, আনারস, আলু,

হিজলী বাদাম, পেঁপে, কামরাঙ্গা, পেয়ারা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মোরল্যাণ্ড বলেছেন যে, মধ্যযুগে পাটশিল্প উন্নতি লাভ করেছিল। পাট চাষের প্রচলন নিশ্চয়ই ছিল এবং পাট থেকে চট অথবা ঐ জাতীয় মোটা বস্ত্রও হয়ত তৈরী করা হত। কিন্তু পাট থেকে মিহি বস্ত্র তৈরী করার জন্য যে সূক্ষ্ম কলা-কৌশলের প্রয়োজন, তা সেকালের বস্ত্র-শিল্পীদের অধিগত হয়েছিল কি না, মোরল্যাণ্ড সেকথা আদৌ চিন্তা করেননি। নীল চাষের ঘাটতি পড়লে গত শতকে পাট চাষ বিস্তৃতি লাভ করে এবং পাটের বস্ত্র যথার্থ শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়। যুগে যুগে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে নতুন নতুন উপকরণের আমদানি হয়েছে, হয়ত বা নতুন নতুন প্রকৌশলও সমাজ জীবনে পরিবর্তন এনে দিয়েছে। কোনো দলিলপত্রে লিখিত প্রমাণ নেই বলে এই পরিবর্তনের ব্যাপকতা নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও প্রবহমানতার ধারাকে অনুসন্ধান করাই ঐতিহাসিকের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

ইন্দো-মুসলিম ইতিহাস-শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য

Historians of Medieval India: Mahibbul Hasan (ed), with a foreword by Muhammad Mujeeb, XVII + 290. Meerut, 1968. *

ভারতের মুসলমান আমলের ইতিহাস-শাস্ত্র (Historiography) সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত খুবই কম আলোচনা হয়েছে। **Elliot** ও **Dowson** এবং তাঁদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ মুসলমান আমলের উপর ইতিহাস লিখতে গিয়ে ফারসী ইতিহাস-গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে অল্প-বিস্তর মন্তব্য করেছেন। যাঁরা ইতিহাসে গবেষণা করে ডক্টরেট প্রার্থী হন, তাঁদের নিবন্ধের শুরুতে ব্যবহৃত বই-পত্র ও দলিলদস্তাবেজ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা থাকে ; বহু মুদ্রিত ডক্টোরাল নিবন্ধে দেখা গেছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই আলোচনা প্রথানুগ ও আনুষ্ঠানিক। ফারসী ইতিহাস-শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রথম, ধারাবাহিক, সুষ্ঠু আলোচনা চোখে পড়ে Peter Hardy-র *Historians of Medieval India* (London, 1960) নামক এক ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থে। ১৯৫৬ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের সম্বন্ধে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পঠিত ও আলোচিত প্রবন্ধগুলি *Historians of India, Pakistan and Ceylon* নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়েছে (সম্পাদক: C.H. Philips, ১৯৬১, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৬২)। এ গ্রন্থে ইন্দো-মুসলিম ইতিহাস-বিদ্যা সম্পর্কিত আলোচনা অত্যন্ত সীমিত ও অপূর্ণাঙ্গ। বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিও দিল্লীর জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়ার ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক ১৯৬৬ সালে আয়োজিত আলোচনা-সভায় পঠিত। আশা করা গিয়েছিল যে, এই আলোচনা ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ হবে। বইটি পড়বার পর মনে হচ্ছে, আমাদের সে আশা পূর্ণ হয়নি।

মুসলিম ইতিহাস-সাহিত্যের এক বিশাল অংশ জুড়ে আছে জীবন-চরিত জাতীয় ইতিহাস। ইতিহাস-শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আলোচ্য গ্রন্থেও ঐতিহাসিকদের জীবন-চরিতের প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। এতে করে প্রত্যেকটি প্রবন্ধ ক্ষুদ্রাকার 'মনোগ্রাফে'র রূপ নিয়েছে এবং ইতিহাস-

---

* **এই গ্রন্থের সমালোচনা হিসেবে আলোচ্য প্রবন্ধটি লিখিত।**

সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যও খুব বেশী ব্যক্তি-কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। প্রবন্ধগুলি কাঠামোর দিক দিয়ে পরস্পর থেকে বিযুক্ত এবং চিন্তার দিক দিয়েও বিচ্ছিন্ন।

অবশ্য ঐতিহাসিকের ব্যক্তিগত জীবনকে উপেক্ষা করার কথাই ওঠে না; বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে কাঠামোগত ও তত্ত্বাদর্শগত সামঞ্জস্য আছে। এই সামঞ্জস্যের সূত্র ধরে এবং আবশ্যক মত ঐতিহাসিকদের পরিবেশ, ব্যক্তিগত প্রবণতা ও অভিজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টি রেখে ইতিহাসের তত্ত্ব, দর্শন, পদ্ধতি ও রূপ (form) সম্বন্ধে আলোচনা সম্ভবপর। এই পদ্ধতিতে একই প্রবন্ধের বা অধ্যায়ের আওতায় আবশ্যক মত বহু ঐতিহাসিককে আনা যেতে পারে এবং আলোচনা আদৌ ব্যক্তি-কেন্দ্রিক না হয়ে সম্পূর্ণ বিষয়ভিত্তিক হতে পারে। বর্তমান গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা ভারতের ইতিহাসের কোনো না কোনো ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত। তবুও এ কথা বলতে বাধা নেই যে, প্রায় প্রতিটি লেখাই কম-বেশী ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়ার ফলে আলোচনায় চিন্তার গভীরতা খুবই কম।

মুসলমান আমলে ভারতীয় ইতিহাসের বহু সমস্যা আছে যা বিশদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। কাল-বিভাজন এই সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। সম্পাদক ও লেখকগণ এ সম্বন্ধে কোনো সচেতনতার পরিচয় দেননি; অথচ কাল-বিভাজন সম্পর্কিত আলোচনার মধ্য দিয়েই এ জাতীয় গ্রন্থের আরম্ভ হওয়ার কথা। সমগ্র বইটি পড়ে যদি এ সম্বন্ধে ধারণা করতে হয়, লেখকদের নীরবতা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে যে, মুসলমানদের শাসন-কালই 'মধ্যযুগ' রূপে চিহ্নিত হয়েছে। গজনবী বা ঘোরী শক্তি এ দেশে যখন আক্রমণকারী বা শাসক হিসেবে দেখা দিল, তখন থেকেই যদি মধ্যযুগ শুরু হয়ে থাকে, তবে ঐতিহাসিককে বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন মূল্যবোধ দেখা দিল কি না, কোনো নতুন প্রকৌশল জীবিকার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনল কি না, এ দেশের সাবেক ধর্ম-কর্ম ইসলামের সংস্পর্শে এসে পরিবর্তিত হল কি না—আশা করা গিয়েছিল যে জামিয়া মিল্লিয়াতে পঠিত কোনো না কোনো প্রবন্ধে এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। ম্যাক্স ওয়েবার ছাড়া অন্য কোনো ঐতিহাসিক আজ পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসে কাল-বিভাজনের সমস্যা নিয়ে উচ্চ-বাচ্য করেননি। আমরা 'ইতিহাস' পত্রিকার প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় এ বিষয়ে একটু-আধটু ইঙ্গিত দিয়েছি।

অধ্যাপক মুজিবের প্রস্তাবনায় কতকগুলো কথা আছে যা বর্তমান যুগের মুসলমানদের মনকে নাড়া দেয়। মুসলিম শাসন-কালে মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে

ক্রিয়াশীল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রতি ইঙ্গিত করে মুজিব বলেছেন : "মুসলমান জন-সাধারণের উপরে এই পরস্পর-বিরোধী শক্তিগুলি সক্রিয় ছিল। এ কথা বলা যায় না যে, তাদের আবেগানুভূতি বিশেষ কোনো লক্ষ্যের অনুসরণে ক্রিয়াশীল হয়েছিল। সমাজগতভাবে মুসলিম সম্প্রদায় কখনো কোনো সমশ্রেণী-ভুক্ত গোষ্ঠীরূপে গড়ে উঠতে পারেনি। জাতি, শ্রেণী ও জীবিকার ভিত্তিতে তারা বিভক্ত ছিল; বিশেষ করে, যারা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে রত ছিল, ধর্মীয় বিচার-বিবেচনার চেয়ে জাতিগত বৈষম্যই (racial differences) তাদের জন্য চূড়ান্তভাবে কাজ করত।" শরীয়তের সঙ্গে যদি ভারতীয় 'ধর্মে'র কোনো সংঘাত হয়ে থাকে, তবে তা পরিলক্ষিত হয়েছিল ক্ষমতার লড়াই-এর ক্ষেত্রে এবং আর্থনীতিক ক্ষেত্রে। গ্রাম্য অধিপতি ও কৃষক সম্প্রদায়কে বাহিরের কোনো শাসন-কর্তৃত্ব স্পর্শ করতে পারেনি এবং তাদের 'ধর্ম'ও তাদেরকে কখনো ক্ষত্রিয় আক্রমণকারী থেকে মুসলিম আক্রমণকারীকে আলাদা করে দেখতে শেখায়নি। মিস্ত্রি-কারিগরগণ ত নতুন শাসকগোষ্ঠীর বিপুল চাহিদা মিটাতে গিয়ে লাভবানই হয়েছে (VII)।··· "আমরা যদি শুধুমাত্র অংশের প্রতি না তাকিয়ে সামগ্রিকতা সম্বন্ধে যথানুপাতিক ধারণা লাভ করি, তা হলে আমাদের ইতিহাসের ভূ-দৃশ্য সম্পূর্ণরূপে আলাদা চেহারা নিয়ে দেখা দেবে। তখন এতে আমরা এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখতে পারি, যা আমাদের আজকের দিনের জীবন-চিত্রেও দেখে থাকি এবং এতে করে ভারতীয় ইতিহাস আমাদের ইতিহাসে পরিণত হবে" (VIII)। ধর্মীয়, আঞ্চলিক বা ভাষাগত সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে "ঐতিহাসিক যদি ভারতের প্রতি ভালবাসা দ্বারা অনুপ্রাণিত হন এবং যদি সার্বজনীন মানবীয় মূল্যবোধ তাঁর বিচার-বুদ্ধিকে প্রণোদিত করে, এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তা হলে ভারতের ইতিহাস হবে 'মহান উপায়ে বর্ণিত একটি শ্রেষ্ঠ গল্প' (a great story nobly told. IX)।

আজকের ভারতে কতিপয় উদারপন্থী রাজনীতিবিদ ও মুক্ত-বুদ্ধি নাগরিক জাতি গঠনের প্রয়াসে রত। সেক্ষেত্রে মুসলমানের অতীত তাদের পক্ষে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে হয় যেন মুজিব সেই বাধাকেই অতিক্রম করতে বলেছেন অতীতের পুনর্গঠনের মাধ্যমে এবং ইতিহাসভিত্তিক কল্পনার সহায়তায় —"প্রাণহীন উপকরণের মধ্য থেকে ইতিহাস জীবন্ত হয়ে ওঠে না, ইতিহাস জীবনশক্তি সঞ্চয় করে ঐতিহাসিকেরই মনোজগতে" (IX)। আধুনিক ভারতের রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে মুজিবের উপরোক্ত মন্তব্যগুলি পরীক্ষা করলে মনে হয় তিনি যেন জাতি গঠনের প্রচেষ্টার প্রতি পরোক্ষভাবে বুদ্ধিগত সমর্থন জুগিয়েছেন। Sir Sayyid and Shibli নামক নিবন্ধে ফারুকী যে প্রশ্ন তুলেছেন, তাতেও

বর্তমান যুগের রাজনীতির ও সমাজ-সংস্কারের প্রভাব আছে বলে মনে হয়ঃ "হিন্দু ও মুসলিম, এই উভয় সম্প্রদায়ের লোক, একইভাবে, নিছক বুদ্ধিগত ভিত্তিতে, পরস্পরকে না জানার ও না বুঝবার ভুল করেছে কি না—এটি একটি প্রশ্ন। আশা করা যায়, আজকের দিনের ঐতিহাসিক এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন এবং এই অবহেলার কারণ ও ফলাফল নিয়েও গবেষণা করবেন" (২৪১)। ঐতিহাসিক অতীতকালের অংশ নন, তিনি বর্তমানের মানুষ। অতীতের ইতিহাসকে তিনি যে বর্তমান সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করে দেখবেন, তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। গ্রন্থখানির অন্য কোনো অংশে ইতিহাসকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়নি। কোনো না কোনো প্রবন্ধে, অন্ততঃ সম্পাদকের ভূমিকায়, মুজিব কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নগুলি আলোচিত হলে নিঃসন্দেহে তা বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকের ইতিহাস-চেতনা রূপে চিহ্নিত হত।

ভারতের বাইরেও যে মুসলমানদের ইতিহাস-সাহিত্যের একটি সুসমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছে, সে সম্বন্ধে আপাত অচেতনার মধ্য দিয়ে বর্তমান গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধে আলোচনার ধারা এগিয়ে চলেছে। ১৭৫ পৃষ্ঠায় জগদীশ নারায়ণ সরকার ইঙ্গিত করেছেন যে, 'ফুতুহ-উস-সালাতীন' যেন ইসামি লিখিত 'শাহনামা'। হার্ডির পূর্বোক্ত গ্রন্থে যদিও এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে, তবুও আশা করা গিয়েছিল যে, 'শাহনামা'র সঙ্গে এবং আরবী 'মাগাজী' বা 'ফুতুহ' শীর্ষক ইতিহাস গ্রন্থের সঙ্গে উক্ত গ্রন্থটির কোনো সম্পর্ক আছে কি না, লেখক সে সম্বন্ধে কিছু কথা বলবেন। ভারতীয় ইতিহাস গ্রন্থগুলির মধ্যে আরো আছে 'তবকাত' পদ্ধতির ইতিহাস, আঞ্চলিক ইতিহাস, জীবনীমূলক ইতিহাস এবং সন-তারিখ-ভিত্তিক ইতিহাস। এই পদ্ধতিগুলি আরবী ইতিহাস-শাস্ত্রে বহু পূর্বেই পরিপূর্ণতা পেয়েছিল। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে এই ঐতিহ্য নির্দেশের কিছুমাত্র প্রয়াস নেই। 'তারীখ-এ-আলফী' সম্বন্ধে রিজভী বলেছেনঃ "গ্রন্থটি লিখিত হয়েছে চূড়ান্ত রকমের ধারাবাহিক (chronological) রীতিতে। মুহম্মদের মৃত্যুর পরবর্তী বৎসর থেকে শুরু করে প্রত্যেক বৎসরের অধীনে ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।" ঘটনা-বিন্যাসরীতি লক্ষ্য করলেই উপরোক্ত লেখকগণ বুঝতে পারতেন যে, 'তারীখ-এ-আলফী'তে আছে আরবী ইতিহাস-শাস্ত্রেরই ঘটনা-বিন্যাসের একটি বিশেষ রীতির অনুসৃতি।

আধুনিক কালের ইতিহাসের ধারণা অনুসারে প্রতিটি ঘটনার কারণ নিতান্ত মানবীয় এবং ঘটনার সংঘটনে কোনো দৈবিক বা অ-মানবীয় শক্তির কিছুমাত্র প্রভাব নেই। কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকগণ গতানুগতিকভাবে মনে করেছেন যে, একমাত্র আল্লাহ্ই সকল ঘটনার সংঘটনকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকর্তা। এ বিষয়ে

সম্পাদক বলেছেন: "যে সমাজে আশারীয় ধর্মতত্ত্ব সার্বিক প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে সমাজে এই দৃষ্টিভঙ্গি অনিবার্য" (**XII**)। এই মত প্রথম প্রচার করেন হার্ডি (পূর্বোক্ত, ১১৯-২০; *Historians of India, Pakistan and Ceylon*, 126.) এবং বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদক এই মতটি সম্পূর্ণ নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন। যুক্তিবাদী মোতাজিলা দার্শনিকগণ ধর্মীয় বিশ্বাসকেও যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। আল-আশারী ও তাঁর সমর্থকগণ তর্কশাস্ত্রের সাহায্যেই মোতাজিলা মতবাদ খণ্ডন করে গোঁড়া সুন্নী ইসলামকে যুক্তির ভিত্তিতে দৃঢ় করে তুলেছিলেন। কিন্তু ভারতে কবে মোতাজিলা বা আশারীয় আন্দোলন হয়েছিল? ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ যদি গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে আশারীয় দর্শনের সংস্পর্শে এসে থাকেন, তা হলে এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুবিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন ছিল এবং আশারীয় আন্দোলনের পূর্বে লিখিত মুসলমানদের ইতিহাস গ্রন্থসমূহে আল্লাহ্‌কে সকল কার্যকারণের উৎসরূপে ধরে নেয়া হয়েছিল কি না, সে বিষয়েও আলোক-পাতের আবশ্যকতা ছিল। সুন্নী ইসলাম আল্লাহ্‌কেই সবকিছুরই পরিনিয়ন্তা বলে মনে করে। ইতিহাসের কার্যকারণ ব্যাখ্যায় এই সাধারণ সুন্নী প্রভাবই সক্রিয় ছিল বলে মনে হয়।

'মালফুজাত-এ-তৈমুরী', 'বাবরনামা', 'হুমায়ুননামা' ও 'বাহারিস্থান-এ-গায়বী' সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তুর্কী ও মোগলদের মধ্যে আত্মচরিত জাতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। পুষ্প সুরীর 'বাবর' ও কেয়াম-উদ্-দীনের 'মির্জা নাথন' প্রবন্ধে যদি এই ঐতিহ্যের উপরে আলোচনা স্থান পেত, তা হলে সুবিস্তৃত সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে আত্মচরিত দুটিকে আরো পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যেত।

Amir Khusrau as Historian প্রবন্ধে উক্ত খ্যাতনামা কবির রচনাবলীর সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধকার হাসান আসকারী হার্ডির মতামত খণ্ডন করেছেন লেখাটির এক বিরাট অংশ জুড়ে; ফলে এ লেখাটি খণ্ডনমূলক, নাস্তিবাচক, গভীরতাবিহীন ও মৌলিকতাবিহীন নিবন্ধের রূপ পেয়েছে। আমীর খুসরো মূলত কবি ও সাহিত্যিক বা শিল্পী; তিনি ঐতিহাসিকের মানসিকতা নিয়ে কলম ধরেননি।

জহির-উদ্-দীন মালিক কর্তৃক লিখিত 'আঠার শতকের ফারসী ইতিহাস-শাস্ত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে ঐতিহাসিকদের মানসিকতা সম্বন্ধে আলোচনা অত্যন্ত সীমিত। 'সিয়ার-উল্-মুতাক্‌খরীনে'র মত মূল্যবান গ্রন্থ এ আলোচনায় স্থান পায়নি। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের দৃশ্যটি সামগ্রিকভাবে এই গ্রন্থে ধরা পড়েছে। সামাজিক ও

সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপকরণে গ্রন্থটি পরিপূর্ণ। বাংলাদেশের উপরে আঠার শতকে লেখা এই গ্রন্থগুলি আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল—(১) সলিম-উল্লাহ্: 'তারীখে বাংগালা', (২) সলিম: 'রিয়াজ-উস-সলাতীন' এবং (৩) যদুনাথ সরকার ও Huges কর্তৃক অনূদিত তিনটি গ্রন্থ (*Bengal Nawabs* এবং ***Bengal Past and Present*, LXXVI, pt. I**, রটোগ্রাফ দেয়া হয়েছে)।

আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে সারান ফারসী ইতিবৃত্তগুলির ত্রুটি উল্লেখ করে টডের একটি উক্তির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন: "গ্রীস ও রোমের ইতিহাস গ্রন্থসমূহে যে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়, সেই ধরনের বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ ইতিহাস হিন্দুদের কাছে থেকে আশা করা অত্যন্ত অন্যায়" (১৯৮)। কিন্তু ইতিহাস বলতে সারান নিজে কি বুঝিয়েছেন, সমগ্র প্রবন্ধটির মধ্যে কোথাও সে কথা তিনি পরিষ্কারভাবে বলেননি। প্রবন্ধটি পড়লে দেখা যায় যে, তিনি জৈন পণ্ডিতদের জীবন-বৃত্ত, অহোম বুরঞ্জী জাতীয় ঐতিহাসিক কিংবদন্তী, রাজস্থানের কিংবদন্তী-ভিত্তিক ইতিকথা, চরিতকাব্য ও রাজাদের জীবন-বৃত্তের উপর জোর দিয়ে বলেছেন যে, ভারতে ইতিহাস লেখা হত না, এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তিনি ইতিহাস ও ইতিহাসের মালমশলার আকরকে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। তিনি বিশেষ একটি ধারণার একনিষ্ঠ সমর্থক। আমরা আশা করেছিলাম যে সারান ও রোমিলা থাপার (*The Historical Ideas of Kalhana As Expressed in the Rajatarangini*) ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত ইতিহাসের ধারণা ও সংজ্ঞা সম্বন্ধে আলোচনা করে আপন আপন মতামতকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাবেন। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' এবং জিন সেনের 'আদি পুরাণে' পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রকে 'ইতিহাস' রূপে অভিহিত করা হয়েছে। স্পষ্টতঃই, আধুনিক কালের ইতিহাসের সংজ্ঞার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ঐ ব্যাপক ধারণার সাদৃশ্য কম। জীবন-চরিত ও পুরাণ জাতীয় পুরাবৃত্ত রচনার ঐতিহ্য ভারতে নিশ্চয়ই ছিল। এ ধরনের সাহিত্যকে এই জন্যই ইতিহাস বলা যায় না, যাঁরা এ সাহিত্যের স্রষ্টা, তাঁরা কখনো এ কথা মনে করেননি যে, তাঁরা ঐতিহাসিক অথবা তাঁরা অতীতের ঘটনাকে লিপিবদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত করে রাখছেন। 'রাজতরঙ্গিনী'তে ইতিহাস-চেতনার এই অভাব দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না বলেই এই কাব্যটিকে ইতিহাস বলা যায়। কহ্লণ ইতিহাসের কার্যকারিতা সম্বন্ধে অনেকটা সজাগ। পরস্পর-বিরোধী কিংবদন্তীগুলির উপর আস্থা না রেখে তিনি কাশ্মীরের রাজাদের স্থান ও কাল সঠিকভাবে নিরূপিত করতে চান—আধুনিককালে আমরা যাকে 'গবেষণা'

বলি, কহ্লণ তাই করতে চান। 'রাজতরঙ্গিনী' রচনার পূর্বে ভারতে কোনো ইতিহাস রচিত হয়েছিল বলে মনে হয় না, কারণ, সময়ের প্রবহমানতা সম্বন্ধে কোনো সুষ্ঠু ধারণা এ দেশে প্রচলিত ছিল না। 'কল্প', 'মন্বন্তর', 'যুগ'—এ ধরনের অতি দীর্ঘ সময়-কালের মাঝে মানবীয় ঘটনাকে স্থাপিত করা অসম্ভব। আল-বেরুণীর ভারত বৃত্তান্তে বহু 'অব্দে'র উল্লেখ আছে। আলবেরুণীর উক্তি থেকেই মনে হয় যে এই অব্দগুলির জটিলতা ও অস্পষ্টতা এত বেশী ছিল যে সেগুলি বোধ হয় ব্যবহারযোগ্য ছিল না।

আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত ইতিহাসের আলোচনায় সারান সংস্কৃত ভাষায় লেখা বেশ কয়েকটি চরিত-কাব্য ও 'রাজতরঙ্গিনী'র উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সংস্কৃত কোনোকালে কি আঞ্চলিক ভাষা ছিল? সংস্কৃত কাব্যগুলো বাদ দিলে সারান প্রদত্ত গ্রন্থের ফিরিস্তি একেবারে ছোট হয়ে যায়। সারান যদি খোঁজ নিতেন, তা হলে দেখতেন যে যথার্থভাবে ইতিহাসরূপে অভিহিত হতে পারে, এ রকম অন্তত দু'খানি বাংলা কাব্য আছে: একটি ত্রিপুরার ইতিহাস 'রাজমালা'—যা অনেকটা 'রাজতরঙ্গিনী'র আদলে কয়েক পুরুষ ধরে কয়েকজন ঐতিহাসিক দ্বারা রচিত হয়েছিল; অপরটি গঙ্গারাম দাস কর্তৃক রচিত 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'—যাতে বাঙ্গালা দেশে বর্গী আক্রমণের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলা ও সংস্কৃত চৈতন্য-চরিতগুলো ধর্তব্যের মধ্যে নিলে সারানের মতবাদ আরো মজবুত হত। কিন্তু আমরা আবার বলছি, এগুলো ইতিহাসের মৌলিক আকর; এই গ্রন্থগুলি থেকে আবশ্যক মত তথ্য নিয়ে ঐতিহাসিক সমালোচনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে সেগুলিকে নিশ্চয়ই কাজে লাগাতে পারেন।

অমুসলমান ভারতীয়দের উপর মুসলিম ইতিহাস-শাস্ত্রের প্রভাব কতটা পড়েছিল আলোচ্য বইটিতে সে সম্বন্ধে কোনো ধারাবাহিক আলোচনা চোখে পড়ে না। পাঠক অবশ্য এ বিষয়ে কিছুটা নিজের দায়িত্বে ও প্রচেষ্টায় ধারণা করতে পারেন Ganda Singh কর্তৃক লিখিত Some Non-Muslim Sources of the History of the Punjab During the Medieval Period শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে। শিখ গুরুদের কৃতিত্ব বিষয়ক বহু গ্রন্থ লেখা হয় গুরমুখী, মারাঠি ও ফারসী ভাষায়। এই লেখাগুলিতে মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে। আঠার ও উনিশ শতকে অমুসলমান ঐতিহাসিকগণ ফারসীতে লিখিত যেসব, ইতিহাস রচনা করেছিলেন (যেমন, সুখারাম: রাম্জ ওয়া ইশারহ -এ-আলমগিরি, ১৭০৮; জগজীওন দাস গুজরাটি: মুন্তখাব-উত-তাওয়ারীখ, ১৭০৮: আনন্দ রাম মখলিসের 'তাজকিরা', 'ওয়াকিয়া' প্রভৃতি) সেসব, মুসলিম

সংস্কৃতির সার্বিক প্রভাব নির্দেশক। হিন্দুর ইতিহাস চেতনায় বা ইতিহাস লেখার পদ্ধতিতে মুসলিম ইতিহাস-সাহিত্যের প্রভাবের সাক্ষ্য নয়।

কয়েকটি অধ্যায়ে ভারতীয়, ইংরেজ ও সোভিয়েট ঐতিহাসিকদের প্রবণতা ও পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। আমাদের মনে হয়েছে Grover—যদুনাথ সরকার ও মোরল্যাণ্ডের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকেই বড় করে দেখেছেন; পথিকৃত হিসেবে তাঁদের যে মর্যাদা প্রাপ্য, তিনি তা দিতে পারেননি। রাজপুত চিত্রকলার ইতিহাসে আনন্দ কুমার স্বামীর অবদান সম্পর্কিত আলোচনাটি মূল্যবান। আমরা আশা করেছিলাম, স্থাপত্য ও মুদ্রাতত্ত্বে যাঁরা স্থায়ী কৃতিত্বের অধিকারী (যেমন কানিংহাম, ফারগুসন, টমাস এইচ. এন. রাইট), তাঁদের সম্বন্ধেও কিছু লেখা আলোচ্য সঙ্কলন গ্রন্থে স্থান পাবে।

ভারতীয় ইতিহাস–সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণায় বর্তমান গ্রন্থটি একটি উল্লেখ-যোগ্য সংযোজন। এই বইটিকে ভিত্তি করে মুসলমান আমলের ইতিহাসবিদ্যা সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা সম্ভব হবে।

মুসলিম বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তব্য *

বাংলাদেশের ইতিহাস। রমেশ চন্দ্র মজুমদার (সম্পাদক) : ২য় খণ্ড (মধ্য যুগ), পৃঃ ।।৶+৫৩৪; মানচিত্র ৩; চিত্র ৫৮; কলিকাতা, ১৩৭৩।

History of Bengal; Mughal Period. অতুল চন্দ্র রায়; xi+525; ম্যাপ; কলিকাতা, ১৯৬৮।

বিভাগোত্তর বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের যে বৈশিষ্ট্য খুব সহজে চোখে পড়ে, সেটি হচ্ছে বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলের সাহিত্য ও ইতিহাস সাধনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ। সাহিত্যের তুলনায় ইতিহাসের গবেষণা এখনো বেশ খানিকটা অনগ্রসর। এই নিরুৎসাহজনক পরিবেশেও বাংলার ইতিহাসের উপরে কিছু কিছু গ্রন্থ রচিত হচ্ছে। গবেষণার বর্তমান পর্যায়টিকে প্রস্তুতি-পর্বরূপে চিহ্নিত করলে বোধ হয় তা অসঙ্গত হবে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়বস্তু বা অপরিসর ও খণ্ডিত যুগের উপর গবেষণা-কার্যের পরিচালনাই এই প্রস্তুতি-পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাক-মুসলিম বাংলার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এ কার্যটি বহুদিন আগেই সুসম্পন্ন হয়েছিল বলেই ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে *History of Bengal*, vol. I গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। সমগ্র মুসলিম আমলের উপর সংশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ রচনার এখনো সময় আসেনি; কেননা মনোগ্রাফ রচনার যুগ এখনো শেষ হয়নি। আলোচ্য বই দুটি পড়ে এই নাস্তিবাচক অভিমতের পক্ষে সমর্থন পেয়েছি।

প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয় যে গ্রন্থ দুটি ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু লেখকদের দাবী এখানে অন্য রকম। ডঃ মজুমদার বলেছেন, "মধ্যযুগের বাংলার সর্বাঙ্গীন ইতিহাস ইতিপূর্বে লিখিত হয় নাই।" অতএব এই অভাব দূর করবার জন্যই বাংলা গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। ইংরেজী গ্রন্থের লেখক তাঁর দাবী সম্বন্ধে আদৌ সোচ্চার নন; তবে তিনি এ কথা খোলাখুলিভাবে বলেছেন যে, মোগল আমলের ইতিহাস লিখতে গিয়ে তিনি সমালোচনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ডঃ মজুমদারের পুস্তকটির শুরু বখতিয়ার খিলজীর আক্রমণ-কাল থেকে এবং সমাপ্তি, নবাবী আমলের সর্বশেষ বছরে। আলোচিত বিষয়বস্তুগুলি হচ্ছে রাজনৈতিক ইতিহাস, শাসন-ব্যবস্থা, আর্থনীতিক অবস্থা,

* শুরুতে উল্লিখিত গ্রন্থ দু'টির সমালোচনা রূপে প্রবন্ধটি লিখিত।

ধর্ম ও সমাজ, সংস্কৃত সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য এবং শিল্প। একটি পরিশিষ্টে আছে কোচবিহার ও ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোচনা। ইংরেজী গ্রন্থটিতে রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতি বেশী করে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে এবং একটি মাত্র অধ্যায়ে সামাজিক ইতিহাস ও আর্থনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ আলোচনা স্থান পেয়েছে।

ডঃ মজুমদার ও তাঁর সহযোগী সুখময় মুখোপাধ্যায়, রাজনৈতিক ইতিহাস বলতে বুঝেছেন রাজা-বাদশার লড়াই, রাজ্যবিস্তার এবং বড় জোর শাসন-ব্যবস্থা। এঁদের আলোচনা বর্ণনা-বহুল ও সমালোচনাবিহীন এবং তথাকথিত ঘটনাকেই (fact) এঁরা ইতিহাস বলে ধরে নিয়েছেন। গ্রন্থটির রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কিত অধ্যায় থেকে যে কোনো অংশের উদ্ধৃতি নিয়ে যদি ঐ অংশটিকে আকর-গ্রন্থের অনুরূপ অংশের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, ডক্টর মজুমদার ও তাঁর সহযোগী আকর-গ্রন্থ থেকে তথ্য নিয়ে বাংলা বইটিতে সরাসরি বসিয়ে দিয়েছেন। যেন তাঁদের ধারণা—ঘটনাই ইতিহাস এবং ঘটনার বর্ণনাই ঐতিহাসিকের একমাত্র কর্ম। ঘটনা বা পরোক্ষ ঘটনা লেখকের ইতিহাসভিত্তিক কল্পনার স্পর্শ পেয়ে যদি জীবন্ত হয়ে না ওঠে, ঘটনাকে ভিত্তি করে ব্যাখ্যার মাধ্যমে ঐতিহাসিক যদি অতীতের মর্মমূলে প্রবেশ করতে না পারেন, তবে নিছক ঘটনা-বিবরণকে ইতিহাস বলে আদৌ গণ্য করা যায় না। ইংরেজী গ্রন্থের লেখক এই সমস্যা সম্বন্ধে আদৌ সচেতন কি না, তা বুঝতে পারা কঠিন। গ্রন্থটির স্থানে স্থানে সমালোচনাভিত্তিক বিবরণ আছে; কিন্তু এই জাতীয় অংশগুলিকে লেখক তাঁর পূর্বসুরীদের গ্রন্থ থেকে সমালোচনাসহ সঙ্কলিত করে নিয়েছেন এবং গ্রন্থটি যে পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভাষায় তাকে **Scissors and Paste** পদ্ধতি বলে অভিহিত করা যায়।

বাংলা গ্রন্থটিতে ব্যাখ্যামূলক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব প্রকট; কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় যে, সমগ্র আলোচনার কেন্দ্রে একটি বিশেষ ধারণা কাজ করেছে। ধারণাটি এই: হিন্দু ও মুসলমান রাজা-বাদশাহগণ হিন্দুর উপর অত্যাচার চালিয়েছিলেন; তাঁরা বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেননি। বহু বৎসর ধরে ডঃ মজুমদার এই অভিমত ব্যক্ত ক'রে আসছেন। বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যায়, *History and Culture of Indian Peoples*-এর ষষ্ঠ খণ্ডে, সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল' নামক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায়, *Bhattasali Commemoration Volume*-এ, এবং আরো কয়েকটি লেখায় বিভিন্নভাবে তিনি ঐ কথাগুলোর পুনরুক্তি

করেছেন। ডঃ মজুমদার তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ডঃ মুজতবা আলীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। ডঃ মুজতবা আলী বলেছেন যে, সাত শ' বছর ধরে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বাস করে শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে পরস্পরের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারেনি এবং হিন্দুদের, সংস্কৃতের মাধ্যমে এবং মুসলমানদের, আরবীর মাধ্যমে শিক্ষা-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে স্বতন্ত্রভাবে, দ্বিকাঙ্ক্ষিক প্রণালীতে। আমাদের জিজ্ঞাস্য : ইন্দো-মুসলিম যুগের সাহিত্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য, চিত্রকলা ও ভক্তি আন্দোলন সম্বন্ধেও ডঃ মুজতবা আলী কি ঐ একই কথা বলবেন ? ডঃ মজুমদারের লেখা পড়ে সব সময় মনে হয়েছে যে, তিনি কোনো না কোনো প্রতিপক্ষকে সম্মুখে রেখে কথা বলছেন। আমরা যতদূর জানি, কোনো ঐতিহাসিক লিখিতভাবে এ কথা বলেননি যে, ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান মিলে এক জাতিতে পরিণত হয়েছে। তাই মনে হয়, ডঃ মজুমদারের প্রতিপক্ষ হচ্ছে আধুনিক ভারতের শাসক-গোষ্ঠী এবং কিছুসংখ্যক রাজনীতিবিদ। ডঃ মজুমদার বোধ হয় মনে করেন যে, আধুনিক রাজনীতির সমস্যা ও অতীতের ইতিহাসের সমস্যা এক ও অভিন্ন। যদি তিনি এই দুই ধরনের সমস্যাকে ভিন্ন বলে মনে করতেন, তা হলে হয়ত তিনি দুই জাতির প্রকল্প নিয়ে এতটা পরিশ্রম করতেন না।

ডঃ মজুমদার বলেছেন, "...ভারতে 'হিন্দু সংস্কৃতি' এই কথাটি এবং ইহার অন্তর্নিহিত ভাবটি উল্লেখ করিলেই তাহা সংকীর্ণ অনুদার সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলিয়া গণ্য করা হয়।" ডঃ মজুমদার সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির অধিকারী কি না, সে প্রশ্নের আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবে তাঁর দু'একটি বিবৃতি এখানে উল্লেখের দাবী রাখে। কোচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্য সম্বন্ধে সম্পাদক বলেছেন, "মধ্যযুগে হিন্দুর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রতীকস্বরূপ বাংলার ইতিহাসে এই দুই রাজ্যের স্থান আছে"। সেইজন্য বিশেষ করে এই দুইটি রাজ্য সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কোনো একটি রাজ্য হিন্দু অথবা মুসলমান কি না, ঐতিহাসিক সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করেও উক্ত রাজ্যটিকে অন্যান্য কারণে আলোচনার আওতার মধ্যে আনতে পারেন। এই কারণগুলি হচ্ছে উক্ত রাজ্যের রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব। এই আলোচনার উদ্দেশ্য নিছক জ্ঞান লাভ—রাজ্যটিকে কোনো একটি জাতির 'রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রতীকস্বরূপ' মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভের প্রচেষ্টা এ ক্ষেত্রে অবান্তর।

বৈষ্ণব ধর্ম আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ মজুমদার বলেছেন, "তিনশত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী ধর্ম রক্ষার্থে মুসলমানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়

নাই··· চৈতন্যের নেতৃত্বে অসম্ভব সম্ভব হইল।···যিনি দূরাচারী যবনকে শাস্তি দিবার জন্য সদলবলে অগ্রসর হইয়া বলিয়াছিলেন, 'নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন'—বাঙ্গালী তাহা মনে রাখে নাই।" 'শিক্ষাষ্টকে'র একটি শ্লোকে শ্রীচৈতন্য নিজেই ইঙ্গিত করেছেন যে, আদর্শ বৈষ্ণবকে তৃণের মত সহিষ্ণু হতে হবে। ডঃ মজুমদার একটি উদ্ধৃতির ভিত্তিতে যা বলেছেন, তা আদর্শ বৈষ্ণববাদের পরিপন্থী।

ইংরেজী গ্রন্থটিতে 'হিন্দু সংস্কৃতি' অথবা 'হিন্দুর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা' সম্বন্ধে বিশেষ কোনো উদ্যম নেই; কিন্তু একটুখানি অতীতমুখিতা লক্ষ্য করা যায় সর্বশেষ অধ্যায়ে। বাঙ্গালা দেশের নৌবল সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক সুদূর অতীত থেকে শুরু করে ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চলে এসেছেন এবং এই ঐতিহ্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি স্পষ্টভাবে গর্ববোধও করেছেন। অতীতের জের বেশী করে টানা হয়েছে বলে এই অধ্যায়টি অন্যান্য অধ্যায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন। একেবারে 'পেরিপ্লাসে'র যুগে না গিয়ে গ্রন্থকার যদি 'বাহারিস্তান-এ-গায়বী' ও 'ফত্‌হিয়া-এ-ইব্‌রিয়া' গ্রন্থে উল্লিখিত নৌকার নামগুলি নিয়ে একটু বিশদ আলোচনা করতেন, তা হলে আমরা পাঠক হিসেবে বিশেষ উপকৃত হতাম। দেখা গেছে যে, কোনো কোনো শাসক দেশী লোকজনের সাহায্য ছাড়াও কিছু সংখ্যক ফিরিঙ্গী প্রকৌশলীকেও নৌকা নির্মাণের কার্যে নিয়োগ করতেন। অধ্যায়টি পড়ে আমরা আদৌ বুঝতে পারি না যে, রাজ্যবিস্তারের কাজে মোগল নৌবাহিনীর সাফল্য কি পরিমাণে সহায়ক হয়েছিল এবং এক্ষেত্রে বারভুঁইয়াদের শক্তিই বা কতটা সক্রিয় ছিল।

শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ডঃ রায় যা বলেছেন, প্রায় তার বেশ কিছু অংশ তপন কুমার রায় চৌধুরীর গ্রন্থ থেকে গৃহীত। শেষোক্ত গ্রন্থে শুধুমাত্র আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের শাসন-ব্যবস্থা আলোচিত হয়েছে। সেই জন্য ডঃ রায়ের আলোচনাও শাজাহান, আওরঙ্গজেব ও নবাবদের আমলকে একটু স্পর্শ করেই ক্ষান্ত হয়েছে। এই দীর্ঘকালের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আরো বহু কথা বলার সুযোগ ছিল। পূর্বোক্ত ফারসী গ্রন্থ দুটি ছাড়াও, স্যর যদুনাথ কর্তৃক অনূদিত *Bengal Nawabs*, সলিমুল্লার 'তারিখ-এ-বাঙ্গালা', *Fifth Report* এবং বিদেশী বণিকদের রাশি রাশি দলিল-দস্তাবেজ শাসন প্রণালী সংক্রান্ত তথ্যে পরিপূর্ণ। আর্থনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে লেখক কিছুই বলেননি; মানরিক, বাওরী ও বার্নিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে কয়েকটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন।

মোগল ও নবাবী আমলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও আর্থনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে ডঃ মজুমদারও কতকগুলো স্থূল এবং অত্যন্ত অপ্রচুর তথ্যকে সঙ্কলিত করেছেন।

পাঠক সমাজকে তিনি যেন বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই কাঁচা মালই আর্থনীতিক ইতিহাস। আমরা শুধু ভাবি, এই উপমহাদেশের আর্থনীতিক ইতিহাস কবে সমাজ-তত্ত্বের দৃঢ় ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

'বাঙলা দেশের ইতিহাসে' ডঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'সংস্কৃত সাহিত্য' শীর্ষক অধ্যায়ে বেশ কিছুসংখ্যক গ্রন্থকার ও গ্রন্থের উল্লেখ আছে; কিন্তু এই নিরেট ফিরিস্তি কোন্ উদ্দেশ্যে এই ইতিহাস-গ্রন্থে স্থান পেয়েছে? তবে, সুখময় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত বাংলা সাহিত্য সংক্রান্ত অধ্যায়টিতে এক-আধটুকু আলোচনা আছে। কিন্তু দু'জন লেখক স্থান ও কালের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আদৌ কোনো চেতনার পরিচয় দিতে পারেননি বলে অধ্যায় দুটি মধ্য-যুগের বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপর আলোকপাত করতে সক্ষম হয়নি। ডঃ দানীর *Muslim Architecture in Bengal* এবং অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঁকুড়ার মন্দির' নামক গ্রন্থ থেকে গৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে স্থাপত্যশিল্পের অধ্যায়টি লিখিত। তাতে লেখকের নিজস্ব কোনো বিচার-বিশ্লেষণ ও অভিমত স্থান পায়নি। তবু অধ্যায়টির মূল্য আছে এই জন্য যে, বাংলা ভাষায় রচিত শিল্পকলার গ্রন্থ বা প্রবন্ধ অত্যন্ত সীমিত।

ডঃ মজুমদারের একটি আকস্মিক মন্তব্যে রীতিমত চমকে উঠতে হয়: 'মুসলমান আগমনের পূর্বেও ভারতীয় স্থপতিগণ যথার্থ খিলান বা **true arch** নির্মাণ করতে পারত; তবে যে কোনো কারণেই হোক না কেন, খিলান তৈরীর কাজে তারা বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি। ডঃ মজুমদার একটিমাত্র উদাহরণ দিয়েও যদি এ বিষয়ে একটু আলোকপাত করতেন, তবে তা অত্যন্ত মূল্যবান আবিষ্কার হিসেবে অভিনন্দিত হত। অজন্তার চৈত্যকক্ষের তোরণে ব্যবহৃত অশ্বত্থ পাতার আকৃতির তথাকথিত খিলান এবং বৌদ্ধ স্তূপে ব্যবহৃত কুলুঙ্গি-পটহ যথার্থ খিলান নয়। বলা হয়েছে যে, হিন্দু মন্দিরের ঢেউ খেলানো খিলানে **(cusped arch)** মুসলিম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শুধু এই কথাটুকু বলে ক্ষান্ত হলে বক্তব্য অসমাপ্ত থেকে যায়। বাংলাদেশের মন্দিরে ব্যবহৃত খিলানের সমগ্র ধারণাটাই মুসলমানদের সৃষ্টি। ডঃ মজুমদারের মতে মন্দির-শিল্পে মুসলমান প্রভাব খুব বেশী নয়। কিন্তু খিলানের গুরুত্বই কি কম? এটি স্থাপত্য-শিল্পের একটি সাংগঠনিক রীতি যার মাধ্যমে সমগ্র ইমারতের ভার দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে দেওয়ালের মধ্য দিয়ে মৃত্তিকায় চলে যায়। চৌকাঠ শীর্ষকের **(lintel)** স্থানে খিলানের ব্যবহার তাই হিন্দু শিল্পের উপরে বিপ্লবাত্মক মুসলিম প্রভাবের ইঙ্গিত দেয়। মন্দিরের প্রধান কক্ষের তিনদিক বেষ্টন ক'রে অলিন্দ নির্মাণ, বাংলা ঘরের অনুকরণে মন্দিরের

ছাঁচা ও কার্নিশ, দোচালা ও চৌচালা মন্দির নির্মাণ এবং বাঁশের বেড়ার অনুকরণে মন্দিরের দেওয়ালের উপর অঙ্কিত অসংখ্য আয়তক্ষেত্রের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অলঙ্করণও বোধ হয় মুসলিম প্রভাবের নির্দেশক।

ডঃ রায়ের গ্রন্থটিতে সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কিত যে অধ্যায়টি আছে, তাতে শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে যদি এক-আধটুকু আলোচনা থাকত, তা হলে অংশটি পরিপূর্ণতা লাভ করত। বৈষ্ণব ধর্ম, পরকীয়া মতবাদ, ও শাক্ত-তান্ত্রিক ধর্ম সম্বন্ধেও খুব সংক্ষেপে হলেও লেখক কিছু কথাবার্তা বলেছেন। কয়েকটি সুফী সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাদের তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নীরব। বাউলদের সম্বন্ধে লেখকের অসম্বদ্ধ মন্তব্য থেকে এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারা যায় না। খুব সম্ভব, বৌদ্ধ-তান্ত্রিক মতবাদ থেকেই বাউলদের উদ্ভব। সুফী মতবাদের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক থাকলে তা এদের পারিভাষিক শব্দগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ কথা অবশ্য বলা দরকার যে ডঃ রায়ের গ্রন্থে বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্বন্ধে কোনো বিশদ বিবরণ আশা করা উচিত নয়, কারণ বইটি লেখা হয়েছে প্রধানতঃ মোগল আমলের রাজনৈতিক অবস্থার উপর।

ডঃ মজুমদারের কতকগুলো মন্তব্য এবার পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। (ক)—চৈতন্য কোনো তত্ত্বমূলক গ্রন্থ রচনা করেননি—এ কথা সত্য। তবে তিনি একটি তত্ত্বমূলক পদের রচয়িতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন, এই পদটি 'শিক্ষাষ্টক'রূপে অভিহিত। এটি সুশীল দে সম্পাদিত 'পদ্যাবলী'তে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য-চরিতে স্থান পেয়েছে। (খ)—বৈষ্ণব ধর্মে জাতিভেদ ছিল না—এই সামান্যীকরণ মেনে নেয়া মুশকিল। চৈতন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ-রীতি এবং একত্রে বসে খাওয়া-দাওয়ার প্রথা প্রবর্তন করেননি। (গ)—অল্পসংখ্যক মুসলমান বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল—। বাংলা বা সংস্কৃতে লেখা যে কয়টি চৈতন্য-চরিত আছে, তার কোনোটিতেও এ কথার আভাস পর্যন্ত নেই। হরিদাস ছিলেন হিন্দুর সন্তান, কিন্তু মুসলমানের গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন বলে তাঁকে 'যবন' বলা হত। শ্রীবাসের বাড়ীর মুসলমান দর্জিও বৈষ্ণব মত গ্রহণ করেনি, শুধুমাত্র নাম-সঙ্কীর্তনে যোগ দিয়েছিল। (ঘ)—চৈতন্য বৈষ্ণবগণকে নারী সমাজের আওতা থেকে দূরে সরে থাকতে বলেছিলেন—। তাঁর অনুগ্রহপ্রাপ্ত নিত্যানন্দ ছিলেন অবধূত বা বৌদ্ধ তান্ত্রিক। তাঁর মাধ্যমেও বৈষ্ণব ধর্মে পরকীয়া প্রেম প্রচলিত হওয়া অসম্ভব ছিল না। এই প্রসঙ্গে বিধবা নারায়ণীর গর্ভে এবং খুব সম্ভব নিত্যানন্দের ঔরসে বৃন্দাবন দাসের জন্ম-সংক্রান্ত কেলেঙ্কারীর কথা মনে করা যেতে পারে। যখন ষোল শতকের দ্বিতীয়ার্ধে

'রসকদম্ব' রচিত হচ্ছিল, তখন বোধ হয় পরকীয়া তত্ত্ব রীতিমত দানা বেঁধেছিল। আমরা আশা করেছিলাম যে গৌড়ের ও বৃন্দাবনের বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যেকার যোগাযোগ সম্বন্ধে ডঃ মজুমদার একটু আলোকপাত করবেন। (ঙ)—ধর্মপূজা বৌদ্ধধর্মের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ—। এই মতের প্রবক্তা ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বর্তমান যুগে এই মতটি সেকেলে। ধর্মঠাকুরের জটিল প্রকৃতি সম্বন্ধে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ সুকুমার সেনের মতামত দ্রষ্টব্য (*B.C. Law Volume. pt, 1*, এবং রূপরামের 'ধর্মমঙ্গলে'র ভূমিকা)। (চ)—চৈতন্য বাঙ্গালী হিন্দুকে পৌরুষ দান করেছিলেন—। এই বিবৃতির সঙ্গে পঠিতব্য ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য— দেশে বাহুবলের বিলুপ্তির ব্যাপারে "ভক্তিধর্মের প্রসারও কতকটা দায়ী।···ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সেই ধর্ম জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যে দেশে নিবীর্যতা আনবার সুযোগ দিয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।···প্রতাপরুদ্র দেব শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হয়ে পড়ায় এবং উড়িষ্যায় বৈষ্ণব ধর্মের দ্রুত প্রসারের ফলে দুই পুরুষের মধ্যেই গজপতি বংশের পতন হ'ল"। (ছ)—স্মৃতিগ্রন্থে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়—। উক্ত নিবন্ধসমূহে বিধৃত ব্যবস্থাবলী অত্যন্ত আদর্শায়িত। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সমাজ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে এই জটিল বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলতে পারতেন কি না, সে বিষয়ে রীতিমত সন্দেহের অবকাশ আছে; নিম্নবর্ণের লোকজনের পক্ষে ঐ বিধিবদ্ধতার দুর্গে বন্দী হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এ প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটি আমাদের মনে জাগে এবং যে প্রশ্নটি ডঃ মজুমদারের মনে জাগেনি, সেটি হল—মুসলমানের আগমনের পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে আঠার শতক পর্যন্ত এত স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়নের কারণ কি? (জ)—হিন্দুর জাতি মারাই মুসলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধির কারণ—। এই কথাটি অতি জটিল একটি সমাজতাত্ত্বিক সমস্যার অতিমাত্রায় সরলীকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। উচ্চ শ্রেণীর অত্যাচারে নিম্নশ্রেণীর লোকের ইসলাম গ্রহণ, বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় ইসলাম গ্রহণ, সুফী-দরবেশদের প্রভাবে পড়ে ইসলাম গ্রহণ, আদিম গোত্রের দলপতির ইসলাম গ্রহণের ফলে গোত্রের সমগ্র লোকগোষ্ঠীর ইসলাম গ্রহণ এবং আরো বহুবিধ কারণে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছিল বলে ধরে নেয়া যায়। কুলজী পঞ্জিকার তথ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলে বলা যায় যে 'যবন-দোষ' ঘটলেও লোকজনকে সমাজের গণ্ডীর মধ্যে ধরে রাখবার ব্যবস্থা হত মেল-বন্ধনের মাধ্যমে। (ঝ)—হিন্দুগণ উচ্চপদের চাকুরী থেকে বঞ্চিত হয়েছিল—। জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহের আমলের বৃহস্পতি মিশ্র ও তাঁর সন্তান-সন্ততিগণ, বারবক শাহের আমলের মালাধর বসু ও কেদার

রায়, হোসেন শাহের আমলের রূপ, সনাতন, জীব, কেশব ছত্রী, রামচন্দ্র খান, যশোরাজ খান, দামোদর, জগাই-মাধাই, আকবরের আমলের মানসিংহ—এই কর্মচারীদের প্রায় সবাই উঁচুপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৈষ্ণব দর্শনের উপর লিখিত একটি গ্রন্থে সনাতন নিজেই বলেছেন যে, তিনি আলাউদ্দীন হোসেন শাহের 'মহামন্ত্রী' ছিলেন। (ঞ)—হিন্দু জনসাধারণ 'জিজিয়া' কর প্রদানে বাধ্য ছিল এবং মুসলমানের কাছ থেকে আদৌ 'জাকাত' আদায় করা হত কি না, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে—। এই দুই শ্রেণীর কর সম্বন্ধে ডঃ মজুমদারের উপরোক্ত অভিমত তাঁর বিশেষ একটি প্রবণতার পরিচয় দেয়। বোধ হয় তিনি মনে করেছেন যে, মুসলিম শাসনের অর্থই হচ্ছে হিন্দুর উপর অত্যাচার। অত্যাচারী শাসকগণ 'জিজিয়া' আদায়ের মধ্য দিয়ে হিন্দুর উপর জুলুম চালিয়েছিলেন এবং মুসলমান প্রজাদেরকে 'জাকাত' থেকে রেহাই দিয়ে স্বধর্ম-প্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। প্রাক-মোগল যুগের শাসন-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "...অমুসলমানদের নিকট হইতে 'জিজিয়া' কর আদায় করা হইত বলিয়া কোনো প্রমাণ মেলে না।" মোগলযুগ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে। আলোচ্য সময়ে হিন্দুরা সামরিক বিভাগে প্রবেশ করতে পারত; সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে 'জিজিয়া' প্রদান করা—এই দুটি বিধি ইসলামের প্রাথমিক যুগের রীতি অনুযায়ী পরস্পরবিরোধী। রাজস্ব বিভাগের কর্মচারিগণ কিরূপ নির্মমভাবে 'জাকাত' আদায় করতেন, তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন শায়েস্তা খানের সমসাময়িক লেখক শিহাব-উদ-দীন তালিশ। 'জাকাত' ও 'জিজিয়া' সম্বন্ধে ডঃ মজুমদার যা কিছু বলেছেন, তার সবটুকুর ভিত্তি হচ্ছে তাঁর সযত্ন-লালিত পূর্ব-ধারণা। (ট)—বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ ছাড়া অন্য কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না—। 'অন্য কোনো' প্রভাব বলতে ডঃ মজুমদার কি বুঝাতে চেয়েছেন, তা জানবার উপায় নেই। তিনি যদি বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের প্রভাব সম্বন্ধে ঐ কথা বলে থাকেন, তা হলে, এই ধারণাও টিকবে না। মধ্যযুগের কাব্য সাহিত্যে যথেষ্ট Perso-Arabic উপকরণ খুঁজে পাওয়া যায়।

বাংলার কাব্য সাহিত্যে মুসলমান কবিগণই "প্রথম স্মরণীয় secular বা ধর্ম-সংস্কার-মুক্ত মানবীয় প্রণয় কাব্য" রচনা করেন (গোপাল হালদার : বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখা, প্রথম সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৬৩)। তা ছাড়া আরবী-ফারসী শব্দ গ্রহণের ফলে বাংলা ভাষার শব্দকোষ যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। আরবী-ফারসী শব্দ ঠিকমত ব্যবহার করতে জানলে যে ভাষার প্রসাদগুণ বেড়ে যায়, তার প্রমাণ আছে ভারতচন্দ্রের ও মোহিত লাল

মজুমদারের কবিতায়। (ঠ)—হিন্দুর সাহিত্য, সংস্কৃত থেকে এবং মুসলমানের সাহিত্য, ফারসী থেকে প্রেরণা পেয়েছে—। সাবিরিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দর', আলাওলের 'পদ্মাবতী' ও দৌলত কাজির 'সতীময়না ও লোর-চন্দ্রানী' ফারসী গ্রন্থ থেকে আসেনি, ভারতীয় ভাষা থেকেই অনূদিত হয়েছে। মুসলিম সাহিত্যিক-দের লেখা নিবন্ধগুলিতে যোগ-তত্ত্বের যে বিরাট জগৎ দেখা যাচ্ছে, তা ফারসী ভাষা থেকে ধার করা নয়। (ড)—সুবাদারগণ অবাঙ্গালী ছিলেন বলে এ দেশের টাকা নিয়ে নিজেদের দেশে চলে যেতেন—। ডঃ মজুমদার বোধ হয় লক্ষ্য করেননি যে, **escheat** প্রথা প্রচলিত ছিল বলে রাজকর্মচারিগণ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলে বা ইস্তফা দিলে প্রাদেশিক সরকার তাদের ধন-সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ নিয়ে সেই ধনকে কোষাগারে জমা দিত। মোগল কর্মচারিগণ সেইজন্য ধন সঞ্চয় না করে জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করতেন এবং এ দেশের টাকা এ দেশেই ব্যয় করতে বাধ্য হতেন। (ঢ)—হ্যামিলটন হুগলির উল্লেখ করেছেন, সাতগাঁয়ের উল্লেখ করেননি—। ষোল শতকের প্রথমার্ধেই সাতগাঁয়ের আশেপাশে পলিমাটি জমে নদীর স্রোতধারা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে সমুদ্রগামী জাহাজ সেখানে আসতে পারত না। এইরূপে সাতগাঁয়ের বাণিজ্যিক গুরুত্ব লোপ পায়। একথা বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা থেকে জানতে পারা যায়। (ণ)—সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকে মোগল মুদ্রা এ দেশে প্রচলিত হয়—। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের আমলে যে সকল মুদ্রা বাঙলাদেশে চালু হয়েছিল, সেগুলির বহু নমুনা ও চিত্র বিভিন্ন ক্যাটালগে ও যাদুঘরে স্থান পেয়েছে। পাল ও সেন রাজাদের আমলে মুদ্রা প্রচলিত ছিল বলে মনে হয় না; কিন্তু মুসলমানগণ এ দেশে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই মুদ্রা অঙ্কিত হতে লাগল। মুদ্রা-তত্ত্বের এই সমস্যা লক্ষ্য করে ডঃ মজুমদার বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। পণ্ডিতগণ অনুমান করেছেন যে, হয়ত বা রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের সঙ্গে পশ্চিমের বাণিজ্যিক সূত্র ছিন্ন হয়ে যায় এবং বাঙলাদেশের বহির্বাণিজ্যে ভাটা পড়ে বলে মুদ্রার বিশেষ আবশ্যকতা দেখা দেয়নি। এ যুগের তাম্র শাসনে রাজসভায় বণিক প্রতিনিধিদের অস্তিত্ব পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যদি তর্কের খাতিরে বলা যায় যে, বাঙলাদেশ অন্তত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে ব্যবসার সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল, তা হলে এক্ষেত্রে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে।

মুসলমান সুলতানগণ মুদ্রাঙ্কনের প্রতি জোর দিতেন এই জন্য যে, মুসলিম জগতে মুদ্রাকে স্বাধীন শাসকের সার্বভৌমত্বের প্রতীক বলে মনে করা হত।

বাঙলাদেশে এই কারণে প্রায় মুসলিম শাসনের প্রাথমিক যুগ থেকেই মুদ্রা চালু হয়। এই যুগ পূর্ববর্তী পাল বা সেন যুগ থেকে একটুখানি বিভিন্ন। পূর্ববর্তী যুগে বহির্বাণিজ্যে ভাটা পড়ায় বাঙলাদেশ সম্ভবত কৃষিনির্ভর হয়ে পড়েছিল এবং নাগরিক সভ্যতাও সেইজন্য দুর্বল হয়েছিল। মুসলমান আমলে মুদ্রা প্রচলনের ফলে আবার এ দেশে বহির্বাণিজ্য শুরু হল এবং বহির্জগতের সঙ্গে আবার বাঙলা-দেশের যোগসূত্র স্থাপিত হল; নাগর সভ্যতাও ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করতে লাগল। এ কথার সমর্থনে বলা যায় যে পাল-সেন আমলে কোনো সমৃদ্ধ সমুদ্র-বন্দর বা নদী-বন্দরের সন্ধান মেলে না; কিন্তু মুসলমান আমলে সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও, শ্রীপুর প্রভৃতি বন্দরের উদ্ভব হয়। ডঃ মজুমদার মধ্যযুগের বাঙলা কাব্য থেকে বাঙলার ব্যবসা-বাণিজ্যের যে চিত্রটি পেয়েছেন, তা মধ্যযুগের চিত্র কি না, সেকথা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। সম্ভবত অতি প্রাচীন কোন যুগের (হয়ত বা 'গঙ্গা হৃদি' (**Gangridoi**) যুগের ?) স্মৃতির উপরে কবিগণ এক পোঁচ রঙ চড়িয়েছেন। এ যুগের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে ধারণা করতে হলে বিদেশী পর্যটকদের উপর নির্ভর না করে উপায় নেই।

সুফী মতবাদ হয়ত কোনো নতুন তথ্য বয়ে আনেনি; কিন্তু সুফী মতবাদের আবেগঘন ঐতিহ্য বেদান্তে নেই। ভারতীয় অদ্বৈতবাদ জ্ঞাননির্ভর। আবেগের ঐতিহ্য দেশে না থাকলে শ্রীচৈতন্যের মানবীয় অনুভূতি মিশ্রিত বৈষ্ণব আন্দোলন আদৌ সম্ভব হত কি না, কে জানে।

মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে হিন্দু জমিদারদের উদ্ভব হয়—এই ঋজু উক্তি শুনে মনে হয় যে, জমিদার শ্রেণীর উৎপত্তি বোধ হয় নিতান্ত আকস্মিক। প্রাক-মোগল যুগেও একটি ভূমি-নির্ভর মধ্যবিত্ত সমাজের সন্ধান মেলে। আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী'তে কিছু সংখ্যক কায়স্থ জমিদারের উল্লেখ করেছেন। তাদের ভূমি-ব্যবস্থা ও সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের গ্রন্থে হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য মুসলিম প্রশাসন ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে এ কথা বলা যায়না। অতি পরিচিত তথ্যরাশিকে প্রায়ই অগ্রাহ্য করে রমেশচন্দ্র মজুমদার মাঝে মাঝে মুসলিম শাসন সম্বন্ধে যে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন তাতে সত্যনিষ্ঠার পরিচয় কমই পাওয়া যায়; বরং তাতে বিশেষ একটি প্রবণতাই স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। আলোচ্য গ্রন্থসহ অসংখ্য লেখায় তিনি সোচ্চার হয়ে বলেছেন: হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সব সময় বিভেদ ও বিরোধের সম্পর্ক ছিল এবং তার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির কোনো অংশ সমন্বয়ের মাধ্যমে গড়ে ওঠেনি;

বাংলা ভাষা-সাহিত্য মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি এবং মুসলমানদের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল নিষ্ঠার সঙ্গে হিন্দুদের উপর নির্যাতন চালিয়ে যাওয়া।[১] বিদেশী, বিজাতি ও বিধর্মী মুসলমানদের শাসনের প্রতি ভারতীয় হিন্দু হিসেবে রমেশ চন্দ্র যে বিদ্বিষ্ট মনোভাব পোষণ করেন তাঁর বহু লেখায় এমনিভাবে সেই মনোবৃত্তিরই প্রতিফলন ঘটেছে। তথাকথিত হিন্দু "স্বাধীনতার প্রতীক" ত্রিপুরা ও কোচ বিহার রাজ্য সম্বন্ধে তাঁর গর্ববোধ এবং শ্রীচৈতন্য কর্তৃক "সকল ভুবন" নির্যবন করার অভিযান সম্বন্ধে তাঁর নগ্ন উল্লাস কয়েকটি ঐতিহাসিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর যে মনোবৃত্তির পরিচয় দেয় তা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ—খুব সম্ভব তা এক ধরনের গোঁড়া হিন্দু জাতীয়তাবাদের সঙ্গে অভিন্ন। এই জাতীয়তাবাদের উন্মেষ প্রথম দেখা যায় *History of Bengal*, **vol. I** গ্রন্থের গৌড় রাজ শশাঙ্ক প্রসঙ্গে। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে আনীত বৌদ্ধ-নির্যাতন ও রাজ্যবর্ধন-হত্যার অভিযোগ খণ্ডনে রমেশ চন্দ্র প্রয়াসী হয়েছেন নির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে নয়, বরং বিশেষ একটি নাস্তিসূচক দৃষ্টিকোণ থেকে। যে সকল ঐতিহাসিক শশাঙ্কের বৌদ্ধ-নির্যাতনের ঘটনাকে জরুরী রাজনৈতিক কারণের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখতে চেয়েছেন, তাঁদের সেই যুক্তিগ্রাহ্য প্রবণতাকে তিনি "সাম্প্রদায়িক স্বার্থের খাতিরে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জনের সামিল" (to sacrifice national for the sake of sectarian interests) বলে অভিহিত করেছেন। খুব সম্ভব হিন্দু রাজা শশাঙ্কই এ ক্ষেত্রে হিন্দু জাতীয়তার প্রতীক রূপে এবং হর্ষবর্ধন-রাজ্যবর্ধন ও মগধের বৌদ্ধগণ তার প্রতিপক্ষরূপে গৃহীত হয়েছেন। রমেশচন্দ্রের দৃষ্টিতে মুসলমান আমলের হিন্দু জাতীয়তা বা ভারতীয় জাতীয়তার প্রতিপক্ষ মুসলমান শাসকগণ এবং হয়ত বা ভারতীয় মুসলমান জনসাধারণ। তাঁর মতে ভারতীয় সংস্কৃতি মূলতঃ হিন্দু সংস্কৃতি এবং মুসলিম সংস্কৃতি এই সংস্কৃতির প্রতিপক্ষ। সেইজন্য মুসলিম সংস্কৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও ভারতের মুসলমান সভ্যতা সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র অত্যন্ত সীমিত আগ্রহই দেখিয়েছেন এবং দ্বিজাতি-তত্ত্ব নিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাথা ঘামিয়েছেন। পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা লক্ষ্য করব, রমেশচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের ধারণা থেকে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের জাতীয়তাবাদী প্রবণতা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার

এক

ঐতিহাসিকদের প্রবণতা ও ইতিহাসের সমস্যার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে তাঁদেরকে জাতীয়তাবাদী, প্রশাসক, মিশনারী প্রভৃতি শ্রেণী-বিভাগে চিহ্নিত করা আজকের দিনে রীতিমত রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। স্যর যদুনাথকে[১] জাতীয়তাবাদী বলা যায় কি না, সেটি একটি জরুরী প্রশ্ন। প্রশাসনিক স্বার্থ কিংবা স্বধর্মপ্রীতি তাঁর রচনাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তবে জাতীয়তাবাদও তাঁর ইতিহাস-চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে সব সময় কাজ করেছে বলে মনে হয় না। সত্য-সন্ধানী, এই অভিধেয়ই তাঁর প্রতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সত্যের স্বরূপ বুঝবার জন্য সন্ধান-কার্য শুরু হয়েছিল তাঁর ছাত্র জীবনেই, যখন তিনি কতকগুলি ইংরেজী বই পড়ে টিপু সুলতানের পতন-সংক্রান্ত ঘটনা জানতে গিয়ে সন্তোষজনক ফল পাননি।[২] এই সন্ধান-কার্যের পরিসমাপ্তি ঘটে তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে—যখন মোগল যুগের উপর তাঁর লেখা কয়েকটি মনোগ্রাফ প্রকাশিত হয়।[৩]

স্যর যদুনাথ কর্তৃক রচিত ইতিহাসের ধারা ষোল শতক থেকে শুরু করে উনিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত প্রলম্বিত। সুদীর্ঘ কালের ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে ঐতিহাসিকের নিবিড় পরিচয় ছিল বলেই তাঁর লেখা *History of Aurangzib, Fall of the Mughal Empire* এবং *Shivaji and His Times*[৪] কোনো নিরেট ও সীমিত চিত্রের মত নয়। বইগুলিতে আমরা পাই অতীতের সামগ্রিকতা সম্বন্ধে যাথানুপাতিক ধারণা—পাই ইতিহাসের এমন এক ব্যাপক ভূ-দৃশ্য যাতে বিগত দিনের চেহারাটি সব রকমের রূপ-রেখা-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শসহ ধরা পড়েছে। যদুনাথ বোধ হয় জার্মান ঐতিহাসিক **Ranke**-এর মত মনে করতেন যে, অতীতের ঘটনাকে নিছক ঘটনা রূপে (**as it actually happened**) জানতে পারা সম্ভব। যাঁরা ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছেন, তাঁর লেখায় আমরা তাই তাঁদের আশা-নৈরাশ্য, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, মানবীয় মহত্ত্ব ও দুর্বলতা এবং ভ্রান্তির চিত্রধর্মী বর্ণনা পাই। এই চিত্রধর্মের সঙ্গে মিলেছে এক সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য : মোগলদের পতনের ইতিহাস যেন এক বিয়োগান্ত নাটক। আওরঙ্গজেবের সমগ্র জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে একটি বিয়োগান্ত নাটক রূপে যার বিভিন্ন অঙ্ক ও দৃশ্য দর্শকের মনে তীব্র অনুভূতির সৃষ্টি করে।[৫] দাক্ষিণাত্যের

কার্যকলাপের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে সম্রাটের জীবনের চূড়ান্ত ব্যর্থতা এবং যুবরাজ মুহম্মদ আকবরের বিদ্রোহের মধ্যেই আছে কোনো এক নির্মম নিমেসিসের অদৃশ্য হস্ত। ইতিহাসে নাটকীয় আবহ সৃষ্টির অনুপ্রেরণা এসেছে ঐতিহাসিকের সাহিত্যধর্মী মানসিকতা থেকেই।

যদুনাথের বোধ হয় ধারণা ছিল যে, তুচ্ছ ও গুরুত্বপূর্ণ সর্ব প্রকার ঘটনা মিলেই ইতিহাসের সামগ্রিকতা গড়ে ওঠে এবং প্রতিটি ঘটনাই ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় কারণিক প্রভাব বিস্তার করে। এই জন্য ইতিহাসের প্রক্রিয়াকে নিবিড়ভাবে বুঝতে হলে সব রকমের ঘটনারই বিশ্লেষণ নিতান্ত প্রয়োজন। পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটনা-বিশ্লেষণের মধ্যেই এই ইতিহাস-দর্শন সুস্পষ্ট। এগুলিতে ক্ষুদ্র ঘটনা ও তুচ্ছ উপকরণও উপেক্ষিত হয়নি। ইতিহাসের ঘটনা ও বিভিন্ন শক্তির মধ্যকার জটিল সম্পর্কের গ্রন্থি লেখক যেন নৈপুণ্যের সঙ্গে খুলে দিয়েছেন।

Literary flavour-এর দিক দিয়েই হয়ত স্যর যদুনাথ **Bengali Gibbon**;[৬] তাঁর *Fall of the Mughal Empire* সিরিজ **Irvine**-এর *Later Mughals*,[৭] -এর পরিপূরক এবং বিষয়বস্তুর বিন্যাসে এবং আলোচনার ব্যাপক ভঙ্গিতেও এতে **Irvine**-এর প্রভাব আছে বলে মনে হয়। **Irvine**-এর গ্রন্থটির সমালোচনার অংশ বিশেষ উল্লেখ করে স্যর যদুনাথ বলেছেন:[৮]

> **The same woodcraft has been followed in this continuation of that work, but the jungle is much thicker here.**

তিনি ইংরেজ লেখকের গ্রন্থটির সম্পাদনা করে এবং এতে নাদির শাহের ভারত আক্রমণ সংক্রান্ত ইতিহাস সংযোজনা করে একে পরিপূর্ণ করে তুলেছেন এবং মানুষ ও ঐতিহাসিক হিসেবে **Irvine**-এর প্রশংসা করে তাঁর নাতিদীর্ঘ জীবনীও লিখেছেন।[৯] গবেষক জীবনের শুরুতে তিনি উক্ত ইংরেজ ঐতিহাসিকের কাছে থেকেই **help, guidance and light on obscure points** পেয়েছেন।[১০] ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে এসে **Irvine**-এর গ্রন্থটি শেষ হয়েছে। ঐ তারিখ পর্যন্ত নামে এবং কার্যে ভারতের শাসনকেন্দ্র ছিল শুধু একটি। সেইজন্য বইটি লিখতে গিয়ে **Irvine** যে সুবিধা ভোগ করেছেন, স্যর যদুনাথের ভাগ্যে তা জোটেনি। নাদির শাহের ভারত আক্রমণের পর থেকে মোগল সাম্রাজ্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্রুতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে এবং অনেকগুলি স্বাধীন শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় যাদের মধ্যকার সম্পর্কগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরবর্তীকালের ইতিহাসকে জটিল করে তোলে। স্যর যদুনাথ এই জটিলতা কমিয়েছেন ক্রমাগত দিল্লীর সঙ্গে অন্যান্য

অঞ্চলের ইতিহাসের সূত্র গ্রথিত করে। Irvine-এর গ্রন্থের তুলনায় *Fall of the Mughal Empire*-এ ঘটনা-বৈচিত্র্য যেমন বেশী, ব্যবহৃত মাল-মশলার পরিমাণও তেমনি বিপুল এবং তেমনি তা আবার অসংখ্য উৎস থেকে সঙ্কলিত। আরো যে কয়জন ঐতিহাসিকের লেখা যদুনাথ সরকারের মানস গঠনে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল, তাঁরা হচ্ছেন: **Clarendon, Robertson, Hume, Macaulay, Carlyle, Motley, Froude, Lecky** এবং **Green**।[১১] এক **Green** ছাড়া এঁদের লেখা মূলতঃ রাজনৈতিক ইতিহাস। এই লেখকদের প্রভাবে রাজনৈতিক ইতিহাসকেই গবেষণার ক্ষেত্ররূপে বেছে নেয়া যদুনাথের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল। উনিশ শতকে, এমন কি বিশ শতকের প্রথম দিকেও, ইন্দো-মুসলিম রাজনৈতিক ইতিহাস ছিল প্রায় সম্পূর্ণ অলিখিত। স্যর যদুনাথের মনে মোগল আমলের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার তাগিদ এসেছিল অন্ততঃ আংশিকভাবে এই শূন্যতা থেকেই। আজকের দিনে যখন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস লেখার প্রতি ঝোঁক ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, তখন রাজ-রাজড়ার ইতিহাসের গুরুত্ব হয়ত সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারা মুশকিল। রাজনৈতিক ইতিহাসে রাষ্ট্রকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপিত করা হয় এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাষ্ট্র থেকেও প্রবলতম কারণিক প্রভাব জন্ম দিয়ে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করেছে। স্যর যদুনাথ যদি মধ্যযুগের রাজনৈতিক ইতিহাস না লিখতেন, তবে এ যুগের সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রস্তুতিও বিলম্বিত হত, কারণ সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা রাষ্ট্রিক কাঠামো সম্বন্ধে ধারণার স্পষ্টতার উপরে অনেকটা নির্ভরশীল। আলোচ্য ঐতিহাসিকের লেখায় আমরা কান্দাহার থেকে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মীর থেকে কর্ণাটক পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ডের ইতিহাসের **three dimensional view** পেয়ে থাকি।

দুই

স্যর যদুনাথ প্রথম যে বইটি লেখেন, তার নাম *India of Aurangzib (Topography, Statistics and Road)*[১২]; এটি ইতিহাস নয়; কিন্তু এতে ইতিহাসের মাল-মশলা আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। 'খুলাসাত-উত-তাওয়ারিখ' (১৬৯৫), 'দসতুর-উল-আমল' (১৭০০?), 'চাহার গুলশান' (১৭২০?), 'আইন-ই-আকবরি' (১৫৮৫) এবং Tieffenthaler-এর *Geographie de L'Indoustan* (Bernoulli-এর ফরাসী সংস্করণ)-এর ভিত্তিতে এ গ্রন্থে মোগল যুগের ভূমিসংস্থা, পরিসংখ্যান ও পথঘাটের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এতে আছে মোগল সাম্রাজ্যের সুবা ও

তাদের বিভাগসমূহ, রাজস্ব, জরিপ করা জমির পরিমাণ, প্রাকৃতিক অবস্থা, কৃষি ও শিল্প, খনিজ ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য, জনসাধারণের আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় বিশ্বাস ও উপাসনা-পদ্ধতি, মসজিদ, মন্দির, সাধু-সন্ত জন, মেলা এবং আরো কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিশদ বর্ণনা। দিল্লী থেকে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সুগম করার জন্য যে সকল সড়ক নির্মিত হয়েছিল, তাদের উপরকার স্থানসমূহের অবস্থান নির্ণীত হয়েছে মানচিত্র ও **gazetteer**-এর সাহায্যে।

উনিশ শতকের শেষার্ধে ইংরেজ কর্মচারিগণ **gazetteer** এবং **statistical account** লিখেছিলেন প্রচুর পরিমাণে। এ জাতীয় লেখা দেখেই বোধ হয় স্যার যদুনাথ মনে করেছিলেন যে, মোগল যুগের ভারত সম্বন্ধে অনুরূপ রচনার আবশ্যকতা আছে। তা ছাড়া 'আইন-ই-আকবরি' ছিল তাঁর কাছে অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস। **Gazetteer** শ্রেণীর গ্রন্থ যেমন ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনীতিবিদের কাজে লাগে, মোগল আমলের সামাজিক বা রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোচনাতেও *India of Aurangzib* তেমনি অপরিহার্য। যে দেশের ইতিহাস অল্প দিনের মধ্যেই যদুনাথ লিখতে যাচ্ছিলেন, এ গ্রন্থে যেন সেই দেশের মাটিকেই তিনি সচেতনভাবে জরিপ করেছেন। বইখানি মোগল আমলের ইতিহাস রচনার প্রস্তুতি-পর্বরূপে চিহ্নিত হতে পারে।

History of Aurangzib গ্রন্থের শুরুতে বা অন্য কোনোখানে সমগ্র ভারতের ভৌগোলিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনো বিবরণ নেই। *India of Aurangzib*-ই ন্যায়সঙ্গতভাবে এ জাতীয় বিবরণের স্থান গ্রহণ করতে পারে। আওরঙ্গজেব ও শিবাজীর রাজত্ব প্রসঙ্গে বিভিন্নভাবে বর্ণিত বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক ও আর্থনীতিক অবস্থা এবং ইতিহাসের ধারার উপরে তার প্রভাব (যেমন—বলখ্, বদখ্শান, কান্দাহার, গুজরাট, আসাম, মারওয়ার, মহারাষ্ট্র, সুরাট, বিজাপুর, হায়দরাবাদ, বাংলাদেশ, মালওয়ার বর্ণনা) মোগল ও মারাঠা ইতিহাসের আলোচনায় গভীরতা সৃষ্টি করেছে এবং তাতে করে ইতিহাসের তাৎপর্য ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। *India of Aurangzib*-এ দেখি এই ভূগোল-জ্ঞানের উন্মেষ ও বিকাশ। ভূগোলে যদুনাথের শিক্ষানবিশী বৃথা যায়নি।

ঐতিহাসিক যদুনাথের মানসিক প্রস্তুতির প্রতি দৃষ্টি রেখে এর পরেই যে বইটির নাম নিতে হয়, সেটি হচ্ছে *Economics of British India,*[১৩] অর্থনীতির বই হিসেবে এতে যথেষ্ট অপূর্ণতা আছে। যদুনাথ নিজেও মুখবন্ধে বলেছেন যে জ্ঞানের তৎকালীন পর্যায়ে ভারতীয় অর্থনীতির উপর লেখা কোনো রচনা ইতিহাস ও ভবিষ্যদ্বাণীর সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। গ্রন্থটির গুরুত্ব এই

জন্য বেশী যে, এতে ঐতিহাসিকের মানসিক পটভূমির পূর্ণ পরিচয় আছে। *India of Aurangzib*-এর সঙ্গে এ গ্রন্থের সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্ট। এতে আছে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থা ও অর্থনীতির উপর তার প্রভাব, শিল্প, কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ, গ্রাম-সংস্থা, গ্রামীণ অর্থনীতি, বর্ণপ্রথা ও তার অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য, অর্থনীতিতে অতি প্রাচীন রীতিনীতির প্রভাব, কৃষি-ব্যবস্থা এবং আরো এমন সব বিষয়বস্তু-- যা পড়তে গিয়ে *India of Aurangzib*-এর অন্তর্গত অনুরূপ বিষয়ের কথা বার বার মনে পড়ে যায়। পরিবহন, ভূমি-ব্যবস্থা ও মুদ্রার আলোচনায় মুসলিম ইতিহাসের জ্ঞান ব্যবহৃত হয়েছে এবং ভূমি-সংস্থা ও পরিসংখ্যা বলতে যা বুঝায় *Economics of British India*-য় তা একটি বিরাট অংশ দখল করে আছে।

অর্থনীতি ও ভূগোল সম্পর্কিত জ্ঞানের স্পর্শ পেয়ে মোগল ও মারাঠাদের রাজনৈতিক ইতিহাস বহুক্ষেত্রে বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমকালীন ঐতিহাসিক Moreland-এর মত অর্থনীতিকে ইতিহাসের এক মাত্র প্রধান ও মৌলিক শক্তি রূপে ধরে না নিলেও স্যর যদুনাথ একে রাষ্ট্রের উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত অন্যতম প্রধান শক্তি বলে নির্দেশিত করেছেন। কৃষিই ভারতীয় সম্পদের উৎস। এর উন্নতি বা অবনতির উপরই রাষ্ট্রের ভাগ্য নির্ভরশীল :[১৪]

> **In a predominantly agricultural country like India, the tillers of the soil are the only source of national wealth, Directly or iudirectly, the land alone adds to the "annual national stock." Even the craftsmen depend on the Peasants and on the men enriched with land revenue, for the sale of their goods, and if the latter have not enough foodstuff to spare, they cannot buy and handicraft. Hence, the ruin of the peasants means in India the ruin of the non-agricultural classes too. *Pauvre paysans pauvre royaume,* is even truer of India than of France. Public peace and security of property are necessary not only for the peasant and the artisan, but also for the trader, who has to carry his goods over wide distances and give long credits before he can find a profitable market. Wealth, in the last resort, can accumulate only from saving out of the peasant's production. Whatever lowers the peasant's productive power or destroys his spirit of thrift by**

creating insecurity about his property, thereby prevents the growth of national capital and impairs the economic staying power of the country. Such are the universal and lasting efforts of disorder and public insecurity in India. And the reign of Aurangzib affords the most striking illustration of this truth.

History of Aurangzib গ্রন্থে এ ধরনের আরো বহু মন্তব্য আছে। অর্থনীতিতে রীতিমত প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত পণ্ডিতের কাছে থেকেই এ জাতীয় অভিমত আশা করা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের উপরে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের যুদ্ধ-বিগ্রহ যে কি কঠিন আঘাত হেনেছিল, তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন স্যর যদুনাথ। উক্ত সম্রাটের সমকালীন ফরাসী পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ারের মতই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে মোগল সাম্রাজ্যের বাহ্যিক আড়ম্বর ও শান-শওকতের আড়ালে লোক-চক্ষুর অগোচরে ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে বিরাট শূন্যতা দেখা দিচ্ছিল এবং তার পরিণতি হয়েছিল ভয়াবহ। তেমনি আবার শিবাজী ও প্রথম বাজি রাও-এর দেশ বিজয়ের গৌরবই মারাঠা জাতির গর্বের বিষয় বটে; কিন্তু তারাও দেশে ধন-সম্পদ সৃষ্টির দিকে নজর দেয়নি এবং শুধুমাত্র লুণ্ঠনের উপর নির্ভরশীল হতে চেয়েছে। সেই জন্য লুণ্ঠনকারী দেশ ও লুণ্ঠিত দেশের আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছিল: [১৫]

It is the Nemesis of a *Krieg-Staat* to move in a vicious circle. It must wage war periodically if it is to get its food; but war, when waged as a normal method of supply, destroys industry and wealth in the invading and invaded countries alike and ultimately defeats the very end of such wars. Peace is death to a *Krieg-Staat*, but peace is the very life-breath of wealth.

ভারতের সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে যদুনাথের বিস্তৃত আলোচনা থেকে মনে হয় যে, তাঁর আর্থনীতিক প্রশিক্ষণ ইতিহাস আলোচনায় বিশেষভাবে কাজে লেগেছে। একটু পরেই আমরা দেখব যে, স্যর যদুনাথের ঐতিহাসিক প্রয়োগবাদ (pragmatic view of history) *Economics of British India* গ্রন্থে প্রত্যক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং এই কারণেও বইটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

স্যর যদুনাথের ইতিহাস সাধনার আরম্ভ ও বিকাশ চোখে পড়ে *History of Aurangzib* ও *Shivaji and His Times* গ্রন্থে। বই দুটিতে যা আছে, তা আওরঙ্গজেব ও শিবাজীর নিরেট জীবনী নয়, তা রাষ্ট্রের বা জাতি বিশেষের উত্থান ও পতনের ধারাবাহিক বর্ণনা এবং সমগ্র ভারতের ষাট বছরের ব্যাপক ইতিহাস। *History of Aurangzib* রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে যদুনাথ সরকার বলেছেন যে, আওরঙ্গজেবের সময়েই যেমন মোগল সাম্রাজ্যের সব চেয়ে বেশী বিস্তৃতি দেখা যায় এবং ভারতীয় সভ্যতার উন্নতি হয়, তেমনি আবার মোগল রাষ্ট্র ও সভ্যতার অবক্ষয়ের লক্ষণগুলিও তখনই প্রকট হয়ে ওঠে। এই সম্রাটের রাজত্বকালেই মারাঠা জাতি ও শিখ সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান এবং ইংরেজ বণিকদের প্রথম বারের মত শক্তি বৃদ্ধি হয়। অতএব গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে এই আমল খুবই উপযুক্ত। যদুনাথ সরকার দেখিয়েছেন, আওরঙ্গজেবের সুদীর্ঘ জীবন এক শোচনীয় ব্যর্থতার ইতিহাস। এক পুরুষ ধরে যুদ্ধবিগ্রহের দরুন দেশের ধন-সম্পদ ও ধন উৎপাদনের উৎসগুলি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। ঠিক একই কারণে মোগল অভিজাততন্ত্রে নৈতিক অধঃপতন দেখা দিয়েছিল। সভ্যতা ও সংস্কৃতি পূর্ব গৌরব হারিয়ে সামরিক পরিবেশের স্থূলতার দরুন ক্ষীয়মান হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত চরিত্রে ছিল বহু গুণের সমাবেশ ; কিন্তু শাসন-ব্যবস্থার সকল বিভাগে কেন্দ্রীয়করণের আত্যন্তিক প্রচেষ্টার ফলে কর্মচারীদের কার্যস্পৃহা ও ব্যক্তিগত যোগ্যতা হয়েছিল মারাত্মকভাবে ব্যাহত। সকল শ্রেণীর লোকজনকে একত্রিত করে আওরঙ্গজেব একটি ভারতীয় জাতি ও শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারেননি। হিন্দুগণ রাজনৈতিক অধিকার পায়নি। সেই জন্য এবং হিন্দু ও মুসলমানের জীবনযাত্রার আদর্শ ভিন্ন প্রকৃতির বলে এদের মধ্যে সংহতি আসেনি। মুসলমানদের বহির্মুখিতা ও হিন্দু সমাজে শ্রেণী-বিভাগ ও দেশ-প্রেমিক পুরোহিত সম্প্রদায়ের অভাব জাতি গঠনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। ভারতের হিন্দু ও মুসলিম জনসাধারণ প্রগতি-বিরোধী। এ-সব কারণেই মোগল ভারতের পতন ঘটে। যদুনাথ একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের সমীক্ষা করেছেন। তাঁর মতামত কোনো কোনো মুসলমান ঐতিহাসিকের ভাল লাগেনি।[১৬] তাঁদের মন্তব্য আওরঙ্গজেবের রাষ্ট্রনীতির সমর্থনে প্রদত্ত কৈফিয়ৎ ছাড়া আর কিছু নয়। স্যর যদুনাথ তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে অন্ততঃ যুক্তি ও তথ্য যথেষ্ট পরিমাণে দিয়েছেন। ইতিহাস আলোচনায় বিষয়বস্তুর প্রতি যে সহানুভূতির প্রয়োজন এবং ঐতিহাসিকের তরফ থেকে যে মানসিক প্রসারতার দরকার তা তাঁর লেখায় পর্যাপ্তভাবেই পরিলক্ষিত হয়।

Shivaji and His Times গ্রন্থটিকে আমরা বিশেষ অর্থে *History of Aurangzib*-এর পরিপূরক রূপে এবং *Fall of the Mughal Empire*-এর অনুক্রম রূপে গ্রহণ করতে পারি। *Shivaji and His Times*-এ যেমন আছে মারাঠা জাতির প্রতিষ্ঠাতার পূর্ণ পরিচয়, তেমনি আছে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে মোগল এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাষ্ট্রের সম্পর্কের ইতিহাস। গ্রন্থটির সর্বশেষ অধ্যায়ে মারাঠা বীর ও নবগঠিত মারাঠা জাতির কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। পূর্বেই বলেছি, *Fall of the Mughals*-এর বিষয়বস্তু বিচিত্র এবং উপকরণও বহুবিচিত্র। স্যর যদুনাথের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর জটিলতার পরিচায়ক:[১৭]

> The materials are vast and varied; but this fact does not constitute the difficulty of the historian of the period so much as the immense number of the separate political bodies and centres of action created in the country by the dismemberment of an empire that had once embraced nearly the whole of India. A history of India in the 18th century which would attempt to deal with every one of these provinces or states in all its actions will be like a bag of loose stones constantly knocking against one another and not a single solid edifice.

স্যর যদুনাথের অন্যান্য রচনা[১৮] বা অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ উপায়ে মোগল বা মারাঠা ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। *Mughal Administration*[১৯] মুসলিম শাসনরীতি সম্বন্ধে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা যাতে মোগল শাসন-ব্যবস্থার মৌলিক রূপটি তিনি সঠিকভাবে বুঝতে চেয়েছেন। তাঁর মতে এই ব্যবস্থা হচ্ছে Perso-Arabic system in Indian setting এবং গ্রামীণ শাসন-ব্যবস্থায় মোগলগণ কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। যদুনাথ সরকার রাজ্য-বিস্তার এবং জাতি বিশেষের উত্থান-পতনের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্র এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বুঝাতে চেয়েছেন; এগুলি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ঘটনার বিবরণ কখনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হতে পারে না।

মহারাষ্ট্র-দেশের নেতা রানাডে, তিলক ও গোখেলের প্রভাবে বাংলাদেশে হিন্দু জাগরণ দেখা দেয়। উনিশ ও বিশ শতকের বাংলার রাজনীতি ও সাহিত্যে তার সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়ে গেছে। মারাঠা বীর ও জাতীয় নেতা শিবাজীর স্মৃতি বাঙ্গালী হিন্দুর চিত্তকে বিশেষভাবে উদ্দীপিত করেছিল। *Shivaji and His Times*

গ্রন্থে এই আন্দোলনের প্রভাব খুব কমই অনুভূত হয়। শিবাজী চরিত্রে নেতৃত্বের যে সকল অসাধারণ গুণ ঐতিহাসিক দেখেছেন, তা অনেকটা সত্য-সন্ধানীর দৃষ্টিতেই দেখেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন:[২০]

> The first danger of the new Hindu Kingdom established by him in the Deccan lay in the fact that the national glory and prosperity resulting from the victories of Shivaji and Baji Rao I, created a reaction in favour of Hindu orthodoxy; it accentuated caste distinction and ceremonial purity of daily rites which ran counter to the homogeneity and simplicity of the poor and politically depressed early Maratha society. Thus, his political success sapped the main foundation of that success.··· In proportion as Shivaji's ideal of a Hindu *swaraj* was based on orthodoxy, it contained within itself the seed of its own death. ··· 'It is beyond the power of any man, it is opposed to the divine law of the universe, to establish the *swaraj* of such a caste-ridden, isolated, internally torn sect over a vast continent like India.'

আলোচ্য গ্রন্থটির প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে লেখক বলেছেন:[২১]

> ···so many false legends about Shivaji are current in our country and the Shivaji myth is developing so fast···that I have considered it necessary in the interest of historical truth to give every fact, however small about him.···

কে জানে Shivaji myth কথাটি বলে লেখক মারাঠা বীরের তথাকথিত সর্ব-ভারতীয় নেতৃত্বের ধারণার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন কি না! জাতীয়তাবাদী লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের চোখে সিরাজ-উদ-দৌলা এবং অন্ধকূপ রহস্য যে রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, History of Bengal, vol. II তে তার বাষ্পমাত্রও নেই। প্রতাপাদিত্য সম্পর্কিত জনপ্রিয় ধারণার বিরুদ্ধে তিনি ত প্রতিবাদই করেছেন।[২২]

স্যর যদুনাথ প্রধানতঃ রাজনৈতিক ইতিহাস লিখেছেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা যে অত্যন্ত প্রখর ছিল, তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে ও নিবন্ধে তার অজস্র প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। ১৯২৮ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত Sir William Meyer বক্তৃতা সিরিজে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণে তিনি

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রম-বিকাশের যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন, তাতেই সামাজিক ইতিহাসের মূল সূত্রগুলি বিধৃত হয়েছে। তাঁর মতে সমাজ-গঠন একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া এবং সমাজ-ব্যবস্থা মাত্রই ক্রম-বিবর্তনের জটিল শৃঙ্খলায় বাঁধা। এই সাধারণ নিয়ম মেনে নিয়েই তিনি দেখিয়েছেন বিভিন্ন উপাদান ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজের দেহ ও আত্মাকে কি এক সক্রিয় ও বিচিত্র প্রণালীতে যুগ যুগ ধরে গড়ে তুলেছে। Arts in Mughal India[২৩] প্রবন্ধেও যদুনাথ সরকার মোগল চিত্রকলার উৎপত্তি, বিকাশ ও ক্রম-বিবর্তনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তা ছাড়া নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাসে'র পরিচয়-পত্রে সামাজিক ইতিহাস বলতে তিনি 'The how and why of the people's evolution' বুঝিয়েছেন।[২৪] "···কোন কোন শক্তির প্রভাবে আমাদের জনসমষ্টির সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বর্তমানের আকার ধারণ করিয়াছে, এবং সেই শক্তিগুলি কি প্রণালীতে কোন কোন সুযোগে কাজ করিয়াছে," এবং "···জীবনের সকল দিক হাজার বছর ধরিয়া কালের স্রোতের আঘাতে কেমন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ লইল", তার আলোচনাই সামাজিক ইতিহাস লেখকের কাজ। "লোকদের দৈনন্দিন জীবন, সমাজ, ধর্ম, কর্ম, সংস্কৃতি, ধন-সম্পদ" এবং "অতীত যুগের ভূমি-সংস্থা, কৃষি-পদ্ধতি, শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য, অশন-বসন, ধর্ম ও ক্রিয়াকাণ্ড, শিল্প-বিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্য" প্রভৃতিই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিষয়বস্তু। নীহাররঞ্জন রায়ের গ্রন্থটির বিষয় বিশ্লেষণ করতে গিয়েই যদুনাথ সরকার উল্লিখিত কথাগুলি বলেছেন; কিন্তু তিনি তা বলেছেন অনুমোদনের সুরে। সেই জন্য উক্ত কথাগুলির মধ্য দিয়ে সামাজিক ইতিহাসের প্রতি তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশ পেয়েছে।

তিন

উৎস সমালোচনা যদুনাথ সরকারের ইতিহাস সাধনার অন্যতম বিশেষত্ব। মোগল আমলের সরকারী ইতিবৃত্তগুলি উল্লেখ করবার পর তিনি আসাম বুরঞ্জীকে **extremely valuable indigenous annals** রূপে আখ্যাত করেছেন, যদিও এগুলিতে কিংবদন্তী, অতিরঞ্জন এবং ঘটনাক্রমের ত্রুটি অতি সহজেই চোখে পড়ে। 'আখ্‌বারাত' হচ্ছে **the very raw materials of history** এবং **In them we see events as they happened day by day, and not as they were dressed up afterwards by writers with a purpose.** ইয়োরোপিয়ান পর্যটকদের লেখা, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে

bazar rumours এবং সুফীদের সম্বন্ধে রচিত কিংবদন্তী।... সাহিত্য pious fraud। মারাঠা ইতিহাস রচনায় ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় বিধৃত উপাদানের মূল্যের উল্লেখ করে যদুনাথ স্তুতিমূলক সংস্কৃত কবিতা, মারাঠা দলিল-পত্র ও 'বখর' সাহিত্যের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। Poona Residency Correspondence-এর ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে তাঁর উক্তি :[২৫]

> These English records,···will light up in minute detail many superficially known periods and incidents of Anglo-Indian history,—not only with reference to the Poona Government, but to almost all parts of India, and reveal in the most authentic manner possible the social and economic background and the pre-existing administrative arrangements on which Mountstuart Elphinstone built up the new British system of government in the Bombay Presidency. The greatness of the transition from the old order to the new will be unfolded most vividly before our eyes when the series now begun is completed.

তথ্যনিষ্ঠ যদুনাথ সরকারের রচনায় historical imagination বা ইতিহাস-ভিত্তিক কল্পনার ব্যবহার খুবই কম, যদিও বর্তমান কালের ঐতিহাসিকগণ এর মূল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। *India Through the Ages* গ্রন্থে[২৬] এবং *History of Bengal*-এ[২৭] বখতিয়ার খিলজীর নদীয়া আক্রমণের ইতিহাসের পুনর্গঠনে যদুনাথ অত্যন্ত সীমিতভাবে এই চেতনার পরিচয় দিয়েছেন।

সময়কে কাল-বিভাগে খণ্ডিত করলে ইতিহাসের সমস্যাগুলিকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় না; কারণ ঐতিহাসিক সমস্যার ধারাবাহিকতা কাল থেকে কালান্তরে এগিয়ে চলে। সেইজন্য Lord Acton বলেছেন: Study Problems, not periods;[২৮] কাল-বিভাজন (periodisation) সম্বন্ধে স্যর যদুনাথও অনুরূপ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন :[২৯]

> We usually study the history of India as divided into watertight compartments or periods. One great defect of this method of treatment is that we thereby lose sight of the life of the nation as a whole, we fail to realize that India has been the

home of a living growing people, with a continuity running through all the ages, each generation using, expanding or modifying what its long line of predecessors had left to it··· Each race or creed that has chosen India for its home, each dynasty that has enjoyed settled rule among us for some time, each school of thought that has dominated the human mind even in a single province in India,--has left its gifts which have worked in all the provinces and through many centuries, till they have lost there identity by being transformed and assimilated into the common store of India's legacy from the forgotten past.

এই অতীত যেন বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে না যায়, ঐতিহাসিকের কাজ হচ্ছে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা। বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীর অবদানগুলির উৎস-মূল খুঁজে বের করে সময়ের ছকের মধ্যে তাদের স্থান নির্দেশ করতে হবে। তারা পরবর্তী যুগগুলিকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে এবং বর্তমান কালের ভারতীয় জীবন ও চিন্তাধারার কোন কোন অংশই বা অতীতের বিভিন্ন জাতির প্রত্যক্ষ অবদান, তা বুঝিয়ে দিতে হবে। এই বিশ্লেষণধর্মী বিবরণ যে ইতিহাস-ভিত্তিক কল্পনার উপর নির্ভরশীল, তা যে অঙ্কশাস্ত্রের হিসেবের মত যথার্থ বা যথাযথ হতে পারে না এবং তাতে যে ব্যক্তিগত মতামতের প্রাধান্য থাকতে পারে, সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক অত্যন্ত সচেতন। এই কল্পনা-ভিত্তিক ইতিহাসের দাম আদৌ কম নয়।

কাল-বিভাজনের সূত্র ধরেই এখানে আরো একটি কথা বলা দরকার। কোনো বিশেষ যুগের প্রতি মাত্রাধিক গুরুত্ব দিলে ঐতিহাসিক, সরলীকরণ ও পক্ষপাতিত্ব এড়াতে পারেন না। স্যর যদুনাথ এবং তাঁর অনুসরণে অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ মোগল যুগকে এত বেশী করে তুলে ধরেছেন যে, তার ফলে প্রাক-মোগল যুগ যেন তার ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে ঐতিহাসিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। যদুনাথ সরকারের ধারণা যে, ভারতের ইতিহাসে প্রাক-মোগল যুগ একটি অন্ধকারের যুগ—এ যুগে কোনো সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল না।

চার

Fall of the Mughal Empire-এর ভূমিকায় ঐতিহাসিক বলেছেন:[৩০]

Nor is it wanting in the deepest instructions for the present.

> **The headlong decay of the age-old Muslim rule in India and the utter failure of the last Hindu attempt at empirebuilding by the new-sprung Marathas, are intimately linked together, and must be studied with accuracy of detail as to facts and penetrating analysis as to causes if we wish to find out the true solutions of the problems of modern India and avoid the pitfalls of the past.**
>
> **The light of our father's experience is indespensably necessary for guiding aright the steps of those who would rule the destinies of our people in the present. Happily, such light is available in unthought of profusion.**

ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই হল স্যার যদুনাথের অন্যতম বক্তব্য। আমরা এই অভিমতকে pragmatic coneption of history রূপে অভিহিত করতে পারি। ইতিহাসের পাতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ঐতিহাসিক সেই শিক্ষার সাহায্যে বর্তমানকে বুঝতে এবং ভবিষ্যতের কার্য-প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করতে চান। তিনি ইতিহাসের প্রয়োগ-মূল্যে বিশ্বাসী। বহুকাল আগেই এ ধরনের ইতিহাস-দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে। তবে আমাদের মনে হয়, সমকালীন চিন্তাধারাই এ ক্ষেত্রে যদুনাথ সরকারের মানসিকতাকে প্রভাবিত করেছে। *Oxford History*-র অবতরণিকায় Vincent Smith বলেছেন :[৩১]

> **The value and interest of history depend largely on the degree in which the present is illuminated by the past···a sound knowledge of the older history will always be a valuable aid in the attempt to solve the numerous problems of modern India.**

Vincent Smith-এর মধ্যে এই বিশ্বাস এতই প্রবল ছিল যে, তিনি তৎকালীন ভারত সরকারের ব্যবহারের জন্য *Indian Constitutional Reform Viewed in the Light of History*[৩২] নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

Fall of the Mughal Empire থেকে উদ্ধৃত অংশটিকে একটি আকস্মিক মন্তব্য বলে ধরে নেয়ার কোনো কারণ নেই। আলোচ্য ঐতিহাসিকের অন্যান্য গ্রন্থেও আরো বহু অংশ আছে যাতে ঐতিহাসিক প্রয়োগবাদ স্বচ্ছভাবে ফুটে উঠেছে। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের তাৎপর্য প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বলেছেন :[৩৩]

History when rightly read is a justificatoin of Providence, a revelation of a great purpose fulfilled in time. The failure of an ideal Muslim king like Aurangzib, with all the advantages he possessed at his accession and his high moral character and training,—is, therefore, the clearest proof the world can afford of the eternal truth that there cannot be a lasting empire without a great *people*, that no people can be great unless it learns to form a compact *nation* with equal rights and opportunities for all,—a nation the component parts of which are homogeneous, agreeing in all essential points of life and thought, but freely tolerating individual differences in minor points and private life, recognizing individual liberty as the basis of communal liberty,—a nation whose administration is solely bent upon promoting national, as opposed to parochial or sectarian interests,—and a society which pursues knowledge without fear, without cessation, without bounds. It is only in that pure light of goodness and truth that Indian nationality can grow to the full stature of its being.

পরোক্ষভাবে এ কথা বলা হয়েছে যে, আওরঙ্গজেবের আমলে ব্যক্তি স্বাধীনতা তথা সাম্প্রদায়িক স্বাধীনতা ছিল না এবং রাষ্ট্রযন্ত্রও বৃহত্তম জাতীয় স্বার্থের উন্নতি বিধানে নিয়োজিত হয়নি, হয়েছিল বরং ক্ষুদ্র শ্রেণী স্বার্থ বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের উন্নতিকল্পে। সেইজন্য জাতি গঠনের সম্ভাবনাও আর রইল না। অথচ আওরঙ্গজেবের মত শক্তিশালী এবং বিশাল ও একক রাষ্ট্রের অধিকারীর পক্ষে বৃহত্তর ভারতীয় জাতি গঠনের সুযোগ ও সম্ভাবনাই ছিল খুব বেশী। আবার অতীতের শিক্ষা থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, ভারতীয় জাতি গঠনের পূর্বশর্ত হচ্ছে হিন্দুত্ব ও ইসলামের সম্পূর্ণ রূপান্তর গ্রহণ ও পুনরুজ্জীবন :[৩৪]

The detailed study of this long and strenuous reign of fifty years drives one truth home into our minds. If India is ever to be the home of a nation able to keep peace within and guard the frontiers, develop the economic resources of country

and promote art and science, then both Hinduism and Islam must die and be born again. Each of these creeds must pass through a rigorous vigil and penance, each must be purified and rejuvenated under the sway of reason and science.

ইসলামের আমূল পরিবর্তন ও ধর্ম-নিরপেক্ষ গঠনতন্ত্র রচনা যে সম্ভব, তার ত প্রমাণ আছে তুরস্কের কামাল পাশার রাজনৈতিক কর্মে এবং সমাজ সংস্কারের সার্বিক প্রয়াসে। আবার সনাতনী হিন্দু মনোবৃত্তি আধুনিকতার পরিপন্থী। সুদূর অতীতের আর্য সভ্যতার প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার সার্থকতা কম। বৈদিক যুগের পরে ত বটেই, মোগল আমলের পরেও বিবর্তনের দরুন ভারত নতুন নতুন উপাদান আত্মসাৎ করেছে—এ কথা না মেনে উপায় নেই। আধুনিক ভারতীয় সভ্যতা প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত যৌগিক বস্তু—এটা চার হাজার বছরের বালুকা রাশির মধ্যে ডুবিয়ে রাখা কোনো নিঃপ্রাণ পদার্থ নয়। প্রগতি-শীলতাই অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায়:[৩৫]

This study of our country's history leads irresistably to the conclusion that we must embrace the spirit of progress with a full and unquestioning faith, we must face the unpopularity of resisting the seductive cry for going back to the undiluted wisdom of our ancestors, we must avoid eternally emphasizing the peculiar heritage of the Aryan India of the far off past. We must recognize that in the course of her evolution India has absorbed many new elements later than the Vedic Aryan age and even than the Mughal age. We must not forget that modern Indian civilization is a composit daily growing product and not a mummy preserved in dry sand for four thousand years.

ঐতিহাসিক প্রয়োগবাদের অনুষঙ্গ রূপে স্যার যদুনাথের আরো কিছু মন্তব্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে *History of Bengal* গ্রন্থে। ঐতিহাসিক এ ধরনের ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, প্রত্যেক যুগের মধ্যে তার পরবর্তী যুগের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে এবং ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন গতিই তাকে নিশ্চিত থেকে নিশ্চিততর করে তোলে। বাংলাদেশের বিচিত্র অতীত দেখে বুঝতে পারা যায়, বিবাদরত বহু গোত্র ও সম্প্রদায়কে সময় নীরবে কার্য করে কি ভাবে একত্রে গ্রথিত করল এবং

তাতে করে মুসলিম আমলের শেষে কি করে এই একই রাজনৈতিক উত্তরাধিকার-সম্পন্ন লোকগোষ্ঠী বাঙ্গালী জনসাধারণে (people) পরিণত হল। কিন্তু বাঙ্গালী nation তখনো জন্ম নেয়নি। দুই শত বৎসর বৃটিশ রাজত্বের প্রভাবে এই লোকগোষ্ঠীর জীবনে ও চিন্তায় যে সমতা বা সামঞ্জস্য এসেছে, তার ফলে এখন nation তৈরী হতে পারে :[৩৬]

> May the course of the years 1757 to 1947 have prepared us for the supreme stage of our political evolution and helped to mould us truly into a nation. May our future be the fulfilment of our past history.

Economics of British India-র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। তার পূর্বে রমেশচন্দ্র দত্ত ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদিগণ বৃটিশ সরকারের শোষণ-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের তুমুল ঝড় তুলেছিলেন। কিন্তু উক্ত অর্থনীতির বইয়ে দেখি যে স্যর যদুনাথের ভূমিকা সম্পূর্ণ গঠনমূলক। এই গ্রন্থের মুখবন্ধে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রকৌশল গ্রহণ করে ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতির আমূল সংস্কার সাধনই তাঁর কাম্য। সেইজন্য মনে হয় যে, ঐতিহাসিক যদুনাথের মধ্যে দেশের কল্যাণ-চিন্তা ও সমাজ সংস্কারের প্রবণতা লুকিয়ে আছে। *Economics of British India*-র বিভিন্ন অধ্যায়েও এই প্রবণতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে।

পাঁচ

যদুনাথ সরকার সমগ্র ইতিহাসের ধারাকে ক্রম-বিবর্তনশীল ও ক্রম-প্রবহমান বলে মনে করেছেন। এই মানসিকতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে ১৯২৮ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত William Meyer Lectures সিরিজে।[৩৭] বক্তৃতাগুলিতে ভারতে আর্য ঐতিহ্য, বৌদ্ধ ধর্মের দান, মুসলিম শাসনের অবদান এবং বৃটিশ সভ্যতার প্রভাব আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনার সঙ্গে *History of Aurangzib* এবং *Shivaji and His Times* মিলিয়ে দেখলে স্যর যদুনাথের ইতিহাসের দর্শন অন্ততঃ আংশিকভাবে বুঝতে পারা যায়। ইতিহাসের ধারাকে যে রাজা বা সম্রাট অগ্রগতি দান করতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। যদুনাথের মতে আকবর শ্রেষ্ঠ এবং[৩৮]

The progressive spirit died out of India at the death of Akbar. Then followed a stationary civilization, and such a civilization. is bound to decay as it finds improvement impossible.

আওরঙ্গজেব শ্রেষ্ঠ হয়েও সার্থক নন:

Such a king cannot be called a political or even an administrative genius. He was fit to be an excellent departmental head, not a statesman initiating a new policy and legislating with prophetic foresight for moulding the life and thought of unborn generations in advance.

আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত গুণাবলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করে স্যর যদুনাথ বলেছেন:

And yet the result of fifty years' rule by such a sovereign was failure and chaos! This political paradox makes his reign an object of supreme interest to the student of political philosophy no less than to the student of Indian history.

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের, বিভিন্ন ধর্মের ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের ঐক্য ও সমন্বয়ে সবল ও বিরাট জাতি গঠনে আওরঙ্গজেবের চূড়ান্ত ব্যর্থতার মধ্যেই ঐতিহাসিক ঐ political paradox-এর কারণ খুঁজে পেয়েছেন। আর শিবাজী যদি মারাঠা জাতির বীর পুরুষ রূপে আলোচ্য ঐতিহাসিকের প্রশংসা অর্জন করে থাকেন, তাও মারাঠা জাতি গঠনে তাঁর আশ্চর্য রকমের সাফল্যের জন্যই:[৩৯]

জাতীয় বীর, রাষ্ট্রনেতা, নেশন-গঠনকারী আদি পুরুষ, এই অভিধেয়ের প্রত্যেকটিই তাঁহার সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে সত্য।...মারাঠা রাষ্ট্র একটি জাতি বা নেশনের সৃষ্টি, ইহা সর্ব ধর্মের, সর্ব জাতের অর্থাৎ বর্ণের মিলনের ফল।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের পরিচয় দিতে গিয়ে স্যর যদুনাথ লক্ষ্য করেছেন যে, বৈদিক আর্যগণ, বৌদ্ধ সম্প্রদায়, মুসলমানগণ ও বৃটিশ রাজ-শক্তি—এদের প্রত্যেকই এ দেশের জীবনে নতুন নতুন উপাদান সংযোজিত করে নতুন অবদানে একে সমৃদ্ধ করে তুলেছে এবং এই উপাদানগুলি যুগ যুগান্তর ধরে সক্রিয় হয়ে আমাদের জীবনকে পরিবর্তিত করেছে এবং আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসেও সুস্পষ্টভাবে ছাপ মেরেছে। অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে আর্যদের ধর্ম,

দর্শন, শব্দভাণ্ডার, সাহিত্যরীতি ও ঐতিহ্য এবং শাসন-পদ্ধতি একত্রিত হয়ে যে সমন্বয়ধর্মী সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, তাকেই বলা যায় হিন্দুত্ব (Hinduism)। ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে কালক্রমে যে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল, তাই হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম যা ভারতীয় জীবনের ক্রমবিবর্তনের একটি নতুন পর্যায়। আচার ও ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী বৌদ্ধ ধর্ম ভারতীয় চিন্তায় ও জীবনে একটি নতুন শক্তির সৃষ্টি করেছিল। বৌদ্ধ যুগে যে সকল বিদেশী অনার্য গোত্র ভারতে বসবাস করেছিল, তারা উক্ত ধর্মের পতনের যুগে হিন্দু জনসাধারণের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশ্রিত হয়ে হিন্দু সমাজের সমণ্বয়কে আরো দৃঢ় করল। স্কীথিয়ান ও অন্যান্য যাযাবর গোত্রের আগমনের ফলে প্রথম থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে সমাজ জীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিল, তার ফলে বিভিন্ন প্রদেশে বর্ণ-প্রথা ধরাবাঁধা ছকের মত হয়ে গেল। কি করে এই প্রথা শেষ বারের মত কঠিনভাবে দানা বাঁধল, সে ইতিহাস আজো ভালভাবে জানা যায়নি। "হিন্দু সমাজের এই পুনর্গঠনের যুগে স্কীথিয়ান ও অন্যান্য লোকগোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হল এবং এই সময়ে রাজপুতগণ রাজকীয় ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হল। সিন্ধু নদীর উপর অবস্থিত আটক ও উন্দ্ থেকে দক্ষিণ বিহারের পালামৌ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তাদের রাজ্যগুলি ছড়িয়ে রইল। এই রাজপুতগণই নব্য হিন্দু ধর্মের উৎসাহী রক্ষকে পরিণত হল। বর্বর বৈদেশিক জনগণের নৈতিক রূপান্তর সাধনই হচ্ছে ভারতের পক্ষে সবচেয়ে বড় গৌরবের কথা। গোঁড়া ধর্মব্যবস্থা নয়, সামাজিক শক্তি ও সভ্যতার বাহক যে হিন্দুত্ব, এইটে তারই মরণজয়ী জীবনী-শক্তির প্রমাণ। —সাত ও আট শতকে বর্ণ-প্রথা দানা বাঁধবার পর যখন নব্য হিন্দু ধর্ম নিজেকে আবার প্রতিষ্ঠিত করল, শৈবগণ তখন মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের সন্ন্যাস ও চিন্তন ধার করল এবং বৈষ্ণবগণ এর মানব হিতৈষণা ধার করল। তখন বৌদ্ধ ধর্ম নব্য হিন্দু ধর্মের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে তলিয়ে গেল এবং ভারত থেকে এ ধর্ম তখন প্রায় লোপ পেল। তান্ত্রিক দর্শন মহাযান বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দু ধর্মে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে অত্যন্ত সক্রিয় হল।···শহরের উচচ শ্রেণীর লোকজন হিন্দু ধর্মে ফিরে গেল এবং বৌদ্ধ ধর্মের রেশ শুধু গ্রামে ও দেশের অভ্যন্তরে টিকে রইল।"[৪০]

নব্য হিন্দু ধর্মের যাঁরা উদ্যোক্তা, তাঁদের মধ্যে স্যার যদুনাথ—শঙ্করাচার্য, রামানুজ ও চৈতন্যের নাম উল্লেখ করেছেন। যে বিষয়গুলির উপর তিনি জোর দিয়েছেন, হিন্দুত্বের অসাধারণ প্রাণশক্তি তার মধ্যে অন্যতম। হিন্দুত্ব কখনো মরে না, বরং যুগে যুগে নতুন নতুন উপকরণ নিজের মধ্যে মিশিয়ে আপন অস্তিত্বকে মজবুত রূপে গড়ে তোলে। সুদীর্ঘকাল মুসলিম শক্তির অধীনে থেকেও হিন্দুত্ব

লোপ পায়নি এবং একটু সুযোগ পেলেই নতুন প্রাণের স্পর্শে বিচিত্রভাবে আত্ম-প্রকাশ করেছে। শিবাজীর রাজশক্তিও এই হিন্দুত্বেরই প্রতীক:[৪১]

Shivaji has shown that the tree of Hinduism is not really dead, that it can rise from beneath the seemingly crushing load of centuries of political bondage, exclusion from the administration, and legal repression; it can put forth new leaves and branches; it can again lift up its head to the skies.

নব্য হিন্দু ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মকে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছে এবং বৌদ্ধ ধর্মও গ্রামে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছে—এসব কথা সত্য। কিন্তু গ্রামে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম আত্ম-গোপন করে থাকেনি, বরং দিনের পর দিন রূপান্তরিত হয়ে সহজিয়া বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব মতবাদ রূপে এবং অবশেষে বাউল ধর্ম রূপে আত্ম-প্রকাশ করেছে এবং সাহিত্য, দর্শন ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সৃষ্টিমূলক অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

যদুনাথ সরকারের মতে হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতার মধ্যে মুসলমানদের মিশে না যাওয়ার কারণ তাদের গোঁড়া একত্ববাদ এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের বহির্মুখী দৃষ্টিভঙ্গি। বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ স্থাপন, আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা আনয়ন, একক শাসন-ব্যবস্থার মাধ্যমে সমগ্র দেশে প্রশাসনিক সমতা (uniformity) আনয়ন, জাতি-নির্বিশেষে উচচ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে সামাজিক আচার-ব্যবহারে ও পোষাক-পরিচ্ছদে সমতার সৃষ্টি, Indo-Saracenic Art-এর উদ্ভব, lingua franca হিসেবে হিন্দুস্তানী বা রেখ্‌তার প্রচলন, দেশী সাহিত্যের উদ্ভব, একত্ববাদী ও সুফী আন্দোলনের প্রসার, যুদ্ধবিদ্যায় এবং ইতিহাস-সাহিত্যে ও সাধারণভাবে সভ্যতায় উন্নতি সাধন— এইগুলিই হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতায় মুসলিম অবদান। কিন্তু এ কৃতিত্বের বেশীর ভাগই মোগল যুগের প্রাপ্য:[৪২]

With peace, wealth, and enlightened Court patronage, came a new cultivation of the Indian mind and advance of Indian literature, painting, architecture and handicrafts, which raised this land once again to the front rank of the civilized world. Even the formation of an Indian nation did not seem an impossible dream.

স্যর যদুনাথ মনে করেন, মোগল আমলের তুলনায় প্রাক-মোগল আমল অনুর্বরতার যুগ, স্থূল সামরিক কার্যের যুগ এবং মোগলদের পূর্বে ভারতে কোনো মুসলিম সভ্যতা ছিল না। তাঁর দুটি উক্তি তুলে দিচ্ছি:[৪৩]

> Another equally important characteristic of the Muslim element in India was that from 1200 to 1580 A. D. their State and society retained its original military and nomadic character,—the ruling race living merely like an armed camp in the land. It was Akbar, who at the end of the sixteenth century, began the policy of giving to the people of the country an interest in the State.…
>
> What is popularly called the Pathan period i.e., from 1200 to 1550, was the Dark Age of north Indian history.… But, by the time that Akbar had conquered his enemies and established a broad empire covering all northern India,--peace and good administration began to produce their fruits.… There was a sudden growth of vernacular literature in all our provinces.

স্যর যদুনাথ ভারতীয় সভ্যতার ক্রম-বিকাশে বিশ্বাসী। সুদীর্ঘ সাড়ে তিন শো বছর ধরে এ দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র একেবারে অনুর্বর ছিল এবং আকবরের রাজত্বকালে নিতান্ত আকস্মিকভাবে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ হল—এ কথা সভ্যতার ক্রমবিকাশের সূত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী। আকবরের আমলে' সাহিত্য, স্থাপত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলার যে রূপটি আমাদের চোখে পড়ে, তাঁর ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে দেড় শো বছর ধরে চলছিল তার প্রস্তুতি-পর্ব। রাজস্থানী চিত্রকলার সূত্রপাত হয়েছিল সম্ভবতঃ মুসলমান সুলতানদের রাজসভাতেই এবং চৌদ্দ, পনের ও ষোল শতকের প্রথমার্ধে রচিত, ঐতিহ্যবদ্ধ বাংলা ও আওয়াধী কাব্য-সাহিত্যের অস্তিত্বই যদুনাথের মন্তব্যের অসারতা প্রমাণ করছে। যে ইতিহাস-সাহিত্যকে যদুনাথ সরকার মুসলিম যুগের অন্যতম অবদান রূপে চিহ্নিত করেছেন, তারও একটি বিরাট অংশ রচিত হয়েছে তুর্কী-আফগান শাসকদের আমলেই। নব্য হিন্দু ধর্মে যাঁরা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই শঙ্কর, রামানুজ ও চৈতন্যের উপরেও ইসলামিক সুফীবাদের প্রভাব পড়েছিল, একথাও ঐতিহাসিকদের কাছে স্বীকৃতি পাচ্ছে। এঁরা প্রত্যেকে প্রাক-মোগল যুগেরই বিশিষ্ট চিন্তা-নায়ক; ভক্তি আন্দোলনের ধারা ত প্রবল হয়েছিল প্রাক-মোগল যুগেই। বৃটিশ আমলকে যদুনাথ সরকার একটি রিনেসাঁসের যুগ রূপে অভিহিত করেছেন:[৪৯]

> On 23rd June, 1757, the middle ages of India ended and her modern age began.···On such a hopeless decadent society, the rational progressive spirit of Europe struck with irresistable force. ···The dry bones of a stationary oriental society began to stir, at first faintly, under the wand of a heaven-sent magician. It was truly a Renaissance, wider, deeper and more revolutionary than that of Europe after the fall of Constantinople.

ঐতিহাসিক দেখিয়েছেন কি করে ভারতের ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতি ও সমাজ পাশ্চাত্যের প্রভাবে নতুন জীবন পেয়েছে।[৪৫] সমগ্র উপমহাদেশে একই রকম প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম একত্রীভূত হয়ে একটি সমশ্রেণীভুক্ত লোকগোষ্ঠীর সৃষ্টি হতে চলেছিল; সামাজিক সাম্য এবং জীবনে ও চিন্তায় সংহতি দেখা দিয়েছিল। এই উপাদানগুলিই জাতি গঠনের জন্য অপরিহার্য ভিত্তির কাজ করবে।

ছয়

আলোচ্য ঐতিহাসিকের বিভিন্ন মন্তব্যের ভিত্তিতে উপরে তাঁর ইতিহাস লেখার পদ্ধতি ও দর্শন এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক সমস্যার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু স্যর যদুনাথ কি সচেতনভাবে বিশেষ কোনো দার্শনিক সূত্রের অনুসরণে ইতিহাসের ঘটনা ও উপকরণ বিন্যস্ত করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন:[৪৬]

> ···ইতিহাস ও জীবন কাহিনী একজন মানুষের বাহ্য আকার ও কর্মগুলি মাত্র আমাদের দেখায়। তাঁহার চরিত্র ও জীবনী শক্তির ক্রিয়া বুঝিতে হইলে এইসব বাহ্য ঘটনার উপর ঐতিহাসিক দর্শন, যাহাকে Philosophy of History বলে, তাহার প্রয়োগ করা আবশ্যক।

এই 'ঐতিহাসিক দর্শন' বা Philosophy of History কি? উদ্ধৃত পংক্তি-গুলির পরে 'মারাঠা জাতীয় বিকাশ' পুস্তিকাটির একটি বিশেষ অংশ জুড়ে আছে শিবাজীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, কূটনৈতিক পারদর্শিতা, এবং মারাঠা জাতি গঠনে ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা যা লেখকের critical thinking-এর ভিত্তির উপরে

সুপ্রতিষ্ঠিত। এই অংশটিই শিবাজী-জীবনের মৌলিক শক্তির উৎসকে যেন আমাদের সম্মুখে খুলে দিয়েছে। সেইজন্য মনে হয়, স্যর যদুনাথের এই সমালোচনা-ভিত্তিক চিন্তাধারাই এ ক্ষেত্রে শিবাজীর ইতিহাসের দর্শন। *History of Aurangzib*, এবং *Shivaji and His Times* গ্রন্থের শেষের দিকে সংযোজিত একটি করে অধ্যায়ে আলোচিত শাসকদের চরিত্র, দেশের অর্থনীতির উপরে যুদ্ধবিগ্রহের প্রভাব, রাষ্ট্রযন্ত্রের ও সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণুতা, ভারতীয় জনসাধারণের প্রগতি-বিমুখতা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এবং ইতিহাসের ধারার উপরে তার প্রভাব, জাতি গঠনে আওরঙ্গজেবের বা শিবাজীর সাফল্য বা ব্যর্থতা প্রভৃতির চিন্তন-কেন্দ্রিক আলোচনাই যদুনাথ কর্তৃক উল্লিখিত ঐতিহাসিক দর্শন। আবার *History of Bengal* (vol. II) এর শেষদিকের কয়েকটি পাতায় **Reflections** শীর্ষক অংশে বাঙ্গালী জীবনের যে বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাসের যে তাৎপর্য উল্লিখিত হয়েছে, তা মুসলিম আমলের ইতিহাসের দার্শনিক পরিশিষ্ট বিশেষ। ইতিহাস-শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে স্যর যদুনাথ একটি প্রবন্ধে বলেছেন :

> ইতিহাসের তিন অঙ্গ, কাল-নির্ণয়, সাক্ষী-বিচার এবং দর্শন।

এই দর্শন সম্বন্ধে যদুনাথের মন্তব্য এইরূপ :[৪৭]

> তৃতীয় বা সর্বোচ্চ অঙ্গ ঐতিহাসিক দর্শন (philosophy of history), অর্থাৎ বর্ণিত ঘটনাগুলি হইতে মানব চরিত্র বা জাতীয় জীবন সম্বন্ধে গভীর উপদেশ লওয়া। এই গুণ থাকিলে তবে ইতিহাস সর্বোচ্চ সাহিত্যের অঙ্গে সমান আসন পায়। ইহাই ইতিহাসের সবচেয়ে বেশী উপকারিতা। যেমন শ্রেষ্ঠ কাব্য ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে মানবগণকে শিখায়—
>
> Of their sorrows and delights
> Of their passions and their spites
> Of their glory and their shame
> What doth strengthen and what maim

তেমনি শ্রেষ্ঠ ইতিহাস জাতিকে অর্থাৎ ব্যক্তি-সমষ্টিকে সেই মহা উপদেশ দেয়। ইংল্যান্ডেও শুধু গত দেড় শত বৎসর ধরিয়া ঐতিহাসিকগণ এই গুণের চর্চা করিতেছেন। মুসলমান ইতিহাস তাহার পূর্বে লেখা; তাহাতে এই দর্শনের লেশমাত্রও নাই। তবে এইসব পুরাতন মুসলমানী গ্রন্থ হইতে প্রকৃত ঘটনা সংগ্রহ করিয়া বর্তমান যুগে শিক্ষিত ভারতবাসীরা দর্শন রচনা করিতে পারেন, জাতীয় উন্নতি ও অবনতির কারণ আবিষ্কার করিতে পারেন।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, যদুনাথ সরকারের ইতিহাস-দর্শনের অর্থ অত্যন্ত সীমিত এবং ভিন্নতর অর্থে মধ্যযুগের ভারতীয় ঐতিহাসিকদের লেখায় নিশ্চয়ই দার্শনিক তত্ত্বের অস্তিত্ব ছিল। আর ভারতের সীমা থেকে একটু দূরে গেলেই দেখা যাবে যে, সে যুগে ইব্‌ন্ খলদূনের মত পণ্ডিতও ছিলেন, যিনি ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের ভিত্তিতে এক অতি ব্যাপক ও জ্ঞান-গভীর দর্শনের স্রষ্টা। স্যর যদুনাথের মতে ইতিহাস-দর্শনের অর্থই হচ্ছে অতীত থেকে জাতীয় জীবন সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ এবং জাতীয় জীবনের 'উন্নতি ও অবনতির কারণ আবিষ্কার'। কিন্তু ইতিহাসের পাঠক ঐ কার্যটি কেন করবেন? প্রয়োগবাদী ঐতিহাসিকের কাছে এই প্রশ্নের উত্তরও অত্যন্ত সহজ: ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে তার সাহায্যে বর্তমান জীবনের সমস্যাসমূহের সমাধান সম্ভব।

স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, ইতিহাসের দর্শন বলতে স্যর যদুনাথ যা বুঝেছেন, তার অর্থ অত্যন্ত অগভীর। মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসের মাল-মশলা, ইতিহাস লেখার পদ্ধতি ও মুসলমান ঐতিহাসিকদের সম্বন্ধে তিনি যেখানেই যা কিছু লিখেছেন,[৪৮] তার মধ্যে বিশেষ কোনো অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। জিয়া-উদ-দীন বারানী, ইয়াহিয়া সিরহিন্দী, আবুল ফজল ও বদায়ুনী অত্যন্ত আত্ম-সচেতন ঐতিহাসিক এবং তাঁদের প্রত্যেকে এক বিশিষ্ট দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। কিন্তু যদুনাথ সরকার তাঁদের এই ইতিহাস-দর্শন ও আত্মচেতনা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বলে মনে করার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হেগেলের সময় থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ইতিহাসের দর্শন সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে এবং যে সকল মতবাদ জন্ম নিয়েছে, তা যেমন বিচিত্র, তেমনি ব্যাপক। বিশেষ করে কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস্ কর্তৃক dialectical materialism প্রচারের পর থেকে ইতিহাসে জড়বাদী ও ভাববাদী ধারার মধ্যে অনেকেই সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন এবং সমাজতত্ত্বের ভিত্তিতে ইতিহাস রচনার রীতিও ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্যর যদুনাথের লেখায় এই সকল মতবাদ ও আলোচনার কোনো প্রভাব পড়েনি এবং এগুলির পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পায়নি।

বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যায় যে স্যর যদুনাথ মাঝে মাঝে ভারতীয় ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ইয়োরোপের ইতিহাস থেকে সমান্তরাল বা অনুরূপ ঘটনার নজির টেনেছেন। সর্বত্রই ইতিহাসের ঘটনাসমূহ বিশেষ বিশেষ ধারা বা নিয়মের অনুগামী হয় বলে বোধ হয় তাঁর ধারণা ছিল।

যদুনাথ সরকারের ঐতিহাসিক প্রয়োগবাদ বর্তমান কালের ঐতিহাসিকগণ গ্রহণ করবেন কি না, তা বলা মুশকিল। সত্যি কি ইতিহাসের শিক্ষার কোনো প্রয়োগ-মূল্য আছে? আমাদের মানসিক পরিশীলন ও জ্ঞানের বৃদ্ধি ছাড়া ইতিহাস আর কিছু করতে পারে কি না, তা বিচার্য।

যদুনাথ এক ধরনের সর্ব ভারতীয় জাতীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর ধারণা, আকবর ভারতীয় জাতি গঠনে অনেক দূর এগিয়েছিলেন এবং আওরঙ্গজেব এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। অত্যন্ত অস্পষ্ট-ভাবে হলেও যদুনাথ যেন এই জাতীয়তার প্রতীক শিবাজীর মধ্যেও খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন, বিভিন্ন জাতির অবদানে ভারতীয় সভ্যতা–সংস্কৃতি কি করে যুগে যুগে একটি যৌগিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। তেমনি আবার তিনি মনে করেন, ভারতীয় জাতীয়তা গঠিত হতে পারে বিভিন্ন জাতির এক উদার সংমিশ্রণে যার ভিত্তি হবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা-কেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক স্বাধীনতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি ও প্রগতিশীলতা। যদুনাথের জাতীয়তার ধারণা হয়ত বা আদর্শায়িত, কিন্তু তা উদার ও উন্মুক্ত। এই দিক দিয়ে বিচার করলে তাঁকে রমেশচন্দ্র মজুমদারের বিপরীত মেরুতে স্থাপন করা যায়।

তথ্য-নির্দেশ

১. যদুনাথ সরকার রাজশাহীর অন্তর্গত করচমারিয়া গ্রামে ১৮৭০ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একজন সংস্কৃতিবান জমিদার ছিলেন। পৈতৃক গ্রন্থাগারে যদুনাথ বহু বিদেশী বইপত্র পড়ার সুযোগ পান। তিনি রাজশাহীর কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশুনা আরম্ভ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৯১ সালে ইংরেজী ও ইতিহাসে অনার্স পরীক্ষায় এবং ১৮৯২ সালে ইংরেজীতে এম. এ. পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৩ সালে তিনি ইংরেজীর অধ্যাপকের পদে যোগ দেন; কিন্তু অল্প দিন পরে তিনি ইতিহাসে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ১৮৯৭ সালে তিনি একটি নিবন্ধে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ১৯২৩ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তারপর ১৯২৬ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত দুই বৎসর তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস-চ্যান্সেলর রূপে কাজ করেন। তিনি ১৯৫৮ সালের ১৯শে মে মারা যান।

স্যার যদুনাথ মোগল ও মারাঠা ইতিহাসের গবেষণায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লেখা অসংখ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধের মাল-মশলা সংগৃহীত হয়েছে বিভিন্ন উৎস ও ভাষা থেকে—এগুলি হচ্ছে ফারসী পাণ্ডুলিপি, রাজস্থানী দলিল-পত্রাদি, পর্তুগীজ দলিল-দস্তাবেজ,

ফরাসী ভাষায় লেখা আত্ম-চরিত ও দলিলপত্র, ইংরেজী ফ্যাক্টরী রেকর্ড এবং বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য।

২. ১৮৯১ সালের এপ্রিল মাসে বি. এ. অনার্স পরীক্ষা দিয়ে যখন তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন এই ঘটনাটি ঘটে; N. K. Sinha : 'Sir Jadu Nath Sarkar' : *Bengal Past and Present*, 1958, vol. LXXVII, p. I.

৩. ১৯০৪ সালে *Bengal Nawabs* (নওবাহার-এ মুর্শিদকুলি খান, মুজফ্ফর নামা এবং আহ্ওয়ালে মুহাবত জংগ-এর ইংরেজী অনুবাদ) কোলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক Bibliotheca Indica সিরিজে প্রকাশিত হয় এবং মোগল আমলের সামরিক ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থখানি স্যার যদুনাথের মৃত্যুর পর ছাপা হয়।

৪. *History of Aurangzib*, vol. I and II, (1618-1659), 2nd ed., 1925; vol. III (1658-1681), 2nd ed., 1921; vol. IV (1644-89), 1st ed, 1919; vol. V (1689-1707), 1st ed. 1924; *Fall of the Mughal Empire*, vol. I (1739-54), 1932; vol. II (1754–1771), 1934; vol. III (1771-1788), 1938; vol. IV (1788-1803), 1950; *Shivaji and His Times*, 1st ed., 1920; 3rd revised ed., 1929.

৫. তুলনীয়: The life of Aurangzib was one long tragedy,—a story of man battling in vain against an invisible but inexorable Fate, a tale of how the strongest human endeavour was baffled by the forces of the age. *A Short History of Aurangzib*, 1st ed., 1930; p. 3.

: And yet our immediate historic past, while it resembles a tragedy in its course, is no less potent than a true tragedy to purge the soul by exciting pity and horror. *Fall*, I. Foreword, iii.

৬. Bengali Gibbon কথাটি H. Beveridge এর সৃষ্টি।

৭. স্যার যদুনাথ কর্তৃক সম্পাদিত W. Irvine-এর *Later Mughals*, vol. I (1709–1719), 1922 and vol. II (1719-1739), 1922.

৮. *Fall*, I, Foreword, vi-vii

৯. এই জীবনী যদুনাথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত, Irvine-এর *Later Mughals*-এ ভূমিকার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে এবং জীবনীটি *Studies in Mughal India* গ্রন্থেও স্থান পেয়েছে।

১০. N. K. Sinha কর্তৃক উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, 2

১১. ঐ, p. I.

১২. ১৯০১ সালে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত।

১৩. ১৯০৯ সালে প্রথম সংস্করণ, ১৯১১ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯১৩ সালে তৃতীয় সংস্করণ

এবং ১৯১৭ সালে চতুর্থ সংস্করণ কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। পরে গ্রন্থটির আরো সংস্করণ মুদ্রিত হয়।

১৪. *History of Aurangzib*, vol. v. 437-39 ; *Short History*, 442.

১৫. *Shivaji*, 3rd ed., p. 397.

১৬ তুলনীয় : Zahiruddin Faruki : *Aurangzib and His Times*, Bombay, 1935.

১৭. *Fall*, I, Foreword, v.

১৮. এই তথ্য-নির্দেশের বিভিন্ন অংশে উল্লিখিত বইগুলি ছাড়া স্যর যদুনাথের লেখা আরো যেসব রচনা আছে, সেগুলির নাম :

Anecdotes of Aurangzib and Historical Essays, Calcutta, 1917 ; *Studies in Mughal India*, Calcutta, 1919 ; *Chaitanya's Life and Teachings* (চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার অনুবাদ), Calcutta, 1922 ; শিবাজী, কোলকাতা, ১৯২৯ ; *Bihar and Orissa during the Fall of the Mughal Empire*, Calcutta, 1932 ; *Studies in Aurangzib's Reign*, Calcutta, 1933 ; *Cambridge History of India*, vol. IV, 1937 : chs. VIII, X-XIX ; *House of Shivaji*, Calcutta, 1940 ; *Poona Residency Correspondence*, (ed), vol. VIII, 1945. এবং XIV (1951). Bombay ; *Maasir-i-Alamgiri* (ইংরেজী অনুবাদ), Bibliotheca Indica, 1947 ; *Ain-i-Akbari*, vol. III (1948) এবং vol. II (1949), Bibliotheca Indica, (আইন-ই-আকবরীর এই দুই খণ্ড মূলত: Colonel H. S. Jarret কর্তৃক অনূদিত হয়ে যথাক্রমে ১৮৯৩-৯৬ সালে এবং ১৮৯১ সালে কোলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর তথ্যের সাহায্যে স্যর যদুনাথ ঐ অনুবাদে অজস্র টীকা সংযোজনা করেন এবং মূল অনুবাদেও সামান্য রদবদল করেন।) ; *Delhi News for Poona*, 1756-1788, Bombay, 1952 ; তা ছাড়া যদুনাথ নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলীতে ও পত্র-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখেছেন :

B. C. Law Commemoration Volume, Sardesai Commemoration Volume (1933), Bengal Past and Present, Birla Park Annual, Bombay University Journal, Calcutta Municipal Gazette, Hindustan Review, Indian Historical Quarterly, Indian Review, Islamic Culture, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Journal of Bihar and Orissa Research Society, Modern Review, Muslim Review, Patna College Magazine, Prabuddha Bharat, Proceedings of the Indian Historical Records Commission, Presidency College Magazine, Ravenshavian, Science and Culture, Times of India, প্রবাসী, ইতিহাস, ইত্যাদি।

১৯. *Mughal Administration*, Calcutta ; 1st edition, 1924.

২০. 388-89.

২১. Preface, 1st ed,. 2nd ed., এর Preface, 7 পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। 3rd ed. v.

২২. তুলনীয়: The height of absurdity is reached when our dramatists call Pratapaditya of Jessor as the counterpart of Maharana Pratap Singh of Mewar. It is therefore necessary to debunk the Bengali "hero" by turning the dry light of history on him. Pratapaditya never once defeated any Mughal army in pitched battle; his son and general Udayaditya took to flight at the sign of a losing naval battle (at Salka), and Pratapaditya himself tamely submitted to the Mughal general without holding out till he was assured of safety to life and honour. If we call such a man "the Pratap Singh of Bengal", then we must admit that the great hero of Haldighat, in his transit to Bengal,

Had suffered a sea-change
Into something mean and strange.

History of Bengal, II. Dacca University, 1948, 225-26 আরো দ্রষ্টব্য 502.

২৩. প্রবন্ধটি *Studies in Mughal India* গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

২৪. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, ১৩৫৯, কোলকাতা; ৸৹—৸৶৹, ৸৶৹

২৫. *Mahadji Sindhia and North Indian Affairs*, (1785-1794), Poona Residency Correspondence Series, vol. I, Bombay, 1936, Introduction, iv.

২৬. *India through the Ages* (Sir William Meyer Lectures), Calcutta, 1928, p. 4

২৭. পূর্বোক্ত, 7.

২৮. R. G. Collingwood কর্তৃক উদ্ধৃত; *The Idea of History*, Oxford University Press, 1963, paper-back ed. 281.

২৯. *India through the Ages*, I. 3.

৩০. পূর্বোক্ত, vol. I. Foreword, iii-iv.

৩১. Vincent Smith, *Oxford History of India*, London, 1919, xxiii-iv.

৩২. C. H. Philips (ed), *Historians of India, Pakistan and Ceylon*, London, 1962, p. 267.

৩৩. *History of Aurangzib*, vol. V, 495; *Short History*, 473-74.

৩৪. *History*, V, 494; *Short History*, 473.

৩৫. *India through the Ages*, 139.

৩৬. *History of Bengal*, II. 499.
৩৭. *India through the Ages* শীর্ষনামে প্রকাশিত।
৩৮. *History*, V, 493 ; পরবর্তী উদ্ধৃতির জন্য দ্রষ্টব্য 478 এবং *Short History*, 472, 463, 3.
৩৯. মারাঠা জাতীয় বিকাশ, কোলকাতা, ১৩৪৩, পৃঃ ৩ ও ১৪।
৪০. *India through the Ages*, chs. II and III.
৪১. *Shivaji*, 406.
৪২. *Fall*, I, 2.
৪৩. *India through the Ages*, 70 and 78.
৪৪. *History of Bengal*, II. 497 and 498.
৪৫. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : *India through the Ages*, ch. VI.
৪৬. মারাঠা জাতীয় বিকাশ, পৃঃ ১৬; শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৬—২৬।
৪৭. 'মুসলমান ভারতে ইতিহাসের উপকরণ', ইতিহাস (কোলকাতা), নবম খণ্ড (১৩৬৫-৬৬ সাল), তৃতীয় সংখ্যা (ফাল্গুন-বৈশাখ), ১১২-১৩।
৪৮. উপরের পাদটীকায় উল্লিখিত প্রবন্ধটির সঙ্গে দ্রষ্টব্য স্যর যদুনাথের লেখা নিম্নোক্ত রচনাগুলি : 'ইতিহাস এক মহাদেশ', ইতিহাস, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১—৪ ; 'বাঙ্গলায় ঐতিহাসিক গবেষণার সমস্যা', ইতিহাস, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৩৫-৩৯ ; 'ইসলামিক ইতিহাস চর্চায় নব-জাগরণ', ইতিহাস, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৭৩-৮১ ; 'ইতিহাস চর্চার প্রণালী', ইতিহাস, নব পর্যায়, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২২৯-৪০।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : যদুনাথের জাতীয়তাবাদী মানসিকতার জন্য দ্রষ্টব্য তাঁর 'মহারাজা দিব্য ও ভীম' প্রবন্ধ ; দেশ, ১৩৪২ সাল, ১লা চৈত্র।

বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব

এক

কোনো দেশের সভ্যতা বা সংস্কৃতি এক দিনে বা অতি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ একটি মাত্র মানবগোষ্ঠীর চেষ্টায় গড়ে ওঠে না এবং সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারাও অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণের মধ্যেও এই জটিলতার চিহ্নই চোখে পড়ে। কিন্তু যখন আমরা এই উপকরণগুলিকে আমাদের সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ বলে দাবী করতে চাই, তখন বিশেষ বিশেষ কারণে আমরা একটি ঘোরতর অসুবিধার সম্মুখীন হই। আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের সামগ্রিকতাকে আমাদের ঐতিহ্য-চেতনার মধ্যে স্থান দিতে পারি না। শুঙ্গ, কুশান, গুপ্ত, পাল ও সেন আমল যেন আমাদের কাছে কোনো দূরশ্রুত প্রতিধ্বনির মত। তাই এই সুদীর্ঘ কালের শিল্পকর্মের সঙ্গে আমাদের মানসিক যোগাযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। আমরা সুদীর্ঘ কাল ধরে ভাবতে শিখেছি যে, বখতিয়ার খিলজীর অশ্বারোহী বাহিনী যেই মাত্র বিহারে ও উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করল, তখন থেকে আরম্ভ করে ইংরেজ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত, এমন কি অত্যাধুনিক কাল পর্যন্ত, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যা কিছু ঘটেছে, শিল্পকর্মের যা কিছু অবদানের সৃষ্টি হয়েছে, তা আমাদের নিজস্ব। অথচ এ কথা অজানা নয় যে, ঐতিহ্য প্রবহমান নদীস্রোতের মত। ঐতিহ্যের ধারা বাধা পেতে পারে, কিন্তু তা ছিন্নসূত্র হয়ে আকস্মিকভাবে মাঝ পথে হারিয়ে যেতে পারে না।

মিশরের পিরামিড, স্ফিংস ও ধর্মীয় মন্দির এবং গ্রীসের পারথেনন ও রোমের কোলিসিয়ামের প্রতি আমরা নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে পারি। ঢাকা ও বরেন্দ্র যাদুঘরের ব্রাহ্মণিক, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ভাস্কর্যের প্রতি অনুরূপ নিস্পৃহ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ কি আদৌ আমাদের পক্ষে সম্ভব? এথেনস্ অথবা পারসিপোলিসের ধ্বংসস্তূপ হয়ত বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ছাড়াও আমাদের মনে কোনো এক বিষণ্ন অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু পাহাড়পুর, মহাস্থান ও ময়নামতীর পুরাকীর্তি আমাদের মনে যে অনুভূতি জাগায়, তা কি একান্তই নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ নয় এবং এ ক্ষেত্রে আমাদের তরফ থেকে যে **mental involvement** ঘটে, বিদেশী পুরাকীর্তির বেলায় আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া কি ঠিক সেই ধরনের?

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম ত আর আমাদের নিজের ধর্ম নয়। অতএব ঐ ধর্ম দুটির যা কিছু শিল্পগত অবদান, তার সঙ্গে আমাদের আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নয়। এ কথা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না যে, ধর্মমাত্রই মূলতঃ একটি বিশেষ ধারণা অথবা কতকগুলি ধারণার সমষ্টি। সাংস্কৃতিক অবদানের ক্ষেত্রে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর পক্ষে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শিল্পের সঙ্গে একাত্মবোধ সৃষ্টি করতে গেলে বোধ হয় তাই পর্বতপ্রমাণ কোনো বাধা দেখা দেয় না, কারণ কোনো ধারণাসমষ্টির সঙ্গে আমাদের দ্বন্দকলহ থাকার কথা নয়। তা ছাড়া, হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম—বিশেষ করে, এই ধর্ম দুটির যে রূপটি স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তা ধর্ম নয়, তা দর্শন ও শিল্পের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। সত্যই কোনো দর্শন ও শিল্পের সংস্পর্শে এসে মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হবার কোনো কারণ আছে কি?

এই ভূখণ্ডে যে লোকজন বহুকাল ধরে বসবাস করে আসছে, জাতিতত্ত্বের দিক দিয়ে (ethnically) তারা একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত না হলেও সমশ্রেণীভুক্ত (homogeneous)। খাদ্যাভ্যাসের দিক দিয়ে এ লোকগোষ্ঠী আজো খুব বেশী পরিমাণে অস্ট্রিক। বর্তমান কালের লোকজনের মানসিকতা বিশ্লেষণ করলেও বোধ হয় দেখা যাবে যে, তাদের মনোজগতে বহু লোকগোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণা ছায়া ফেলে গেছে। এই মতবাদটি যদি মেনে নেয়া যায়, তা হলে দেখা যাবে যে হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রত্নতত্ত্ব আমাদের সম্পূর্ণ অনাত্মীয় নয়।

কোনো পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দেয়া বর্তমান প্রবন্ধকারের উদ্দেশ্য নয়। মুসলমান ও বৃটিশ আমলের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান আমাদেরই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি শুধু এইটুকু বুঝাতে চাই যে, সুদূর অতীত থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যা কিছু এ দেশে ঐতিহ্যের রূপ নিয়েছে, তার সবটুকু আমাদের সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ এবং তার কোনো অংশ বাদ দিয়ে আমাদের সভ্যতা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। অতীতকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ ও বর্জন করতে না পারার দ্বন্দ্ব থেকে আমরা ইচ্ছা করলেই রেহাই পেতে পারি। মিশর, আরব, তুরস্ক, পারস্য, বার্মা ও ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান এ দ্বন্দ্বের বহু উর্ধ্বে উঠে গেছে।

দুই

আমাদের বক্তব্যের পরিপূরক হিসেবে এখানে আরো একটি কথা বলা দরকার। বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো রকমের অনুশীলনী বা গবেষণার

কাজে অগ্রসর হলে দেখা যাবে যে, এই কার্য কখনো বিশেষ কোনো আঞ্চলিক বা রাজনৈতিক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম শুধুমাত্র বাংলাদেশেই প্রচলিত ছিল না। সমগ্র পাক-ভারতে এই ধর্মগুলির প্রসার ত ঘটেছিলই, পাক-ভারতের বাইরেও ইসলাম ও বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপকতা লাভ করেছিল এবং প্রায় সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে হিন্দু সভ্যতার প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। সেইজন্য বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কাজটি অত্যন্ত দুরূহ। একটি বিরাট ভূখণ্ডের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে এ অঞ্চলের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মুদ্রাতত্ত্ব প্রভৃতি অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কিত।

বাংলাদেশে তথা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন এলাকায় শুঙ্গ ও কুশান প্রভাব-নির্দেশক শিল্পের নমুনা পাওয়া গেছে। শুঙ্গ ও কুশান রাজনীতি ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলগুলিকে ধর্তব্যের মধ্যে না নিলে উক্ত শিল্প নমুনাগুলির আলোচনা সার্থক হবে না। এ কথা অজানা নয় যে, বাংলাদেশের কতকগুলি অংশ গুপ্ত শাসনের অধীনে এসেছিল। এ দেশে পাঁচ, ছয় ও সাত শতকের যে প্রস্তর মূর্তিগুলি পাওয়া গেছে, তারা গুপ্ত পদ্ধতির ভাস্কর্যের পূর্বাঞ্চলীয় সংস্করণ এবং তাদের গঠনে সারনাথ থেকে প্রবাহিত গুপ্ত ঐতিহ্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। পণ্ডিতগণ দেখিয়েছেন যে, পাল ও সেন আমলের ভাস্কর্যে যে অনমনীয়তা ও প্রাকৌশলিক সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য দৃষ্টিগোচর হয়, তা গুপ্ত যুগের প্রভাব নির্দেশক।

পাল ও সেন রাজত্ব বর্তমান যুগের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সেইজন্য এ যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা উত্তর-পূর্ব ভারতের এক বিশাল অংশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঙ্গে বিজড়িত। আমরা একটু আগেই ইঙ্গিত করেছি যে উত্তর-পূর্ব ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতি সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জীবনকেও প্রভাবিত করেছে।

ভূগোল, রাজনীতি ও ধর্মীয় মানসিকতা যে সাংস্কৃতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে, বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্বে সে কথার প্রমাণ আছে। পূর্ব-ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলা দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে, বৌদ্ধ দর্শন, বৈষ্ণববাদ ও তান্ত্রিক মতবাদ এই এলাকার লোকমানসে কি গভীর, সৃষ্টিমূলক অনুপ্রেরণাই না যুগিয়েছিল! পাল রাজাদের মত পূর্ববঙ্গের খড়গ ও চন্দ্র বংশীয় শাসকগণ ছিলেন বৌদ্ধ। পূর্ব-ভারতীয় পদ্ধতির ভাস্কর্য ও চিত্রকলা এবং বাংলা ভাষার উদ্ভবের

মূলে এবং সংস্কৃততান্ত্রিক সাহিত্যের বিকাশের মূলে বৌদ্ধ দর্শন যে অন্ততঃ আংশিক-ভাবে সক্রিয় ছিল, সে কথা বোধ হয় দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব অপ্রতিহত ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। সেন ও বর্মণ রাজাদের ব্রাহ্মণিক ও বৈষ্ণব প্রবণতাও ছিল শিল্পসৃষ্টির অন্যতম উৎস। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' দেখা যায় যে, বৈষ্ণববাদের বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে সরল ও আদিম কৃষ্ণকাহিনী, অবতারবাদ ও রাধাকৃষ্ণবাদ। প্রাক-মুসলিম যুগের স্থাপত্যে বিষ্ণু তার অবতারসহ একটি প্রধান স্থান দখল করে আছে। এ দেশের স্থাপত্য সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণা করেন, সেইজন্য পূর্বোক্ত ধর্মীয় দর্শন সম্বন্ধে ধারণা লাভ তাঁদের জন্য অপরিহার্য।

একটি বিরাট অঞ্চলে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে সে আন্দোলন কোনো এক সীমিত ভূখণ্ডে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল রাজশক্তির প্রভাবে এবং এই প্রক্রিয়ার বিপরীত রূপটিও সত্য হতে পারে। বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষার ইতিহাসে বোধ হয় এই উভয়বিধ প্রক্রিয়ারই নজীর আছে। বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্বন্ধে একটি মতবাদ ক্রমশঃ স্বীকৃতি লাভ করছে। (মতটি এই : 'চর্যাপদে' যে ভাষা পাওয়া যাচ্ছে, কেবল মাত্র তা বর্তমান যুগের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলেরই ভাষা ছিল না; নেপাল, বিহার, উড়িষ্যা, বাংলা ও আসামের বিরাট এলাকার ভাষাই চর্যাপদের ভাষা। এই ভাষা রাজশক্তির পরোক্ষ প্রভাবে মুসলমান আমলে বর্তমান যুগের বাংলাদেশে বিশেষ রূপ লাভ করে এবং এই বিচ্ছিন্নতার কারণেই উড়িয়া, হিন্দী, মৈথিলী, নেপালী ও আসামী ভাষা ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমানের ভাষারীতিরূপে গড়ে উঠতে থাকে।)

মুসলমানদের আগমনের ফলে এ দেশে যে স্থাপত্যরীতি জন্ম নিল, তা পূর্ববর্তী স্থাপত্য বা ভাস্কর্য থেকে চরিত্রগতভাবে বিভিন্ন। এই স্থাপত্য সরল ও রহস্যবাদ-বিহীন; কারণ অনুষ্ঠান-ভিত্তিক ইসলামে মরমী তত্ত্ব কমই স্থান পেয়েছে। এই স্থাপত্য পদ্ধতিকে বুঝতে হলেও সমকালীন উত্তর–ভারত, ইরান ও মধ্য এশিয়ার স্থাপত্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই; কারণ, এক্ষেত্রে যোগসূত্রের প্রশ্নটি বুঝতে পারলেই এ দেশের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হওয়া যেতে পারে। মুসলিম স্থাপত্যে বাংলাদেশের ভৌগোলিক প্রভাব একেবারে কম নয়। এ ক্ষেত্রে অলঙ্করণে ও গঠনে এ দেশের খড়ের ঘরবাড়ীর গঠনপদ্ধতি ও পোড়া-মাটির শিল্প ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং মুসলিম স্থাপত্যও আবার মন্দির স্থাপত্যের পরিকল্পনা ও সংগঠনকে প্রভাবিত করেছে।

তিন

প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদকে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী কয়েক ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) স্থাপত্য, (২) চিত্রকলা, (৩) ভাস্কর্য, (৪) মুদ্রাতত্ত্ব, (৫) লিপি-শাস্ত্র প্রভৃতি। ইতিহাসের সঙ্গে বিদ্যার এই শাখাগুলির সম্পর্কের উপর নজর রেখে পণ্ডিতগণ এগুলিকে 'সহায়ক বিজ্ঞান' বা **auxiliary sciences** রূপে অভিহিত করেছেন। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকের দৃষ্টি নিয়ে দেখতে গেলে জ্ঞানবিজ্ঞানের এই শাখাগুলির স্ব-প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা যায় না। জ্ঞানের এই প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ কতকগুলি সুবিধা ভোগ করে থাকেন। অবশ্য তাঁকে অতি কঠিন ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কার্যের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। প্রত্নতত্ত্বের প্রতিটি উপাদান অতীতের মূর্ত প্রতীক বলে এ ক্ষেত্রে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তা বেশ খানিকটা বাস্তবতা-নির্ভর। কিন্তু উপাদানের বিশ্লেষণ বা সংশ্লেষণের প্রক্রিয়ায় বিশেষজ্ঞের মনের ভূমিকার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলে দেখা যায় যে, এ ক্ষেত্রেও কারো কোনো মতবাদ অনমনীয় থাকতে পারে না। ঐতিহাসিক যখন প্রত্ন-তাত্ত্বিক মাল-মশলার সাহায্যে ইতিহাসকে বুঝতে চান, তখন তিনিও বেশ খানিকটা নিশ্চিত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারেন। প্রত্নতত্ত্বের উপাদানের ব্যবহারের ফলে ইতিহাসের রূপরেখা যে কতটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে, তার একটি নজীর আছে ডঃ ভট্টশালী প্রণীত *Coins and Chronology of the Independent Sultans of Bengal* নামক গ্রন্থে। মুদ্রার ভিত্তিতে নির্ধারিত সন-তারিখগুলি এই বইটি প্রকাশিত হবার আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও প্রায় সঠিকভাবেই টিকে আছে। সন-তারিখের ক্ষেত্রে যেটুকু পরিবর্তন ঘটেছে, তাও কিন্তু ঘটেছে ভিন্ন ধরনের প্রমাণবাহী মুদ্রার আবিষ্কারের ফলে।

পুরাকীর্তির ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলিতে যেসব খনন-কার্য করা হয়, ইতিহাসের দিক থেকে তাদের গুরুত্ব খুব বেশী। পুরাতাত্ত্বিক বস্তু আবিষ্কারের ফলে ইতিহাসের ধারণায় যে কি ধরনের বিপ্লব সাধিত হতে পারে, তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি ঈজিয়ান সভ্যতার আবিষ্ক্রিয়া থেকে। এক শত বৎসর আগেও এ কথা জানা ছিল না যে, ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার একটি অংশে ঈজিয়ান সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। খনন-কার্যের ফলে বুঝতে পারা গেল যে, সেই এলাকার স্থাপত্য নিদর্শন একটি প্রাচীন সভ্যতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, উক্ত সভ্যতার মাধ্যমে এ্যাসিরিয়ান ও মিশরীয় সভ্যতার বহু প্রতিষ্ঠান ও ধারণা গ্রীক সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এখন আর এ কথা কেউ স্বীকার করবেন না যে, গ্রীসের

প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতির উপাদান সে দেশের মাটিতে আপনাআপনি গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে অতি প্রাচীন কোনো সভ্যতার নিদর্শন আশা করা যায় না ; কারণ ভূতাত্ত্বিকগণ বলেছেন যে এ দেশের প্রায় সবটাই সমুদ্রের ভিতরে ছিল এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা গঠন নিতান্তই সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। পাহাড়পুরে, মহাস্থানে ও ময়নামতীতে খনন-কার্যের ফলে এই 'সাম্প্রতিক কালে'র ইতিহাসের শূন্যতা অনেকটা পূর্ণ হয়েছে। মৌর্য-শুঙ্গ আমল থেকে শুরু করে মুসলমান আমল পর্যন্ত মহাস্থানের গুরুত্ব ছিল। ময়নামতীতে ও পাহাড়পুরে একটি ধর্মীয় সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছিল। ইতিহাসের এই জ্ঞানই কি কম গুরুত্বপূর্ণ ?

কুলজী সাহিত্যের ঐতিহাসিকতা

কুলজী গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা নিয়ে অনেক দিন আগেই প্রশ্ন উঠেছিল। অনেকেই এই গ্রন্থাবলীর তথ্যকে অনৈতিহাসিক বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের আলোচনা[১] সুদীর্ঘ, যুক্তি-নির্ভর ও অনেকটা বস্তুনিষ্ঠ। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে যে বাংলার ইতিহাস রচনায় কুলজী-গ্রন্থের সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর মতবাদের সমর্থনে তিনি কুলজী গ্রন্থের যে সমস্ত দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করেছেন, সেগুলি হচ্ছে :

ক. বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য সমাজের কৌলীন্য প্রথার ইতিহাসের সঙ্গে আদিশূর কর্তৃক কোলাঞ্চ-কনৌজ থেকে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনী অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত ; অথচ এ কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

খ. একমাত্র ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী' খ্রীস্টীয় পনর শতকে রচিত। বাকী কুলজী গ্রন্থগুলি পরবর্তীকালে রচিত অর্থাৎ নুলো পঞ্চাননের 'গোষ্ঠীকথা', বাচস্পতি মিশ্রের 'কুলরাম', ধনঞ্জয়ের 'কুলপ্রদীপ', এড়ু মিশ্রের 'কারিকা', মহেশের 'নির্দোষ কুল-পঞ্জিকা', হরি মিশ্রের 'কারিকা' এবং 'মেল-পর্যায় গণনা', 'বারেন্দ্র-কুল-পঞ্জিকা' ও 'কুলার্ণব' প্রভৃতি গ্রন্থ অর্বাচীন।

গ. পনর-ষোল শতকের হিন্দুদের ইতিহাস-জ্ঞান ছিল পরিমিত ; অতএব তাঁদের লেখা সামাজিক ইতিহাসের মূল্যও পরিমিত।

ঘ. বাদাল স্তম্ভলিপিতে ও ভট্টভবদেবের শিলালিপিতে যে দুইটি বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পরিবারের উল্লেখ রয়েছে, কুলজী গ্রন্থ তাদের সম্বন্ধে একেবারেই নীরব।

ঙ. একই ঘটনা সম্বন্ধে বিভিন্ন কুলজী গ্রন্থের তথ্যের মধ্যে গরমিল প্রচুর।

চ. জাল কুলজী শাস্ত্রেরও অভাব নেই।

উপসংহারে ডক্টর মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, কুলজী সাহিত্যের খুঁটিনাটি তথ্যের যদিও বিশেষ কোন দাম নেই, এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের কিছু কিছু আভাস খুঁজে পাওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব। এমনিভাবে আরো অনেকেই কুলজী শাস্ত্রের

সমালোচনা করে এর নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রমাপ্রসাদ চন্দের নাম উল্লেখযোগ্য।[২]

কুলজী গ্রন্থের আলোচনার পথে একটি বড় বাধা হলো অধিকাংশ গ্রন্থই দুষ্প্রাপ্য ও পাণ্ডুলিপিগুলিও অনেকেরই নাগালের বাইরে। সেজন্য প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' ও বাবু দুর্গাচরণ সান্যালের 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস'-এ বিধৃত কুলজী শাস্ত্রের তথ্যগুলি যাচাই করে নেয়া প্রায় অসম্ভব।

মুসলমান আমলের হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে অনেক অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতই এই গ্রন্থগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে বলে মনে হয়। প্রায় সবগুলি কুলজী গ্রন্থই মুসলিম আমলে রচিত। এতে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই সমসাময়িক কালের সমাজ, সংস্কৃতি ও যুগমানসের ছায়া পড়েছে; তবে কুলজী গ্রন্থের দেয়া রাজা-বাদশাহ, সামন্ত-জমিদার ও রাজনৈতিক ঘটনার কালক্রম পুরোপুরিভাবে গ্রাহ্য নয়; কারণ সেগুলি জনশ্রুতি নির্ভর। কিন্তু কুলজী গ্রন্থে বর্ণিত কোন কোন রাজনৈতিক ঘটনায় সত্যের ছিঁটে-ফোঁটা-অংশ বা ইঙ্গিত খুঁজে বের করা অসম্ভব নয়। দুর্গাচরণ সান্যালের গ্রন্থ থেকে ভট্টশালী রাজা গণেশ সম্বন্ধে যে তথ্যগুলি পরিবেশন করেছেন, সেগুলি কুলজী গ্রন্থভিত্তিক।[৩] উল্লিখিত ঘটনাগুলির মধ্য থেকে অনাবশ্যক অংশগুলি বাদ দিলে যে ঐতিহাসিক সত্যটুকু পাওয়া যায় তা হচ্ছে যে গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর মৃত্যুর পর গৌড়ের সিংহাসনকে কেন্দ্র করে বাংলার রাজনীতিতে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। আজম শাহকে হত্যা করে ভাদুড়ী ব্রাহ্মণগণ তাঁর অযোগ্য পুত্র সঈফউদ্দীনকে বাংলার সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন এ দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের জন্য। তাঁদের সে উদ্দেশ্য সফলও হয়েছিল। সঈফউদ্দীনের মৃত্যু হলে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে কলহ বাধে। এই সুযোগে রাজা গণেশ তাঁর উন্নতির পথ নিষ্কণ্টক করতে বদ্ধপরিকর হন। লড়াইয়ে কনিষ্ঠ পুত্রের প্রাণ যায়। জ্যেষ্ঠ পুত্র শামসউদ্দীন (শিহাব উদ্দীন)[৪] কিছুদিন রাজত্ব করলেও অবশেষে রাজা গণেশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হন। আশ্চর্যের বিষয়, কুলজী গ্রন্থের এই বিবরণের সঙ্গে 'তারিখ-ই-ফিরিস্তা' 'তবকত্-ই-আক্‌বরী' ও 'রিয়াজ-উস-সলাতীনে'র বর্ণনার বেশ খানিকটা মিল আছে। 'রিয়াজে' স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, আজম শাহ ও শিহাবউদ্দীনের মৃত্যুর জন্য রাজা গণেশই দায়ী[৫]। সাময়িককালের আরবী ইতিহাসেও এই কথার আংশিক সমর্থন রয়েছে।

এই রকমভাবে আরো দেখানো যেতে পারে যে, কুলজী গ্রন্থের দেয়া রাজনৈতিক ঘটনাগুলির মধ্যে কিছু কিছু ঐতিহাসিক সত্য অপ্রত্যাশিতভাবেই লুকিয়ে আছে[৬]। তবে রাজনৈতিক ঘটনা বা তার ঐতিহাসিক সত্যাসত্যই কুলজী গ্রন্থের বিশেষত্ব নয়।

দুই

মধ্যযুগের বাংলার ব্রাহ্মণ সমাজ সম্বন্ধে কুলজী গ্রন্থমালা যে সুদীর্ঘ বিবরণ দিয়েছে, তা যেমন অর্থবহ, তেমনি ইঙ্গিতময়। সমসাময়িক সাহিত্য ও ইতিহাসের আলোকে সেই প্রসঙ্গই এখানে আলোচিত হবে।

কুলজী সাহিত্যে কুলীন ব্রাহ্মণদের যে সমাজ-চিত্রটি আমরা পাই, তা কতকটা এইরূপ :[৭]

> মুসলমানদের সাহচর্যে এসে কুলীন ব্রাহ্মণদের কৌলীন্য পদে পদে আহত হচ্ছিল; তাঁরা সমাজে পতিত বলে গণ্য হচ্ছিলেন। তার ফলে হিন্দু সমাজে আলোড়ন জাগে। এই সমস্যার সমাধানের জন্যে স্থাপিত হলো 'জাতিমালা কাছারী' নামে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে ছিলেন দত্ত খাস বা দত্ত খান নামক একজন ব্রাহ্মণ। তিনি ছিলেন নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের (মৃত্যু ১৪৫৯ খ্রীস্টাব্দ) একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। দত্ত খান রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে সাতান্নতম সমীকরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপর উদয়নাচার্য ভাদুড়ী নামে আর একজন সমাজ-সংস্কারক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদেরকে কয়েকটি 'পটী'তে বা 'কাপে' আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। এর পরে প্রবর্তিত হলো দেবীবরের মেল প্রথা। কুলীন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের দোষমুক্ত করবার জন্য তিনি ১৪৮০ খ্রীস্টাব্দে তাঁদেরকে ৩৬টি মেলে বিভক্ত করে দেন। কতকগুলি মেলের নাম হলো : বল্লভী, সুরাই, চট্ট রাঘবী, ভৈরব ঘটকী, মাধাই, চান্দাই, বিজয় পণ্ডিতী, শতানন্দখানি, মালাধরখানি, দশরথ ঘটকী, কাকুস্থী, চন্দ্রাপতি, গোপাল ঘটকী, বিদ্যাধরী, পরমানন্দ মিশ্রী, চয়ী, কুলিয়া, খড়দহ, দেহটা, বাঙ্গাল, বালি, নড়িয়া, পণ্ডিতরত্নী, আচম্বিতা, আচার্যশেখরী, চায়ী, পরিহাল, শৃঙ্গসর্বানন্দী, প্রমোদিনী, হরি মজুমদারী ইত্যাদি।

মেল প্রথা প্রবর্তনের ফলে কুলীন ব্রাহ্মণদের সামাজিক পদমর্যাদা অটুট রইলো; বিভিন্ন দোষের ছোঁয়াচ পেয়েও তাঁরা পুরোপুরিভাবে কৌলীন্য-বর্জিত হলেন না। কুলজী সাহিত্যের এই তথ্য যদি নির্ভুল হয়, তবে বলতে হয় যে হিন্দুসমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসে দেবীবরের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই গোঁড়া

সমাজ ব্যবস্থার যুগে তিনি ছিলেন এক উদার প্রগতিশীল সংস্কারক। পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সমঝোতা করতে গিয়ে তিনি কুলীন সমাজকে ভেতরের দিকে সংহত করলেন, আর এমনি করেই কৌলীন্য প্রথার ঠুনকো কাঠামোকে তিনি রক্ষা করলেন এক অনিবার্য পতন থেকে।

মেল প্রথা প্রবর্তনের পেছনে অনেকগুলি কারণ ছিল। কুলীন ব্রাহ্মণগণ মুসলমানদের সংস্পর্শে এসেছিলেন বলে তাঁদের যবনদোষের ছোঁয়াচ লাগে। কুলজী গ্রন্থে এ কথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে ভৈরব ঘটকী, দেহটা ও হরি মজুমদারী মেল যবনদোষ থেকে উৎপন্ন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু তো দেখিয়েছেন যে প্রত্যেকটি মেলে কিছু না কিছু যবনদোষ প্রবেশ করেছিল। যবনদোষ ছাড়া আরো হাজারো রকমের দোষ ছিল যা কুলীন ব্রাহ্মণদেরকে যে কোন মুহূর্তে স্পর্শ করতে পারত। সন্তানহীনতা, গণিকালয় গমন, স্বজনের মধ্যে বিবাহ, দুষ্ট বা বিকলাঙ্গ মেয়ের সঙ্গে বিবাহ, ব্রাহ্মণ হত্যা, ব্যভিচার প্রভৃতি কারণে কুলীন ব্রাহ্মণদের দোষ ঘটত[৮]। কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে তাঁরা এমনিভাবে পৃথক হয়ে পড়েছিলেন আর তার ফলে গোটা সমাজটার মধ্যে একটা বিরাট ভাঙ্গন দেখা দিচ্ছিল। দেবীবর কুলীন সমাজকে এই ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাই তাঁর মেল প্রথা প্রবর্তনের প্রয়াস।

এখন প্রশ্ন হলো, মেল প্রথা প্রবর্তনের এই ইতিহাস বর্ণে বর্ণে সত্য কি না। সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের কথা চিন্তা করলে কুলজী গ্রন্থের দেয়া ব্রাহ্মণদের সমাজ-মানসের এই পরিচয় নির্ভুল বলেই মনে হয়। এখানে কুলজী সাহিত্য অন্ততঃ এই কথাটি বলে দিচ্ছে যে, মুসলমান আমলে উচচস্তরের হিন্দু-সমাজে চাঞ্চল্য জেগেছিল। মুসলিম রাজশক্তির ও ইসলাম ধর্মের আওতায় পড়ে এবং আরো বিভিন্ন কারণে হিন্দু সমাজ তার বিধি-নিষেধের ভোল বদলিয়ে নিতে চেষ্টিত হয়েছিল।

তিন

প্রাক-মুসলিম যুগে এ দেশের শাসনক্ষমতা ব্রাহ্মণদের হাতেই ছিল। পদমর্যাদার দিক দিয়েও তাঁদের সমকক্ষ আর কেউই ছিল না ; কিন্তু বাংলাদেশ মুসলমানদের দখলে এলে তাঁরা এক বিরাট ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। রাজশক্তি মুসলমানদের হাতে। সামাজিক প্রাধান্য ব্রাহ্মণদের রইলো বটে, রাজশক্তি-বঞ্চিত অবস্থায় সে প্রাধান্য হলো অনেকটা খর্ব। মুসলমানের দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর হিন্দুতে কোন ভেদও রইল না। মুসলমানদের আবির্ভাবে যে রাজনৈতিক

ও সামাজিক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো তার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের কিছুটা আপোষ-রফা হওয়ার কথা।

সেই আপোষ-মীমাংসার গতি ও প্রকৃতি পূর্ণতা পাওয়ার আগেই বাংলার ইতিহাসে যে স্মরণীয় অধ্যায়টির সংযোজনা ঘটলো তা হচ্ছে রাজা গণেশের আবির্ভাব। হিন্দু সমাজের গভীরে যে চাঞ্চল্য বহু দিন ধরে ক্রিয়া করে আসছিল এটা তারই একটা স্বাভাবিক অভিব্যক্তি কি না, তাই বা কে বলবে! কুলজী সাহিত্যে তো একথা বার বার বলা হয়েছে যে, রাজা গণেশের রাজনৈতিক সাফল্যের পেছনে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের সক্রিয় সমর্থন ছিল।[৯] এ কথা খুব সহজে উড়িয়ে দেবার মত নয়। এই রাজনৈতিক ঘটনার কারণ যাই হোক না কেন, এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারা যায় যে, রাজা গণেশের আমল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি রেনেসাঁর যুগ। এই প্রসঙ্গে খ্যাতনামা পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কুলীন ব্রাহ্মণ গৌড়ের সুলতানের নিকট থেকে যে সব সম্মানসূচক উপাধি পেয়েছিলেন, সেগুলি হলো কবি চক্রবর্তী, রাজপণ্ডিত, পণ্ডিত-সার্বভৌম, কবি-পণ্ডিত-চূড়ামণি, মহাচার্য ও রায়মুকুট। তাই তাঁর মুখেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে সুলতান জলালউদ্দীন মুহম্মদ শাহের প্রশস্তি :

> গজদন্তের (গণেশের ?) সেই পুত্র দীর্ঘায়ু হোন, যিনি বিভিন্ন গুণে গুণবান, যিনি নিজ বাহুবলে সৌভাগ্যশ্রী অর্জন করে শ্রীরায় রাজ্যধর উপাধি লাভ করেছিলেন। নৃপতি জল্লালদীন (জালালউদ্দীন) তাঁর (বৃহস্পতি মিশ্রের) গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সেনাপতিত্ব অর্পণ করলেন এবং তাঁকে বিবিধ অলঙ্কার, হস্তী, অশ্ব এবং স্বর্ণরৌপ্য···প্রদান করলেন। তুর্য, শঙ্খ ও ছত্ররাজি দিয়ে তিনি তাঁকে সম্মানিত করলেন[১০]।

বৃহস্পতির পুত্রেরাও ছিলেন রাজমন্ত্রীদের শিরোভূষণ ও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত[১১]। ব্রাহ্মণগণই এযুগে সবচেয়ে বেশী লব্ধপ্রতিষ্ঠ। বৃহস্পতি মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি বই লিখেছিলেন ; সেগুলি হচ্ছে, 'স্মৃতি রত্নহার', 'গীতগোবিন্দ-টীকা', 'কুমার-সম্ভব-টীকা', 'রঘুবংশ-টীকা', 'মেঘদূত-টীকা', 'শিশুপাল-বধ-টীকা' ও 'পদ-চন্দ্রিকা' (অমরকোষের টীকা)। সংস্কৃত সাহিত্যে এ যেন সৃষ্টির এক প্রবল জোয়ার! আর এই সংস্কৃত সাহিত্যই ছিল তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বাহন।

পনর শতকের প্রথমদিকে গণেশের বংশের পতন হলো। তার ফলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি রাজশক্তির আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয় আর বিদেশী শাসকদের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ কোন পক্ষপাতিত্বও থাকার

কথা নয়; তবে লৌকিক সংস্কৃতি ও তার ধারক দেশী ভাষা বাংলার প্রতি তাঁরা যেন বেশ একটু ঝুঁকে পড়েছিলেন। তাঁদের এই বিশেষ প্রবণতার পেছনে কারণও ছিল। সামরিক সাফল্য ও শাসন সংক্রান্ত স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজন ছিল সাধারণ লোকের সহানুভূতি ও সমর্থন এবং জনগণের কালচারের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমেই তা অর্জন করা সম্ভব। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি একটি শ্রেণী-বিশেষের সংস্কৃতি, সর্বসাধারণের সংস্কৃতি নয়। সাধারণ লোকের সংস্কৃতি ক্রমশঃ রূপ পাচ্ছিল বাংলা ভাষার মাধ্যমে। তাই তাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন ও সাহায্য এই ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারার পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল। তা ছাড়া সংস্কৃত এ যুগের দরবারী ভাষাই নয়; তা হলে হয়তো রাজশক্তিকে অবলম্বন করে এই সময়ে সংস্কৃত সাহিত্য গড়ে ওঠা সম্ভবপর হতো। পনর শতকের শেষে ও সারা ষোল শতকে যে সংস্কৃত সাহিত্যের সৃষ্টি হলো তার সঙ্গে রাজসভার যোগাযোগ নেই বললেই চলে; তার প্রধান অবলম্বন হলো ব্রাহ্মণদের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ও ব্যক্তিগত সামর্থ। সমসাময়িক কালের বাংলা সাহিত্য যদিও সুলতানদের প্রশংসায় মুখরিত; সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁদের উল্লেখ খুবই কম। কারণটা সহজবোধ্য।

এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, ব্রাহ্মণগণ এ সময়ে রাজশক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগিতা ঘোষণা করেছিলেন। রূপ, সনাতন, জীব, জগাই ও মাধাই-এর মত অনেক ব্রাহ্মণই এ সময়ে গৌড়ের সুলতানের অধীনে কাজ করছিলেন; কিন্তু এই সমঝোতা হয়েছিল নিতান্তই প্রয়োজনের তাগিদে। রাজ সরকারে উচ্চ পদে বহাল থাকা সত্ত্বেও তাই যখন শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হলো, তখন রূপ-সনাতন তাঁকে লক্ষ্য করে অনুতাপের সুরে বলেছিলেন[১৭]:

> ম্লেচ্ছ জাতি ম্লেচ্ছসেবী করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম।
> গোব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম।।
> মোর কর্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
> কুবিষয় বিষ্ঠা গর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া।।
> আমা উদ্ধারিতে বলি নাহি ত্রিভুবনে।
> পতীত-পাবন তুমি—সবে তোমা বিনে।।

বৈষয়িক ব্যাপারে যখন তাঁদের অতটা সাফল্য, আধ্যাত্মিক জীবনে তখন তাঁদের ততটাই আত্মগ্লানি। জাতি সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদের স্বাভাবিক স্পর্শকাতরতাই হয়ত এর জন্য দায়ী—হয়ত তাঁরা মুসলমানের অধীনে চাকুরি করার জন্য ব্রাহ্মণ সমাজে একেবারেই অপাংক্তেয় হয়ে গিয়েছিলেন।

রাজকার্যে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থগণও নিজেদের অধিকার বিস্তার করেছিলেন। পনর ষোল শতকে বাংলার কায়স্থ পরিবারগুলিকে কেন্দ্র করে একটি ভূমি-নির্ভর মধ্যবিত্ত সমাজ ক্রমশঃ গড়ে উঠেছিল। কায়স্থ রামচন্দ্র ছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার একজন অধিকারী। মুসলমান অধিকারীর কাছ থেকে সপ্তগ্রাম মুলুক কেড়ে নিয়ে মোকতা খাজনায় ভোগ করতে দেয়া হয়েছিল মজুমদার হিরণ্য দাসকে। তিনি রাজস্ব আদায় করতেন বিশ লাখ আর রাজকর দিতেন বার লাখ[১৩]। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচয়িতা মালাধর বসু ছিলেন বারবক শাহের কর্মচারী। তিনিও তো কায়স্থ। এর থেকে এই প্রমাণিত হয় যে, রাজকার্যের ক্ষেত্রেও এযুগে ব্রাহ্মণদের আর একচ্ছত্র অধিকার ছিল না।

ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্য ত এ ধরনের ইঙ্গিতই করছে যে, মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সংঘর্ষই হয়েছিল। 'চৈতন্য ভাগবতে' বলা হয়েছে যে, পনর শতকের শেষভাগে নবদ্বীপের লোকেরা বিশ্বাস করত যে গৌড়ের সিংহাসন ব্রাহ্মণদের অধিকারে আসবে:

কেহ বলে বিপ্র রাজা হইবেক গৌড়ে,
সেই বুঝি এই হেন কখন না নড়ে[১৪]।

এই বিশ্বাসের পরিণাম যে কি ভয়াবহ হয়েছিল সেই চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গল'-এ। একবার কতকগুলি লোক গৌড়েশ্বরকে বললো:

নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিব প্রমাদ॥
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে হেন আছে।
নিশ্চিন্তে না থাকহ প্রমাদ হবে পাছে॥
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা।
গন্ধর্বে লিখন আছে ধনুর্দ্ধর প্রজা[১৫]॥

এরপর সুলতান ব্রাহ্মণদের উপরে যথেষ্ট অত্যাচার করলেন। গঙ্গাস্নান, পূজাপার্বন ও হাটঘাট বন্ধ হল। অনেক ব্রাহ্মণই প্রাণ হারালেন; কেউ কেউ আবার প্রাণ ভয়ে পালিয়ে গেলেন। কবি যেন এই সংঘর্ষের ব্যাখ্যা করতে গিয়েই বলেছেন, 'ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।' তারপর সে দুর্যোগের অবসান হল। জয়ানন্দের এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত হলেও বোধ হয় একেবারে ঐতিহাসিক সত্য-বর্জিত নয়। মুসলমানকে সরিয়ে গৌড়ের সিংহাসনে ব্রাহ্মণকে বসানোর ষড়যন্ত্র হয়েছিল কি না, বলা কঠিন; কিন্তু 'চৈতন্য ভাগবত' ও 'চৈতন্য-মঙ্গল' থেকে অন্ততঃ এটুকু অনুমান করা অন্যায় হবে না যে, ব্রাহ্মণগণ মুসলমান রাজশক্তিকে

সুনজরে দেখতেন না। জয়ানন্দের বর্ণনায় তাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, নবদ্বীপের পিরল্যা গ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতি সুলতানের আক্রোশ প্রচণ্ড ধারায় ভেঙ্গে পড়ছে; অথচ ব্রাহ্মণেতর হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করা হচ্ছে, এমন কোন চিত্র ত কবি আঁকছেন না। কারণটা খুব সম্ভব রাজনৈতিক, ধর্মীয় নয়।

রাজশক্তির সঙ্গে একদিকে যেমন ব্রাহ্মণদের যোগসূত্র শিথিল, অন্যদিকে তেমনি আবার তাঁদের সমাজের উপরে মুসলিম প্রভাব প্রকট। জয়ানন্দের কাব্যে এই ধরনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, দাঁড়ি রাখা, 'মোজা পাএ নড়ি হাথে' কামান ধারণ ও মসনবি আবৃত্তি করা ব্রাহ্মণদের মধ্যে রীতিমত একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

চার

এই ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন উপায়ে মোকাবিলা করতে চেষ্টা করেছেন। চৌদ্দ পনর শতকে শূলপানি ও রায়মুকুট বৃহস্পতি রচনা করলেন স্মৃতিগ্রন্থ। ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে রঘুনন্দন যে বিরাট স্মৃতিশাস্ত্র লিখলেন তার মধ্যে একটি বিশেষ মানসিকতার পরিচয় মেলে। তিনি তাঁর 'স্মৃতি তত্ত্বে'র মাল-মসলা সংগ্রহ করেছেন গীতা, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এবং মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, পরাশর ও অগস্ত্য রচিত স্মৃতি ও সংহিতা থেকে। তা ছাড়া তিনি জীমূত-বাহন, ভবদেব ভট্ট, শূলপানি, বৃহস্পতি প্রভৃতি বাঙ্গালী নিবন্ধকারের মতামতও গ্রহণ করেছেন। এমনিভাবে তিনি হিন্দুদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের বিধি-নিষেধ শেষবারের মত বেঁধে দেন। এটা বোধ হয় ইসলামিক ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেতর প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলবার সচেতন প্রচেষ্টা। প্রাক্-মুসলমান যুগে বৌদ্ধ ধর্মের ছোঁয়াচ থেকে আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে রক্ষা করার জন্যও এমনি ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। সে কালের স্মৃতিগ্রন্থেই এই মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কুলজী গ্রন্থেও রয়েছে মুসলমান আমলের ব্রাহ্মণদের একটি বিশেষ মানসিক অবস্থার প্রতিফলন। কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজ মুসলিম প্রভাবের আওতায় পড়ে বিপদ গণছিল এবং সেই জন্যই এ সমাজে মেল-কাপ-পটী-বন্ধন ও ঘনঘন সমীকরণ সাধন। এ ব্যবস্থা অবশ্য অনেকেরই পছন্দ হয়নি। নুলো পঞ্চানন দেবীবরের মেল প্রথা পছন্দ করেননি। তিনি সবাইকে আবার পুরনো সমাজ-ব্যবস্থায় ফিরে যেতে বলেছেন। একটু তলিয়ে দেখতে গেলে, এটা হল ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল শক্তির মধ্যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব।

কাজেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, বাংলা সাহিত্য ও বাংলার ইতিহাসে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের সন্ধান মিলছে, কুলজী সাহিত্যেও রয়েছে তার সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক ইঙ্গিত। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক ও গ্রহবিপ্র, ব্রাহ্মণদের এই চার বিভাগও অনৈতিহাসিক নয়। তা ছাড়া কুলজী শাস্ত্রে তাঁদের যে গাঞী-বিভাগ দেয়া হয়েছে তাও অন্ততঃ আংশিকভাবে সমর্থনযোগ্য। জনশ্রুতিকে কেন্দ্র করেও অনেক সময় অনেক সত্য বহুদিন ধরে বেঁচে থাকে। কুলজী গ্রন্থগুলির মধ্যে যেগুলি সবচেয়ে অর্বাচীন, সেগুলিতেও অসংখ্য জনশ্রুতির একটা ক্ষীণধারা বয়ে চলেছে। এগুলির একটা মূল্য আছে, সে মূল্য যত সামান্যই হোক না কেন। কুলজী সাহিত্যের তথ্যরাশি এ দেশের সাহিত্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকে বিচার করে যদি সন্তোষজনক মনে হয় তবে তা নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য ; তবে এর ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে অনেক কল্পনা ও গল্প গুজব মিশে গেছে। সেজন্য কুলজী গ্রন্থ থেকে ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ[১৬]।

তথ্য-নির্দেশ

১. দ্রষ্টব্য : *History of Bengal*, vol. I. Dacca University, 1943. pp. 623—37 এবং ভারতবর্ষ, ১৩৪৬, কার্তিক-ফাল্গুন।
২. *Indo-Aryan Races*, Rajshahi, 1916, ch. v.
৩. *Coins And Chronology of The Early Independent Sultans of Bengal*, Cambridge, 1922, pp. 80-86.
৪. ফারসী ঐতিহাসিক গ্রন্থে ও কুলজী সাহিত্যে এই সুলতানের নাম শমস উদ্দীন ; কিন্তু তাঁর মুদ্রা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তাঁর নাম ছিল শিহাব উদ্দীন বায়াজীদ। ফিরিস্তার গ্রন্থে ও 'তবকত-ই-আকবরী'তে তাঁকে সঈফউদ্দীন হামজার পুত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। 'রিয়াজে' বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন সঈফউদ্দীন হামজার পোষ্য পুত্র। আবার কুলজী গ্রন্থে এরূপ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি সঈফউদ্দীন হামজার উপপত্নীর গর্ভজাত ছিলেন। মুদ্রায় তিনি 'সুলতানের পুত্র সুলতান' অথবা 'হামজা শাহের পুত্র' বলে নিজেকে ঘোষণা করেননি।
৫. মূল ফারসী গ্রন্থের ১০৮ ও ১১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
৬. কুলজী গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁ-এর কাছাকাছি অবস্থিত বজ্রযোগিনী গ্রামের একজন তরুণী বিধবা ব্রাহ্মণীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি তার নাম রেখেছিলেন ফুলমতী বেগম। ডক্টর ভট্টশালী জানাচ্ছেন যে, মুনশীগঞ্জের ব্রজ-যোগিনী গ্রামে ফুলমতীর দীঘি নামে একটি পুরনো দীঘি আছে। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩। কে জানে এই দীঘি কোন ফুলমতীর স্মৃতি বহন করছে !

৭. নগেন্দ্রনাথ বসু : বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, vol. I, pt. I, পৃঃ ১৯২-২০২।

৮. ঐ, পৃঃ ২০৪।

৯. নগেন্দ্রনাথ বসু : বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, vol. I, pt. I, পৃঃ ১৯৪ ও vol. III. পৃঃ ৬৪-৬৫।

১০. 'স্মৃতি রত্নহার' : (ডক্টর হাজরা কর্তৃক উদ্ধৃত) : *Indian Historical Quarterly*, vol. XVII, No. 4, p. 447.

১১. পদচন্দ্রিকা : ঐ, p. 444 ; ডক্টর সুকুমার সেন : মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালী, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, ১৩৫২, পৃঃ ১২ ।

১২. শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত : অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩২৫, পৃঃ ৭৬ ।

১৩. ঐ, পৃঃ ২৭৯ ও ২৯৩-৯৪।

১৪. শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, ৪র্থ সংস্করণ ; (মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত), কলিকাতা, ৪৪০ গৌরাঙ্গাব্দ, পৃঃ ৭৫।

১৫. চৈতন্য-মঙ্গল, (অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩০৭, পৃঃ ১১।

১৬. এই প্রবন্ধটি Historical value of Kulaji Literature শীর্ষক ইংরেজী প্রবন্ধের পরিবর্তিত সংস্করণ। ইংরেজী প্রবন্ধটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের আলোচনা-সভায় ১৯৫৭ সালে পঠিত ও আলোচিত হয়।

মধ্যযুগের মুসলিম শাসকদের মুদ্রা-অঙ্কনে একটি ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য

বহুদিন ধরে এ ধারণা পণ্ডিতগণের মনে দৃঢ়মূল ছিল যে, কোনো মুসলমান খলীফা বা সুলতানের উৎকীর্ণ মুদ্রা শুধু তাঁর সার্বভৌমত্বেরই প্রতীক বা **insignia of sovereignty**। মধ্যযুগের মুসলিম শাসকদের মুদ্রার আলোচনায় এই ধারণাটি এতই গুরুত্ব পেয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে যে বিশেষ কোন ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে, তা পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘকাল মনে স্থান দিতে পারেননি। কোনো মুসলিম শাসকের জীবিত অবস্থায় তাঁর ভ্রাতা বা পুত্র কর্তৃক মুদ্রা অঙ্কনকে স্বাভাবিকভাবেই বিদ্রোহের সূচক বলে ধরে নেয়া হয়েছে। ব্যতিক্রমধর্মী পরিস্থিতির পেছনেও যে মুদ্রা তৈরীর ঘটনাটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাজ করতে পারে তা মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস ও মুদ্রাতত্ত্ব আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। **Nevil** ও **H. N. Wright**[১] প্রমুখ মুদ্রাতত্ত্ববিদগণ অবশ্য ফিরোজ তুগলকের পুত্র ফতেহ খান কর্তৃক জৌনপুর ও পাটনা থেকে ১৩৫৮ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রা অঙ্কনের ঘটনাকে বহুদিন আগেই ব্যতিক্রমধর্মী রূপে চিহ্নিত করেছেন। মুসলিম বাংলার ইতিহাস আলোচনায় ব্যতিক্রমধর্মী মুদ্রাগুলোকে ব্লকমান, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিকা রঞ্জন কানোনগো, এমনকি নিতান্ত সাম্প্রতিককালে রমেশচন্দ্র মজুমদারও বিদ্রোহের পরিচায়ক বলে ধরে নিয়েছেন। খুব সম্ভব আবু মোহামেদ হবিবুল্লাহই প্রথম বলেন যে, বাংলার সুলতানগণের জীবিত অবস্থাতেই অন্ততঃ কয়েকটি ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী হিসেবে যুবরাজগণের মুদ্রা জারির অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছিল।[২] এই অভিমত আবদুল করিম ও বর্তমান প্রবন্ধের লেখক কর্তৃক গৃহীত হয়; কিন্তু এই প্রথা শুধু বাংলাদেশেই সীমিত ছিল না, দিল্লী সালতানাতে এবং জৌনপুর রাজ্যের ইতিহাসেও এজাতীয় প্রথার প্রচলন দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া এর জড় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে আব্বাসীয় খলীফা আল-মনসুরের (৭৫৪-৭৫ খ্রীঃ) বহু মুদ্রাতে এবং তাঁর পরবর্তী খলীফাগণও পুত্র অথবা অন্য কাউকে খিলাফতে উত্তরাধিকারী রূপে মনোনয়নের সময়ে 'ওয়ালি আহাদ' বা উত্তরাধিকারী যুবরাজের নাম মুদ্রায়, রাজকীয় পতাকায় ও অস্ত্রশস্ত্রে উল্লেখ করতেন। উক্ত পদে অভিষেকের সময়ে 'ওয়ালি আহাদ-উল-মুসলিমিন' বা 'মুসলমানদের উত্তরাধিকারী' এবং 'আমীর' ছাড়াও যুবরাজকে অন্যবিধ

উপাধিও দেয়া হত। উত্তরাধিকারী মনোনয়ন উপলক্ষে খলীফা ও তাঁর উত্তরাধিকারীর নিকট জনসাধারণ আনুগত্যের শপথ নিত। উত্তরাধিকারিগণ সাধারণতঃ কতকগুলি অঞ্চলের শাসনকর্তৃত্ব পেতেন এবং সেই অঞ্চলগুলির প্রশাসনিক কেন্দ্র বা বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে তাঁরা মুদ্রা চালু করতেন। ঐ মুদ্রাগুলির গায়ে খলীফার নাম ও উপাধি ছাড়া উত্তরাধিকারীর নাম ও উপাধিসমূহের উল্লেখ দেখা যায় এবং সাধারণতঃ এই কথাটিও উল্লিখিত হয়েছে যে, উক্ত মুদ্রাগুলি উত্তরাধিকারীর আদেশে উৎকীর্ণ। এই প্রথা মামুনের (৮১৩-৩৩ খ্রীঃ) সময় পর্যন্ত চালু ছিল। মুতওয়াক্কিলের রাজত্বকাল (৮৪৭-৬৩ খ্রীঃ) থেকে মনোনীত উত্তরাধিকারীর উপাধি-মাত্র মুদ্রায় উল্লিখিত হতে লাগল। 'ওয়ালি আহাদ' বা উত্তরাধিকারী যুবরাজের উপাধি ও নাম মুদ্রায় উল্লেখ করা বা তাঁকে মুদ্রা জারি করার অধিকার প্রদান এমনিভাবে একটি প্রতিষ্ঠানে (institution) পরিণতি পায়। পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানিক (institutionalised) রূপই মিশর, সিউটা, স্পেন ও গজনীর মুদ্রারীতিতে ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় স্থান করে নেয়। আব্বাসীয়গণ খুব সম্ভব বাইজাণ্টাইন মুদ্রারীতি দ্বারা এ ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়েছিলেন; কারণ হেরাক্লিয়াসের গ্রীক ও ল্যাটিন টাইপ মুদ্রায় তাঁর সন্তানদের প্রতিকৃতি স্থান পেত সম্রাটের প্রতিকৃতির পাশাপাশি এবং এ জাতীয় মুদ্রাই উমাইয়া খলীফাগণ অনুকরণ করেছিলেন। **The Muslim Crown Prince in The Light of Numismatic Records** শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়টি বিশদভাবে বর্তমান প্রবন্ধের লেখক কর্তৃক আলোচিত হয়েছে।[৩] মুদ্রার উপরে উত্তরাধিকারীর নাম উল্লেখের পেছনে বিশেষ কারণ ছিল। আব্বাসীয় সভ্যতা ছিল প্রধানতঃ নগর সভ্যতা (urban civilization) যা মুখ্যত নির্ভরশীল ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর এবং গৌণভাবে কৃষিজ উৎপন্নের উদ্বৃত্তের উপর। মুদ্রার প্রয়োজন বেশী করে অনুভূত হত নগরকেন্দ্রগুলিতে বা শহর-বন্দরে যেখানে স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রা ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হত এবং যেখান থেকে বণিকদের মাধ্যমে মুদ্রাগুলি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ত। তা ছাড়া নগরগুলিতে সামন্ত, প্রশাসক, উলেমা, শিল্পী ও অন্যান্য লোকজনও মুদ্রা হাতে পেত। এ ক্ষেত্রে মুদ্রাকে প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা ছিল খুব স্বাভাবিক—কারণ অন্য ধরনের প্রচার-মাধ্যম সে যুগে বেশী ছিল না। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন মুদ্রার মারফৎ খলীফা কর্তৃক উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ঘটনাটি জানতে পেরে এই বাস্তবকে মেনে নেয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হত।

বাংলার সুলতানদের মধ্যে ইওয়াজ খিলজী যে আব্বাসীয় মুদ্রা-ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তার প্রমাণ আছে তাঁর নামে অঙ্কিত মুদ্রায়। তিনিই সর্বপ্রথম ৬১৭ হিঃ/১২২০ খ্রীঃ এবং ৬১৯ হিঃ/১২২২ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রার উপরে তাঁর উত্তরাধিকারী বা 'ওয়ালি আহাদ'-এর উপাধি 'আলা-উল-হক ওয়াদদীন' শব্দ-সমষ্টির মাধ্যমে প্রচার করেন।[৪] পরবর্তীকালে এই রীতি রূপান্তরিত হয়। উত্তরাধিকারিগণ যে সকল অঞ্চলে শাসনকর্তৃত্ব পেতেন, সেই অঞ্চলগুলিতে অবস্থিত প্রশাসনিক কেন্দ্র বা ব্যবসাকেন্দ্র থেকে সরাসরি নিজ নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন। পিতার জীবিত অবস্থায় যে সকল উত্তরাধিকারী রাজপুত্র নিজ নিজ নামে মুদ্রা জারির প্রয়াসী হন তাঁদের মধ্যে সামস উদ-দীন ফিরোজের তিন পুত্র, এবং নাসির উদ-দীন মাহমুদের পুত্র বারবাকের নাম উদাহরণ রূপে উল্লেখ্য। দেখা যাচ্ছে যে, হুসেনশাহী বংশ প্রতিষ্ঠার বহু আগেই মুসলিম জগতের একটি বিশাল অংশে মুদ্রা-ব্যবস্থায় একটি বিশেষ রীতি চালু হয়ে গিয়েছিল এবং এই রীতি যে বাংলার সুলতানগণ নির্দ্বিধায় গ্রহণ করবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। 'ইতিহাস' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ('হসায়েনশাহী আমলে মুদ্রা উৎকীর্ণতায় অনিয়ম ও এর তাৎপর্য', ৯ম বর্ষ (১৩৮২), ১ম-৩য় সংখ্যা, বৈশাখ-চৈত্র) হুসেনশাহী সুলতানদের মুদ্রা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ফিরোজ মাহমুদ যে সমস্ত প্রশ্ন তুলেছেন, তা উপরে উল্লিখিত মুদ্রাতাত্ত্বিক পটভূমির সঙ্গে বিশেষ-ভাবে সম্পর্কিত।

নুসরত যে হুসেন শাহের রাজত্ব-কালেই মুদ্রা চালু করেছিলেন, এবং তিনি যে এ অধিকার সুলতানের উত্তরাধিকারী রূপেই পেয়েছিলেন সে কথা বর্তমান প্রবন্ধের লেখকসহ আরো কেউ কেউ বলেছেন। সিংহাসন লাভের পূর্বে এই যুবরাজ ৯১৮ হিঃ/১৫১২ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রা জারি করেন। এই তারিখের একটি মাত্র মুদ্রা ঢাকা যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। আবদুল করিম মুদ্রায় ১ ও ৮ সংখ্যা দুটি দেখে ধরে নিয়েছেন যে, এর তারিখ ৯১৮ হিঃ/১৫১২ খ্রীস্টাব্দ। ফিরোজ মাহমুদের ধারণা, আরবি ২-এর মাথা কেটে গিয়ে বাম ধারের সংখ্যাটি ১ বনে গিয়েছে—অর্থাৎ উক্ত তারিখটি ৯১৮/১৫১২ না হয়ে হবে বরং ৯২৮ হিঃ/১৫২২ খ্রীস্টাব্দ। এ ধারণা ঠিক হতে পারে, তবে উক্ত তারিখে মুদ্রা-অঙ্কনও নুসরতের পক্ষে অসম্ভব ছিল না দুই কারণে। আঞ্চলিক শাসনকর্তা রূপে রাজপুত্রদের মুদ্রা জারির অধিকার যে ছিল, তা আমরা আগেই বলেছি। উপরোক্ত মুদ্রাটি নুসরত হয়ত সেই অধিকারের বলেই অঙ্কন করেছিলেন। তা ছাড়া জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে তাঁর উত্তরাধিকারের দাবী কিছুটা থাকলেও উত্তরাধিকার লাভ বোধ

হয় সহজ ছিল না। পরবর্তী কালের ঘটনাপ্রবাহ দেখে মনে হয় যে, তাঁর ভাই মাহমুদ উচ্চাভিলাষী ছিলেন। সেইজন্য বোধ হয় হুসেন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নুসরতের সিংহাসন প্রাপ্তির পথ সুগম করার চেষ্টা করছিলেন; অর্থাৎ নুসরতকে আঞ্চলিক গভর্নর হিসাবে মুদ্রাঙ্কনের অধিকার প্রদান এ ক্ষেত্রে সুলতানের কূটনীতির একটি বিশেষ পর্যায়। শাসন-কর্তৃত্ব ও মুদ্রা জারির অধিকার প্রাপ্তির ফলে যেমন নুসরতের পদোন্নতি হল ও ব্যক্তিগত মর্যাদা বাড়ল, তেমনি আবার সামরিক কর্মচারী, সামন্ত, উলেমা ও জনসাধারণও বুঝতে পারল যে, উক্ত রাজপুত্র হুসেন শাহের উত্তরাধিকারী হতে চলেছেন। এ ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিয়ে থাকলে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সুলতান তাঁর কূটনীতির দ্বিতীয় পর্যায়ে নুসরতকে সরাসরি উত্তরাধিকারী মনোনয়নের মাধ্যমে কৌশলে মাহমুদের বিরোধিতাকে কমিয়ে দিয়েছিলেন। পূর্বোল্লিখিত ইংরেজী প্রবন্ধে বর্তমান লেখক দেখিয়েছেন যে, আব্বাসীয় খলীফাদের মধ্যে মনসুর, হারুন ও মুতামিদ এজাতীয় কৌশলই বেছে নিয়েছিলেন সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতার জন্য। মুদ্রার সংখ্যাস্বল্পতা থেকে এ ক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় না; কেননা উপরোক্ত পরিস্থিতিতে অঙ্কিত মুদ্রার সংখ্যা কম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আলোচ্য মুদ্রায় উল্লিখিত টাকশাল হুসায়নাবাদ[৫] এবং এ ক্ষেত্রে এ অনুমানেও বাধা নেই যে, নুসরতের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রশিক্ষণ শুরু হয় খুব সম্ভব হুসায়নাবাদ শাসনকেন্দ্র থেকেই। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি হুসায়নাবাদের সন্ধান পাওয়া গেলেও বর্তমান লেখকের ধারণা, আলোচ্য হুসায়নাবাদ গৌড় থেকে বেশী দূরে অবস্থিত ছিল না এবং শহরটি ছিল 'আইন-ই-আকবরী'তে উল্লিখিত[৬] সরকার টাণ্ডা অর্থাৎ বর্তমান মালদহ জেলার অন্তর্গত। আমরা আবার বলছি, ফিরোজ মাহমুদ কর্তৃক প্রস্তাবিত তারিখটি যে আদৌ ঠিক হতে পারে না, তা বলার কোনো কারণ নেই; আমরা শুধু ভিন্নতর ঘটনাপ্রবাহের ইঙ্গিত দিয়েছি—কারণ ঐতিহাসিক ঘটনার পথ একরৈখিক নয়।

ফিরোজ মাহমুদের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, যেহেতু নুসরত ৯২২ হিঃ/১৫১৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ক্রমাগত মুদ্রা চালু করেছিলেন এবং যেহেতু সম্প্রতি ৯২২/১৫১৬ তারিখযুক্ত নুসরতের একটি স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, ঐ তারিখটিই নিঃসন্দেহে তাঁর সিংহাসনে আরোহণের তারিখ এবং স্বর্ণমুদ্রাটি এ ক্ষেত্রে সিংহাসন-প্রাপ্তি উপলক্ষে অঙ্কিত স্মারক মুদ্রা। ৯২২ হিঃ/১৫১৬ খ্রীস্টাব্দে অঙ্কিত হুসেন শাহের যে মুদ্রাগুলি পাওয়া গেছে, সেগুলি সম্বন্ধে ফিরোজ মাহমুদ বলেছেন যে,

এগুলি নুসরত কর্তৃক মুদ্রা জারির পূর্বেই চালু করা হয়েছিল। নুসরতের সিংহাসনে আরোহণের তারিখ ৯২২ হিঃ/১৫১৬ খ্রীঃ বলে ধরে নিলে ফিরোজ মাহমুদের এই মন্তব্য মেনে নেয়া যায়; কিন্তু এই অনুমানে বাধা আছে। মুহম্মদাবাদ অথবা মুয়াজ্জমাবাদ টাকশাল থেকে ৯২৪ হিঃ/১৫১৮ খ্রীঃ তারিখে উৎকীর্ণ হুসেনের একটি মুদ্রা শিলং ক্যাবিনেটে স্থান পেয়েছে। **Botham** এবং **Friel** মুদ্রিত ক্যাটালগে ঐ তারিখটির পাশে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসিয়ে দিয়ে তরিখটি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ তৈরী করেছেন এবং ফিরোজ মাহমুদও তারিখটি মেনে নিতে আদৌ রাজি নন; কিন্তু উক্ত ক্যাটালগের **Botham** রচিত দ্বিতীয় সংস্করণে মুহম্মদাবাদ থেকে অঙ্কিত হুসেন শাহের একটি মুদ্রায় ঐ তারিখটি সন্দেহহীন-ভাবে দেওয়া হয়েছে।[৭] পূর্বে উল্লিখিত শিলং ক্যাবিনেটের মুদ্রায় যেমন, তেমনি এই মুদ্রাটিতে হুসেন 'কামরূপ-কামতা ও জাজনগর-উড়িষ্যা-বিজয়ী' রূপে অভিহিত। অতএব হুসেন শাহ ৯২৪ হিঃ/১৫১৮ খ্রীস্টাব্দে জীবিত ছিলেন এবং শিলালিপির সাক্ষ্য এ বিষয়ে স্পষ্ট যে, তিনি ৯২৫ হিঃ/১৫১৯ খ্রীস্টাব্দের আগে মারা যাননি।

ফিরোজ মাহমুদ কর্তৃক পরিলক্ষিত একটি বিষয় একটু বিশদ আলোচনার যোগ্য। ৯২২ হিঃ/১৫১৬ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে হুসেন শাহের মুদ্রার বিরলতার কারণ কি? আরো দেখা যাচ্ছে যে, যদিও নুসরত ৯৩৮ হিঃ/১৫৩২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, ৯৩৪ হিঃ/১৫২৮ খ্রীস্টাব্দের পর অঙ্কিত তাঁর কোনো মুদ্রার পরিচয় বা উল্লেখ কোনো মুদ্রার ক্যাটালগে বা মুদ্রাবিষয়ক প্রবন্ধে বর্তমান লেখকের চোখে পড়েনি। হুসেন শাহের পূর্ববর্তী সুলতান মুজাফফর শাহ যদিও অন্ততঃ ৮৯৯ হিঃ/১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দের শেষ দিকেও জীবিত ছিলেন, তাঁর যে মুদ্রাগুলোর পাঠ উদ্ধার সন্দেহাতীতভাবে সম্ভব হয়েছে, তাদের সবগুলোরই তারিখ ৮৯৬ হিঃ/ ১৪৯০ খ্রীস্টাব্দ। এই তিনজন সুলতানের প্রত্যেকের রাজত্বের শেষ ভাগের মুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতা বোধ হয় কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এ ক্ষেত্রে আমরা মুদ্রার বিরলতা বা অনুপস্থিতির ব্যাখ্যার জন্য একটি অনুমানের সাহায্য নিতে পারি। প্রত্যেক সুলতানের মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় কোষাগারে ও বিভিন্ন টাকশালে যে সব মুদ্রা জমা থাকত এবং প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্রে এবং শহর-বন্দরে ও তাদের আশেপাশে যে টাকাগুলো চালু থাকত, সেগুলির তারিখ সাধারণতঃ সুলতানের মৃত্যুর বৎসর থেকে শুরু করে তার আগেকার দু'তিন বৎসরের হওয়ার কথা। নতুন সুলতানের নির্দেশে প্রাদেশিক্ষ শাসনকর্তাগণ ও টাকশালের অধ্যক্ষগণ সঞ্চিত মুদ্রাগুলি এবং বাজারে চালু মুদ্রাগুলি ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের কাছে থেকে

ফেরৎ নিয়ে গালিয়ে যে নতুন স্থলতানের নামে টাকা তৈরী করতেন, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। মৃত স্থলতানের রাজত্বের প্রথম ও মধ্যভাগে অঙ্কিত টাকাগুলো এই রূপান্তর থেকে রেহাই পেত এই জন্যে যে, তারা তখন বাজারে চালু থাকত না। তা ছাড়া পুরানো টাকা কোষাগারে জমা থাকার কথা নয়; ওগুলো দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ত, অথবা মৃত্তিকায় প্রোথিত হত। আমরা যে অনুমান উপস্থাপিত করলাম, তা কোনো সাহিত্যিক বা পাথুরে প্রমাণের সাহায্যে জোরদার করে তুলতে পারব না। তবে অনুমানটি যুক্তিগ্রাহ্য। নতুন স্থলতান কর্তৃক মৃত স্থলতানের মুদ্রা গালিয়ে ফেলার পেছনে বিশেষ কারণ ছিল বলে মনে হয়। মৃত স্থলতানের নামে মুদ্রা চালু থাকলে তিনি জীবিত আছেন বলে লোক-জনের মনে ধারণা জন্মাতে পারত এবং এজাতীয় ধারণা নতুন স্থলতানের পক্ষে বিপদের কারণ ছিল। নতুন স্থলতানের মুদ্রার পাশাপাশি মৃত স্থলতানের মুদ্রার প্রচলন দেখে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের মনে এই ধারণা প্রশ্রয় পাওয়া অসম্ভব ছিল না যে, নতুন স্থলতান বিদ্রোহের মাধ্যমে সিংহাসন দখলের লড়াইয়ে মেতেছেন। বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণের জন্য স্থলতানগণ যে বণিক-সম্প্রদায়কে উৎসাহ দিতেন, তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ অবস্থায় রাজকীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে নতুন স্থলতান নিজ নামে মুদ্রা জারির মাধ্যমে দেশী ও বিদেশী বণিকদের সঙ্গে সরাসরি যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করবেন, তা ত নিতান্তই স্বাভাবিক। বর্তমান লেখকের ধারণা, বাংলার রাজতন্ত্র বণিকতন্ত্রের উপর বিশেষ-ভাবে নির্ভরশীল ছিল।[৮] টোম পিরেস জানাচ্ছেন যে, পনের-ষোল শতকে বাংলার মুদ্রা বিদেশেও চালু ছিল।[৯] এর কারণ অবশ্য অনুমান-সাপেক্ষ। এ দেশের সূতিবস্ত্র, চিনি ও চাল বিক্রয় হত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, সিংহলে, মালাবার উপকূলে, মালদ্বীপে এবং খুব সম্ভব পারস্যোপসাগরীয় অঞ্চলে এবং আরব ও আফ্রিকার উপকূলে। বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলার এই প্রাধান্য পণ্যগুলির চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে মিলিয়ে এ দেশের টাকার মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে-ছিল। এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক স্থলতান যে নিজ নামে অঙ্কিত মুদ্রাসমূহ দেশে প্রচারিত করে এবং বিদেশেও যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে বিভিন্ন দেশের বণিক ও শাসকদের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করবেন, এবং রাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করবেন, এ অনুমান যথার্থ। ইলিয়াসশাহী বংশের সর্ব শেষ দু'জন স্থলতান, ইউসুফ শাহ ও ফতেহ শাহের রাজত্বেরও প্রত্যেকের শেষ দু' বছরের মুদ্রা পাওয়া যায়নি। জালাল উদ্দীন মুহম্মদ শাহের ৮২৮–৩৩ হিঃ/১৪২৪–২৯ খ্রীস্টাব্দের মুদ্রা আজও অনাবিষ্কৃত যদিও তাঁর ৮৩৪–৩৫ হিঃ/১৪৩০-৩১ খ্রীস্টাব্দের

কয়েকটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। শেষ ইলিয়াসশাহী বংশের নাসির উদ্দীন মাহমুদ ও রুকন উদ্দীন বারবকের শেষ বছরগুলির কিছু মুদ্রা বিভিন্ন মুদ্রা-ক্যাবিনেটে সংরক্ষিত হয়েছে। কোনো সংখ্যাগত বিশ্লেষণ না করেও বর্তমান লেখকের মনে হয়েছে এই মুদ্রাগুলি উক্ত সুলতান দু' জনের রাজত্বের প্রথম ও মধ্যভাগের মুদ্রার তুলনায় সংখ্যায় কম। এ জাতীয় মুদ্রা-পরিস্থিতি থেকে আমাদের উপরোক্ত অনুমানই সমর্থন পাচ্ছে। সুলতানদের রাজত্বের শেষ দিকে জারি করা মুদ্রার সংখ্যাল্পতা বা দুষ্প্রাপ্যতার আরো কারণ থাকতে পারে। সব সময় রাজকোষে রূপা প্রচুর পরিমাণে জমা থাকত বলে মনে করার কারণ নেই। রূপা আসত বিদেশ থেকে। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে জানতে পেরেছি যে, বাংলার সুলতানগণ সূতিবস্ত্র প্রভৃতির বিনিময়ে পেগু-আরাকান থেকে রূপা আমদানী করতেন। বাংলায় রূপা আমদানী নির্ভরশীল ছিল অনুকূল আবহাওয়ায়, বিশেষ ঋতুতে জাহাজ চলাচলের উপর। এইজন্যও অর্থাৎ দেশে সাময়িকভাবে রূপার অভাব দেখা দিলেও মৃত সুলতানের টাকাগুলিকে গালিয়ে সেই রূপার সাহায্যে মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারত। আমাদের প্রথম অনুমানটিই এ ক্ষেত্রে বেশী যুক্তি-নির্ভর বলে মনে হয়। মুদ্রাগুলো শুধু রাজশক্তির প্রতীকই ছিল না, এগুলো যে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হত, তার পরিচয় যেমন একদিকে বাংলার মুদ্রারীতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই চিহ্নিত, তেমনি তা আবার ওয়াং টা-উয়ান, ইবন বতুতা (চৌদ্দ শতক), মা হুয়ান (পনের শতক), টোম পিরেস এবং হুয়াং সিং সেং (ষোল শতক) প্রমুখ বৈদেশিকদের লেখায় বিধৃত।[১০] দেশে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, বাণিজ্য-কেন্দ্র ও বন্দরের উদ্ভব এবং বিদেশে বাংলার শিল্পদ্রব্যগুলির চাহিদা, এ দেশে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির প্রচলন এবং বিদেশেও বাংলার মুদ্রার চাহিদা, যা **favourable balance of trade**-এর পরিচায়ক, প্রভৃতি মনে রাখলে ধরে নিতে হয় যে, দেশে ক্রমাগত রূপার অর্থ-নৈতিক প্রয়োজন দীর্ঘদিন ধরে বেশী করে অনুভূত হয়েছে। জৌনপুর, দিল্লী সালতানাত ও মধ্যযুগের অন্যান্য ভারতীয় রাষ্ট্রের তুলনায় বাংলা দেশে রূপার সরবরাহ নিকটবর্তী দেশ পেগু থেকে এ দেশের সূতিবস্ত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত ও নিয়মিতভাবে চলে আসছিল, কিন্তু বণিক শ্রেণী ও বিদেশের বাণিজ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যোগসূত্র ত্বরান্বিত ও দৃঢ় করার জন্য এ দেশের রাজতন্ত্র পুরনো মুদ্রা গালিয়ে নতুন করে সেই ধাতুর সাহায্যে আবার মুদ্রা বানিয়েছে। বণিক শ্রেণী, রাজ-পুরুষ ও ধনী লোকজনের কাছ থেকে পুরনো মুদ্রা ফেরৎ নিয়ে গালিয়ে নতুন করে ছাঁচে ফেলে টাকা তৈরীর ঘটনা ত এ দেশে ঘটেছে, সামন্ততন্ত্রের শেষ

পর্যায়ে যখন ইয়োরোপে সামুদ্রিক বাণিজ্যের সূচনা হয়, তখন অর্থাৎ তের-চৌদ্দ শতকে সে দেশেও ঘটেছে।[১১]

৯২২ হিঃ/১৫১৬ খ্রীস্টাব্দের পরে ৯২৪ হিঃ/১৫১৮ খ্রীস্টাব্দে অঙ্কিত হুসেনের মুদ্রা ত পাওয়া যাচ্ছেই। তা ছাড়া সোনারগাঁ শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, ৯২৫ হিজরির শাবান মাসে বা ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে হুসেন জীবিত ছিলেন এবং তাঁর উপাধি তখনো 'সুলতান-উস-সালাতিন।'[১২] এই প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ এতই স্পষ্ট ও শক্তিশালী যে, উক্ত সুলতান যে সিংহাসন ত্যাগ করেননি, সে কথা অনায়াসে বলা যায়। ৯২২হিঃ/১৫১৬ খ্রীস্টাব্দের পর জারি করা ৯২৩-২৪ হিজরি তারিখযুক্ত তাঁর আরো কয়েকটি মুদ্রা ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত হয়েছে।[১৩] তবে ৯২২ হিজরিতে উৎকীর্ণ নুসরতের স্বর্ণমুদ্রাটির ব্যাখ্যা কি রূপে করা যায়? স্বভাবতঃই মনে হয়, নুসরতের উত্তরাধিকারী মনোনয়নের সময় ঐ মুদ্রাটি চালু হয়েছিল। বাংলার মুদ্রাতত্ত্বের ইতিহাসে এ জাতীয় স্মারক স্বর্ণমুদ্রার উদাহরণ আরো আছে। এইজন্য আমাদের ধারণা, ৯২২ হিজরিকে নুসরতের সিংহাসন-প্রাপ্তির তারিখ হিসেবে ধরে নিয়ে যে অভিমত ফিরোজ মাহমুদ অত্যন্ত অনমনীয়ভাবে তুলে ধরেছেন, তার ভিত্তি দুর্বল।

নতুন সুলতান তাঁর পূর্ববর্তী সুলতানের মৃত্যুর আগেকার কয়েক বছরের মুদ্রা গালিয়ে ফেলতেন—এই মত গৃহীত হলে, নুসরত ও গিয়াস উদ্দীন মাহমুদের সম্পর্ক সম্বন্ধে ফিরোজ মাহমুদ মুদ্রার ভিত্তিতে যে সব কথা বলেছেন, তার অনেক কিছুই টিকবে না। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, নুসরতের মুদ্রা মাহমুদ বা নুসরতের পুত্র গালিয়ে ফেলেননি, তা হলে ৯৩৪ হিজরি থেকে ৯৩৮ হিজরি পর্যন্ত নুসরতের মুদ্রার অনুপস্থিতি কি করে ব্যাখ্যা করা যাবে? ভ্রাতার রাজত্বকালে মাহমুদ টাকা জারি করেছিলেন ফতহাবাদ, নুসরতাবাদ ও কোষাগার থেকে ৯৩৩ হিঃ/ ১৫২৭ খ্রীস্টাব্দে; শুধু মাত্র মুহম্মদাবাদ থেকে ৯৩৪ হিঃ/১৫২৮ খ্রীস্টাব্দে; কিন্তু হুসায়নাবাদ থেকে একটানা ৯৩৩ হিঃ/১৫২৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৯৩৮ হিঃ/ ১৩৫২-৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর এই মুদ্রাগুলির সন-তারিখের ব্যাখ্যায় আজ পর্যন্ত কেউ কেউ এ কথা বলেছেন যে, তিনি নুসরতের উত্তরাধিকারী হিসেবেই টাকাগুলি জারির অধিকার পেয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে ভিন্ন অভিমত হচ্ছে যে, টাকাগুলি মাহমুদের বিদ্রোহের প্রমাণ দিচ্ছে। ফিরোজ মাহমুদ তাঁর প্রবন্ধে দ্বিতীয় অভিমতটিকেই মুদ্রা-বিশ্লেষণের সাহায্যে সমর্থন করেছেন। আমরা প্রথম মতবাদের সমর্থনে কিছু যুক্তি ও অনুমান উপস্থাপনের পর দেখব, গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ কর্তৃক সংঘটিত বিদ্রোহ-সংক্রান্ত মতবাদটি কত দূর

গ্রহণযোগ্য। খুব সম্ভব ৯৩৩ হিঃ/১৫২৭ খ্রীস্টাব্দে গিয়াস উদ্দীন মাহমুদ নুসরত কর্তৃক উত্তরাধিকারী রূপে মনোনীত হবার অব্যবহিত পূর্বে ফতহাবাদ, মুহম্মদাবাদ, নুসরতাবাদ ও হুসায়নাবাদ থেকে নিজ নামে মুদ্রা-অঙ্কনের অধিকার পান ঐ স্থানগুলির শাসনকর্তা হিসাবে। মনোনয়নের পর হুসায়নাবাদ এলাকার সর্বময় শাসন-কর্তৃত্ব তাঁর হাতে দেয়া হয়। পরিবর্তিত ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাহমুদ শুধু হুসায়নাবাদ থেকেই মুদ্রা চালু রাখেন এবং অন্যান্য টাকশালে তাঁর নামে মুদ্রাঙ্কন বন্ধ হয়ে যায়। মুহম্মদাবাদের টাকশাল থেকে ৯৩৪ হিজরিতে মুদ্রাঙ্কন খুব সম্ভব মাহমুদের মনোনয়নের অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনা। এরূপ ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার দরুন হয়ত মুহম্মদাবাদে তাঁর মনোনয়ন অথবা নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থার খবর পৌঁছুতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। প্রাদেশিক শাসকগণ যে টাকা তৈরীর অধিকার পেতেন, তার ভারতীয় প্রমাণ ফিরোজ তোগলকের পুত্র ফতেহ খান কর্তৃক পাটনা ও জৌনপুর থেকে ১৩৫৮ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রাঙ্কন। উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকদের ক্ষেত্রে এটাই ছিল স্বাভাবিক নিয়ম। উমাইয়া আমলের আফ্রিকার শাসনকর্তাদের সবার নাম লিখিত ইতিবৃত্তে পাওয়া যাচ্ছে না; কিন্তু শুধু মুদ্রার সাহায্যে উক্ত শাসকদের সন-তারিখের অনুক্রম প্রস্তুত করা যায়। মুদ্রার উপর প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নাম থাকত এবং খলিফার নাম থাকত অনুপস্থিত। যদি শাসনকর্তা কর্তৃক বাংলায় মুদ্রাঙ্কনের অধিকার সম্পর্কিত মতটি গ্রহণের অযোগ্য বলে ধরে নেয়া যায়, তা হলে আরেকটি অভিমত তার বিকল্প রূপে উপস্থাপিত করা যায়। মাহমুদের মনোনয়ন ঘটে ৯৩৩হিঃ।১৫২৭ খ্রীস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে এবং সেই উপলক্ষে ফতহাবাদ, নুসরতাবাদ, হুসায়নাবাদ এবং হয়ত বা মুহম্মদাবাদ থেকেও তাঁর নামে মুদ্রা অঙ্কিত হয়। তারপর মনোনীত উত্তরাধিকারীকে হুসায়নাবাদ অঞ্চলের প্রশাসনিক ক্ষমতা ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতাও দিয়ে দেয়া হয়। তিনি তখন ঐ অঞ্চল থেকেই মুদ্রা জারি করতে থাকেন এবং মুহম্মদাবাদের অতি-উৎসাহী মুদ্রাধ্যক্ষ মনোনয়নের পরবর্তী বৎসরেও সেখান থেকে মাহমুদের নামে মুদ্রা তৈরী করেন। এখানে হুসায়নাবাদের প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্তনের ফলে[১৪] গৌড়ের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বলে মনে হয়। খুব সম্ভব এই কারণে গঙ্গার নতুন প্রবাহের উপরে এবং গৌড় থেকে নিকটবর্তী কোনো স্থানে যে বন্দর ও নগরকেন্দ্র গড়ে ওঠে, হুসেন শাহের নাম অনুসারে তারই নাম রাখা হয় হুসায়নাবাদ। সিংহাসনে আরোহণের বছর থেকেই শুরু করে হুসেন এখান থেকে অজস্র রৌপ্যমুদ্রা জারি

করেন এবং হুসেনশাহী বংশের অপর তিনজন সুলতানের সময়েও টাকশালটি অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। অজস্র মুদ্রাঙ্কন থেকেই হুসায়নাবাদের বাণিজ্যিক গুরুত্ব বুঝতে পারা যায়। এ অনুমানেও বাধা নেই যে, মালদহ অঞ্চলের রেশম শিল্প ও সূতিবস্ত্রই ছিল হুসায়নাবাদের সমৃদ্ধির প্রধানতম কারণ। খুব সম্ভব, এই বন্দর-টিকে কেন্দ্র করে একটি প্রশাসনিক অঞ্চলও ক্রমশঃ গড়ে ওঠে। স্থানটির রাজ-নৈতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছিল বলেই উত্তরাধিকারী রূপে মনোনীত হবার সময় থেকে নুসরত সেখান থেকে মুদ্রাঙ্কনের অধিকার পেয়েছিলেন। ৯২২ হিঃ/১৫১৬ খ্রীস্টাব্দে অঙ্কিত নুসরতের বেশ কয়েকটি মুদ্রায় হুসায়নাবাদের নাম পাওয়া যাচ্ছে। ঠিক একই কারণে মাহমুদও নুসরতের উত্তরাধিকারী হিসেবে উক্ত নগরকেন্দ্র থেকে মুদ্রা চালু করেন বলে মনে হয়। উত্তরাধিকারী যাতে যথার্থ মর্যাদা ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ভবিষ্যতের সুলতান হিসেবে নিজের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারেন, নুসরত সম্ভবত সে দিকেই নজর দিয়েছিলেন। এ ধারণার যেন সমর্থন মিলছে 'তবাকাত-ই-আকবরী'তে এবং 'রিয়াজ-উস-সলাতিনে'। এ কথা বলা হয়েছে, নুসরত মাহমুদকে 'আমীরে'র মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন এবং ভাইগণকে বেশী করে সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন।[১৫]

শ্রীধর-রচিত 'কালিকা-মঙ্গল' কাব্যের একটিমাত্র ভণিতায় উল্লিখিত 'যুবরাজ' শব্দসমষ্টিকে ফিরোজ মাহমুদ আক্ষরিক অর্থে নিয়েছেন। 'যুবরাজে'র অর্থ ত যুবক রাজও হতে পারে। অন্ততঃ পাঁচটি ভণিতায় ফিরোজ 'রাজা' রূপেও এ কাব্যে অভিহিত। এইজন্য প্রশস্তির অন্তর্গত 'রাজা', 'যুবরাজ', প্রভৃতি শব্দ বরং এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, কাব্যটি যখন রচিত হয়, তখন ফিরোজ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাজা বা সুলতান।

ফিরোজ মাহমুদ মুদ্রার ভিত্তিতে মাহমুদের বিদ্রোহ সংক্রান্ত প্রসঙ্গ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন এবং এতে করে শরফুদ্দীন ও রমেশ চন্দ্র মুজুমদারের অভিমত জোরালো সমর্থন পেয়েছে। তাঁর যুক্তিগুলো মেনে নিলে বলতে হয় যে, মাহমুদ ফতহাবাদ, হুসায়নাবাদ ও নুসরতাবাদ থেকে ৯৩৩ হিঃ/১৫২৭ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। তা ছাড়া 'খাজানা' বা কোষাগার বলতে যদি কেন্দ্রীয় কোষাগার বুঝায়, তবে রাজধানীতে অবস্থিত কোষাগারের টাকশালটিও ঐ একই বৎসরে তাঁর অধিকারে এসেছিল। ৯৩৩ হিঃ/১৫২৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে শুরু করে ৯৩৮ হিঃ/১৫৩২-৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত হুসায়নাবাদে তাঁর কর্তৃত্ব অব্যাহত ছিল এবং ৯৩৪ হিঃ/১৫২৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি মুহম্মদাবাদও দখল করে নিয়েছিলেন। বাস্তব

ক্ষেত্রে এ ধরনের বিদ্রোহ কি সম্ভব? ফতেহাবাদকে ফরিদপুরের সঙ্গে অভিন্ন বলে ধরে নেয়া হয় বটে; কিন্তু সমগ্র ফরিদপুর, বরিশাল ও সন্দীপ প্রভৃতি স্থান যে এই অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল তা মধ্যযুগের বাংলা কাব্য ও 'আইন-ই-আকবরী' থেকে জানা যায়।[১৬] এই অঞ্চল থেকে বহু দূরে অবস্থিত, ঘোড়াঘাট সরকারের অন্তর্গত নুসরতাবাদ শহরটিরও ঐ একই বছরে মাহমুদ দখল করেছিলেন বলে ধরে নিতে হচ্ছে। শুধু দূরত্বের কারণেই ত মনে হয় যে, এই দুটি অঞ্চলে এক সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা অসম্ভব ছিল। মাহমুদের বিদ্রোহের প্রসঙ্গটিকে আমল দিলে আরো দেখা যায় যে, হুসায়নাবাদ, যে স্থানটি ছিল রাজধানী গৌড়ের অত্যন্ত নিকটবর্তী, নুসরতের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল এবং কোষাগার-টাকশাল সবই তখন মাহমুদের দখলে। আবার ৯৩৪ হিঃ/১৫২৮ খ্রীস্টাব্দে মাহমুদ মুহম্মদাবাদও দখল করে নিয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন, এই পরিস্থিতিতে ৯৩৪-৩৮ হিঃ/১৫২৮-৩২ খ্রীস্টাব্দে নুসরত কোন অঞ্চলে রাজত্ব করতেন? যদি ধরেও নেয়া যায় যে, তিনি ৯৩৩ হিঃ/১৫২৭ খ্রীস্টাব্দের পরে কোনো সময়ে নুসরতাবাদ ও ফতেহাবাদ আবার দখলে আনতে পেরেছিলেন, তবু ত দেখা যাচ্ছে যে, গৌড়ের নিকটবর্তী শহর হুসায়নাবাদ ৯৩৮ হিঃ/১৫৩২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মাহমুদের দখলেই ছিল। অথচ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও হুগলী অঞ্চল যে ঐ সময়ে নুসরতের শাসনাধীন ছিল, তার প্রমাণ ঐ অঞ্চলে প্রাপ্ত ৯৩৪-৩৮ হিঃ/১৫২৮-৩২ খ্রীস্টাব্দের বেশ কয়েকটি শিলালিপি[১৭] যাতে এই সুলতানের 'কুনিয়া' ও 'জুলুস' খেতাব স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। শিলালিপিগুলির কয়েকটিতে আবার উচ্চতর সম্মানের সূচক 'সুলতান-উস-সলাতিন' উপাধিটি ব্যবহারের প্রবণতাও স্পষ্ট। আলাউদ্দীন ফিরোজ ৯৩৮-৩৯হিঃ/১৫৩২-৩৩খ্রীস্টাব্দে হুসায়নাবাদ, ফতেহাবাদ, মুহম্মদাবাদ ও মুয়াজ্জেমাবাদ থেকে মুদ্রা অঙ্কন করেন। আবদুল করিমের অনুসরণে ফিরোজ মাহমুদ আলাউদ্দীন ফিরোজের ৯৩৮ হিঃ/১৫৩২ খ্রীস্টাব্দের যে টাকা দুটিকে মুহম্মদাবাদ থেকে মুদ্রিত বলে ধরে নিয়েছেন, তাতে স্পষ্টভাবেই 'বমুয়াজ্জেমাবাদ' বা 'মুয়াজ্জেমাবাদ থেকে' কথাগুলো উৎকীর্ণ হয়েছে। ঢাকা যাদুঘরে সংরক্ষিত এই মুদ্রা দুইটি আমরা আলোকচিত্রসহ একাধিক বার প্রকাশ করেছি;[১৮] কিন্তু এই নতুন তথ্য আবদুল করিম এবং ফিরোজ মাহমুদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। মুয়াজ্জেমাবাদ সোনারগাঁয়ের নিকটবর্তী মুয়াজ্জমপুর যা পুরনো ব্রহ্মপুত্রের উপরে অবস্থিত। এই স্থানটি ছিল সমগ্র 'একলিম' মুয়াজ্জেমাবাদের প্রধান রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র। এই 'একলিম' বা প্রদেশ ছিল ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত। পিতৃব্যের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করে ফিরোজ গৌড় থেকে শুরু

করে সুদূর পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ মাত্র নয় মাস বা এক বৎসর রাজত্ব-কালের মধ্যে কখনো দখল করতে পারতেন না। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের কয়েকটি শহরে মাহমুদের বিদ্রোহ এবং হুসায়নাবাদের উপর তাঁর প্রায় ছয় বৎসরের রাজত্বের অর্থই হচ্ছে রাষ্ট্রের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতা। এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকলে সত্যিই কি কোনো ঐতিহাসিক সূত্রে তার উল্লেখ থাকত না? অথচ ফিরোজের রাজত্বকাল যে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, মাহমুদ যে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেছিলেন, তিনি যে নুসরত কর্তৃক নিযুক্ত, ত্রিহুতের শাসনকর্তা মখদুম আলমের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়েছিলেন, এ জাতীয় সমকালীন খুঁটিনাটি তথ্য ত কোনো না কোনো সূত্রের মাধ্যমে আমাদের হাতে পেঁাছে গেছে।

মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাসে উত্তরাধিকারের সমস্যাটি একটি জটিল সমস্যা। ইসলামিক আইনশাস্ত্রেও এর কোনো সমাধান নেই। মুসলিম জগতের শাসকদের মধ্যে অনেকেই এই সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হয়েছিলেন উত্তরাধিকারী নিয়োগ ও নিযুক্ত উত্তরাধিকারীর ক্ষমতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে। উত্তরাধিকারীকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থানের শাসনকর্তৃত্ব ও মুদ্রা-অঙ্কনের অধিকার প্রদান ছিল তাঁর ভবিষ্যৎ রাজত্বের ভিত্তি প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে গৃহীত কতকগুলো ব্যবস্থা। মুদ্রাঙ্কন সার্বভৌমত্বের প্রতীক—এ কথা সত্য। তবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত মুসলিম শাসক কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্তা, যুবরাজ, মন্ত্রী ও রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বশীল কর্মচারিগণকেও এ অধিকার দিতে পারতেন, ইতিহাসে তার যথেষ্ট নজির আছে।[১৯]

ফিরোজ মাহমুদ একটি নবাবিষ্কৃত স্বর্ণমুদ্রার তথ্য ও কয়েকটি মুদ্রাভিত্তিক অনুমান উপস্থাপিত করে উপরোক্ত সমস্যাটি আলোচনার সুবিধা করে দিয়েছেন বলে বর্তমান প্রবন্ধের লেখক তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁর প্রবন্ধের সূত্র ধরে আমরা বাংলার মুদ্রায় প্রতিফলিত রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশেষ কতকগুলি দিকের উপরই দৃষ্টি রেখেছি। ভবিষ্যতে মুদ্রা-ব্যবস্থার আর্থনীতিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

তথ্য-নির্দেশ

১. Nevil-এর মন্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, New Series, XXXV, p. 168 ; H. N. Wright : *The Coinage and Metrology of the Sultans of Delhi*, 1936, p. 222 ; nos. 745-60.

২. J. N. Sarkar (ed.): *History of Bengal*, vol, II, Dacca, 1948, pp. 152-153, 159.
৩. প্রবন্ধটি অপ্রকাশিত।
৪. M. R. Tarafdar : Relation of Bengal with her neighbours—A numismatic study, *Bhattasali Commemoration Volume* (ed. A. B. M. Habibullah), Dacca, 1966, pp. 229-30.
৫. A. Karim : *Corpus of the Muslim Coins of Bengal*, Dacca, 1960, 125.
৬. *Ain-i-Akbari of Abul Fazl-i-Allami*, Jarrett এবং Sarkar, Calcutta, 1949, vol. II, p. 142.
৭. A. W. Botham : *Catalogue of the Provincial Coin Cabinet, Assam*, 2nd ed., Allahabad, 1930, p. 169, no. 16.
৮. বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য ও যুগ-বিভাগ সমস্যা, এই সঙ্কলনের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৯–৩২।
৯. Tome Pires : *Suma Oriental of Tome Pires*, ed. A. Cortesao, London, vol. I, p. 69.
১০. H. A. R. Gibb : *Ibn Battuta : Travels In Asia and Africa, 1325-1354*, 1953, p. 267 ; P. C. Bagchi : Political Relations Between Bengal And China, *Visvabharati Annals*, 1945, pt. I, 97, 116, 125; Ma Huan : *Ying-yai Sheng-Lan*, p. 161 ; Tome Pires : প্রাগুক্ত, I, pp. 194-95.
১১. Henri Pirenne : *Economic And Social History of Europe*, New York, pp. 110-11,
১২. *J. A. S. B.*, XLII (1873), p. 295 ; Shamsuddin Ahmed : *Inscriptions of Bengal*, vol. IV, Rajshahi, 1960, p. 198.
১৩. এই মুদ্রাগুলির কথা আমাকে ঢাকা যদুঘরের রিসার্চ এ্যাসিসট্যাণ্ট নিজামউদ্দীন জানিয়েছে।
১৪. Abid Ali Khan : *Memoirs of Gour and Pandua*, ed. H. E. Stapleton, Calcutta, 1931, pp. 17-18; *History of Bengal*, vol. II, p. 144
১৫. *The Tabaqat-i-Akbari of khwajah Nizamuddin Ahmad*, tran. De, vol. III., Calcutta, 1939, p. 444 ; *Riyaz-us-Salatin*, text, Calcutta, 1890, p. 136.
১৬. আইন-ই-আকবরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৪ ; পনের শতকের কবি বিজয় গুপ্তের উক্তি 'মুলুক ফতেহাবাদ বাঙ্গরোড়া তকসিম', মনসা-মঙ্গল, সম্পাদক : বসন্তকুমার ভট্টাচার্য, বরিশাল, পৃঃ ৪, নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করে যে, কবির গ্রাম, বরিশালের অন্তর্গত ফুল্লশ্রী, ফতেহাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
১৭. Shamsuddin Ahmed : প্রাগুক্ত, pp.222-32.

১৮. *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, vol. IV, 1959, p. 178; *Husainshahi Bengal, 1494-1538 A. D., A Socio-Political Study*, Dacca, 1965, p. 81 ; pl. I.

১৯. Stanely Lanepoole এবং Henri Lavoix রচিত উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের মুদ্রার ক্যাটালগগুলোতে প্রকাশিত বহু মুদ্রা এ জাতীয় মন্তব্যের সপক্ষে রায় দেবে। হারুন-উর-রশীদের মুদ্রায় আমিনের নাম উৎকীর্ণ করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে Lavoix বলেছেন: II (হারুন) concede la meme perogative a ses ministres, aux gouverneurs des provinces, aux intendants des finances. *Catalogue Des Monnaies Musulmanes De La Bibliotheque Nationale*, vol. I. Khalifes Orientaux, Paris, 1887, p. xlviii.

স্বীকৃতি

বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য ও যুগ-বিভাগ সমস্যা
ইতিহাস, ষষ্ঠ বর্ষ (১৩৭৯), তৃতীয় সংখ্যা (পৌষ-চৈত্র)।

ইতিহাস-রচনা প্রসঙ্গে
১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ ইতিহাস-পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত কুমিল্লা ইতিহাস-সম্মেলনে পঠিত। **ইতিহাস**, অষ্টম বর্ষ (১৩৮১), দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা (ভাদ্র-চৈত্র)।

বাংলার ইতিহাসে সামন্তবাদ ও ধনতন্ত্রের বিকাশের সম্ভাবনা
১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ ইতিহাস-পরিষদ কর্তৃক ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ইতিহাস সম্মেলনের মূল সভাপতির অভিভাষণরূপে মুদ্রিত এবং পরিষদের ১৯৭৮ সালের কার্য-বিবরণীতে পুনর্মুদ্রিত; **প্রাচীন বাংলায় ধনতন্ত্রের বিকাশের সম্ভাবনা** শীর্ষনামে প্রকাশিত; **সমকাল**, ১৩৮৫, আষাঢ়।

ইতিহাস লেখার সমস্যা
১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইতিহাস-পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত ঢাকার ইতিহাস সম্মেলনে পঠিত; **ইতিহাস**, প্রথম বর্ষ (১৩৭৪), তৃতীয় সংখ্যা (পৌষ-চৈত্র)।

ইন্দো-মুসলিম ইতিহাস-শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য
Mahibbul Hasan (ed.) : *Historians of Medieval India* পুস্তক-পরিচয়, **ইতিহাস**, তৃতীয় বর্ষ (১৩৭৬), প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ-শ্রাবণ)।

মুসলিম বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তব্য
রমেশচন্দ্র মজুমদার: **বাংলাদেশের ইতিহাস** (২য় খণ্ড); **Atul Chandra Ray** : *History of Bengal, Mughal Period*; পুস্তক-পরিচয়, **ইতিহাস**, দ্বিতীয় বর্ষ (১৩৭৫), তৃতীয় সংখ্যা (পৌষ-চৈত্র)

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার
ইতিহাস, চতুর্থ বর্ষ (১৩৭৭), দ্বিতীয়-তৃতীয় (ভাদ্র-চৈত্র) সংখ্যা ।

বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব
ইতিহাস, তৃতীয় বর্ষ (১৩৭৬), তৃতীয় সংখ্যা (পৌষ-চৈত্র) ।

কুলজী সাহিত্যের ঐতিহাসিকতা
বাংলা একাডেমী পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ (১৩৬৬), দ্বিতীয় সংখ্যা (ভাদ্র-অগ্রহায়ণ) ।

মধ্যযুগের মুসলিম শাসকদের মুদ্রা-অঙ্কনে একটি ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য
ইতিহাস, নবম বর্ষ (১৩৮২), প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা (বৈশাখ-চৈত্র) ।